

অলকা

“যতোঋতমমরমুখরাঃ পানপা নিতাপুলা

হঃসংশৈঃ রচিতদাশনা নিত্যপথা মলিষ্ঠঃ ।

কেকোৎকষ্ঠা ভবনশিখিনো নিত্যাস্বৎকণা

নিত্যজ্যোৎস্না প্রতিহততমো ব্যতিরম্যঃ প্রদোষাঃ ॥”

—মেঘদূত ।

প্রথম বর্ষ]

ফাল্গুন, ১৩২৮

[১ম সংখ্যা]

সূচনা

পূজাপাদ ৬/রামেন্দ্রসুন্দর দ্বিবেন্দ্রী মহাশয়
একবার মাসিক পত্রের আয়তন হিসাব
করিয়া ঠিক করেন যে, বাঙ্গলা দেশের শিশু
যেমন শতকরা ৫০টি স্ত্রীতিকাগারেই ভবলীলা
সংবরণ করে, বাঙ্গলা সাহিত্যে মাসিক পত্রও
শতকরা ৯৫ খানা গুম্বিয়াই মরে। “অলকা”
বাঙ্গলা সাহিত্যের মাসিক পত্র, তবে আশা
এই—ইহার জন্য বাঙ্গলার বাহিরে তা'
ছাড়া বরাইমিহিরের মত মানাই ভাল,—

দ্বাদশ বর্ষ না কাটিলে শিশুর কোষ্ঠীনির্ঘর
বিভূতনা যাত্রা।

“অলকা” নিজের কথা শুনাইবে।
বাঁজে কথা বা কাজের কথা বলিবে না।
“অলকা”র উদ্দেশ্য “কান্তাসম্মিতভাষণ-
দেশযুজ্জ”—কান্তার ভাষা রসস্রষ্টা দ্বারা
পাঠককে নিজ প্রতিপাত বিষয়ের প্রতি
আকর্ষণ করিবে। এই উদ্দেশ্য যদি সিদ্ধ হয়,
ব্যতির “অলকা”র জন্ম সার্থক।

আগমনী

[রসবন্ধ]

ওরে, মরণ এসেছে দেশে !

শুক্ল-চিহ্নিত শুই চেয়ে আছে

কিমনী গোপীর বেশে ।

মস্তকে জটা-কটপটি দোলে,

আপক-কণ্ঠে-বগ্নোত্তে ফোলে,

হস্তে-হস্তে, শব্দে-বোনে

ভাঙন বেলে-বনে ।

কখন এসেছে দেশে ।

কোন অসংকার অকথিত বাণী

প্রত্যক্ষ মরণ-মাজি ;

কিন্তু লোঁচায়া-কলহাজির

হেন চিত্তকল-মাক !

বিরতি-কাল-কাল-কাল-কাল,

অকথ্য-একি প্রবল-বলনী,

সংসার-বাক্যে-এ-বিশ্বের অশ্রু-

মজার আশ্রয় ।

এ-মত-মত-মত-মত-করি

অন্য-এ-অন্য-বাক্য :

এ-মত-মরণ-—বাণী-বেদনায়

আকুল-মনে-চাপিয়া :

এ-মত-মরণ-—দারুণ-বিবহ,

এ-মত-মরণ-চির-শেষ-অহরহ,

এ-মত-দারুনো-বেদনা-অসহ,

এ-মত-পাণ্ডা-—এ-মত-পাণ্ডা ।

কাজন, ১৩২৮]

স্বাগমনা

কেন্দ্রিতরুণীর হিয়ায় কমলে

কুটিল নিচোরা নাম ;

যেবা তারি বুঝি ভোগেছিল কার

কি গোপন অভিলাষ ।

কনক দণ্ডতলা গৃহ জরি

কাঁপ হাওয়াকার উচ্চল অমরু

কৌম উগল পথিকল ভবন্য,

অসিদ্ধ তরুন ভাস ।

আরেক বিপদ, পদাতি যে বদ্বি

ভাষা ন কবল ভাষা

প্রিয়তার মিলন চাখিছে ভাষা

বসন্ত মাসে কল

বয়লা লোভে ক্ষম পবন,

যে চাক চপ রেতি ব কুরাগ,

মুখে দিবে তোর সজি দণ্ড,—

সুচাক্ষরে হাওয়াকার ।

বস্ত্র-মরণ পলক বদ্য

লক্ষ লাক্ত গৃহমহা

কোমল কোমল, কবল কবল

মিলন-মামল্য ব্যজ ।

মাতা অলকা নিয়ে আর টানি,

দগনে ভবনে হোক জ্বালাজ্বনি,

অটল প্রেমের বিদ্রোহ-বাণী

গাহ গোরব-নাথ ।

বাকালী সাহিত্যের গতি

[অধ্যাপক শ্রীমন্তেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্-এ]

কবিশ্রীমন্তেন্দ্রনাথ বাবলার কবি-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মিলন" লিখিয়া তাহা বাস্তবে পরি-
কৃত করিবার জন্য "বিষভারতী", কাল্পনিক
গেতার প্রতীক হইয়াছেন। এতদিন তিনি কালের
চারণ করিয়াছেন, কালের স্রোত ও প্রবাহই মুখ
ছিলেন, এখন দেখিতেছি তিনি কলাকাজী
হইয়াছেন। শরৎবাগিনীর 'বাকালী কথা'র
এই কালের আকাঙ্ক্ষাই দেখি—কেননা ইহা
রাজনীতি, সমাজনীতি। "শ্রীকান্ত" পুনরায়
দেখা দিয়াছেন। তবে তাঁর "কেননা-পাণ্ডনা"
শৌর্য হইবে কবে? ওরিকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
কবিশ্রীমন্তেন্দ্রনাথ সপ্তগ্রাম ও বৌদ্ধধর্মের কথা
কহিয়া এখন ঢাকার সংস্কৃত সাহিত্যের
আলোচনার ব্যস্ত হইলেন। এমন কি 'কোয়ারা'
'পাণ্ডনা কোয়ারা'র সমস্যাটির পর ললিতবাবু তব
কথায় মনোনিবেশ করিয়াছেন, বীর রসধারার
বাকালী সাহিত্য সজীবিত, আজ তিনি
কবিশ্রীমন্তেন্দ্রনাথের আলোচনার সমস্যাটি ও পতীর
পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু আন-
ন্দের কোয়ারা কি আর খুলিবে না?
কলাসাহিত্য এখনও যে সেতার আশা রাখে।
কবী শ্রীমন্তেন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য ও ভারতীয়
কবিতার তুলনায় সমালোচনা করিতেছেন,
সাহিত্যের ও বাকালীর আলোচনার আলো
প্রকাশিত হইতে কথাময়, তবে কবালী সাহি-
ত্যের আলোচনা করিতেছেন। রাখে রাখে
'তবমোহিত' ও 'ভারতবর্ষ'ে তাঁদের দেখা
গই। এই কালের পুনরায় কথা।

বাকালী মাসিকের দিকে তাকাইলে
প্রথমেই চোখে পড়ে "সবুজ পত্র"। এ বৎসর
গরম বড় বেশী ছিল, কালোই বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ
ও আশ্বিনের পাতাগুলো পীত হইয়া বরিয়া
গিয়াছিল। সমগ্র বর্ষার রস সঞ্চয়ের পর
প্রাণে যখন সবুজপত্র দেখা দিল, মনে
হইল সবুজ আর শুকাইবে না। কিন্তু
কার্টিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ শেষ হইল—
সবুজ আবার অতল হইয়াছে। এই
মাসিকখানিই বাকালী সাহিত্যের "Nine-
teenth Century"। যে পরে প্রমথ চৌধুরী,
স্বদেশপন্থ চন্দ্রবর্তী ও অতুল গুপ্তের
অতুলনীয় প্রবন্ধ শিক্ষিত বাকালীর মনের
খান্না বোগাইয়া আসিতেছে—অকালে তাহার
অবসান হইলে যে সাহিত্যের সমুদ্র কতি হইবে
সে বিষয়ে অণুমান সন্দেহ নাই।

তার পর চোখে পড়ে "এবাসী"।
এবাসীর কৌণ্ডার এবাসী আজ দেশে
ফিরিয়া বেশ পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। "এবাসী"
শুধু কুল কটাহিয়া সন্তুষ্ট নহে, কাবের কথা
বলিতেছে। গত বৎসর হইতে "মহিলা
মজলিস" ও "ছেলেদের পাড়াড়ী" বোগ
করিল। মাসিকখানি সঙ্গীতের আশ্রয়ের
জিনিস হইয়াছে। "ভারতবর্ষ" গঙ্গাধরন—
শরৎ বাবুই ইহার বিশ্লেষকরী। "ভারতবর্ষ"ও
অনেক নৃতন চিন্তা বহন করিতেছে। "উল্লিখিত"
প্রভৃতি প্রবন্ধে বাকালীর অর সঞ্চয়ের
উপায় বলিয়া দিতেছে। "মানসী ও কবালী"

সাহিত্যের মর্মের বাণী প্রকাশ করিতেছে।
অন্য কথ্য হইতেই “মানবী” ভিত্তিক যথেষ্ট
একটা কথ্য হইতে পারে। বলাই বাহুল্য।
এই পত্রিকাখানিতে সর্বদা একটা সত্য
লক্ষ্য করি। “ভারতী” বস্তুতঃ সত্য নতুন
সাহিত্যের হাতে পড়িয়াছে। ইহার
অভ্যন্তরীণ মর্ম সত্য বিস্তারিত করিয়া উঠাও
হইয়া উঠিয়াছেন যেহেতু যোড়ার মত—
তারেরও বাঁধন হিঁড়িয়া, তারেরও বাঁধন
হিঁড়িয়া। সাহিত্যিকেরা এখানে অল্প বড়
মত। “নারায়ণ” আর “ভালিমনাই”, “কমলার
হঃ” নাই, “হাসির দাম” ও আর কিছুই হয় না।
তবে সেই সঙ্গে শাস্ত্রী মহাশয়ের “মৌখিক” ও
বিপিন বাবুর “সামাজিক প্রবন্ধ” হারাইয়াছি।
“নির্যাসিতের আত্মকথা” বাহালা সাহিত্য
একটা নাই। কিন্তু আজ ইহা স্বাভাবিক-
দের হাতে। “নারায়ণ”র প্রাণ চিত্ররঞ্জন
আর বেশকিছু আর পুত্র আশ্রয় ইত্যাদির
কল্পনার। “মৌলসেম ভারত” যে কি
জানি গল্প “কাজিকের” সংখ্যাখানি প্রাণ
দিয়া পড়িলেই বুঝা যায়। “নরনারায়ণ”
এখনও বাঁচিয়া আছে। “অর্জুন” ও
“যমুনা” চকিতেছে। আর কত শত পত্রিকা
উঠিতেছে ভুবিতেছে, তাহার হিসাব রাখা
কঠিন।

কৃত্তিকার মাঝে হঠাৎ নতুন সুর বাজি-
তেছে। কল্পনানিয়ান, বজীর বাঁধনী, কুহক-
রঞ্জন, মেঘরঞ্জন, প্রাণ রায়চৌধুরী, কামি-
য়ার, সত্যবাহিনী, প্রিয়দর্শী ও “আলো ও
ছায়া” কবি, রীতা বীরা হইয়া উঠিতেছে।
সত্যবাহিনী “পাখী”-কে সত্য সত্য আনি-
কিয়াছেন “কল্পনার” আর “কল্পনী” হইতে

সীমাকে উঠিতেছে। কিন্তু বিজ্ঞানবাদী সমাজিক
কল্পার মাঝে নৃত্যকেশীর আশির জার উঠিতেছে
“কাবাল পাখা” ও “বিহারী”—সামাজিক
কাজি, নরঞ্জন, ইত্যাদির হাতে—বেশী “এক
হাতে কাঁচা ইয়াসের বাঁধনী, আর হাতে রণ-
তুর্বা”। কেননা, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও মাই-
কেলের বহুনির্দেশনাই এই “বিহারী”র কাছে
মান। নরঞ্জন এই কবিতার মাঝে সামাজিক
কল্পা করি। “আর বাঁধা বাঁধা ও না শাস্ত্রী”
প্রোগ্রামের এই বেঙ্গলী আর বাঁধনী হাতে
হাতে বসিতেছে।

কৃত্তিকার মাঝে জীবনী কল্পনামা
সেবী (‘দেবী’ বলিতে সাধু হয় না, কারণ
ঈশ্বরমতী বহু মহাশয়ের ইচ্ছাতে যের আশক্তি
আছে), জীবনী আশোদিত, যোগেশ্বরী,
জীবনী প্রোগ্রামের দেবী, জীবনী প্রোগ্রামের
ও জীবনী সত্যবাহিনীর আর কোন দাড়া পাই
না। শৈলবালা, অম্বরগা ও নিরুপমা করণ
সবেগে চলিতেছে—কিন্তু ‘সেখ আনু’ ‘ক-
শক্তি’ বা ‘হিঁড়ি’ দেখা পাই না—এই
আমাদের হুঁচক। সত্যবালা ‘বসন্ত-প্রবন্ধ’
মর্মের বেদনা জারাইয়া ‘জীবনী-মর্মের’ প্রাণ
করাইয়া দেবার বিধনাটা দেখাইলেন।
তার মর্মের কি এইখানেই অস্তিত্ব?
ইন্দ্রিয় দেবীর ‘নারীর উক্তি’ কি সব
নিঃশেষ? নারীর হাতের একটা উপাধের
প্রবন্ধ যে আমরা আরও চাই। এদিকে
জীবনী শাস্ত্রী দেবী ও জীবনী সত্যবাহিনী
(কল্পনা বা কল্পনা দেবীর মত) কোথায়
এই কল্পনার মাঝে কোন কোন দাড়া পাই
এখনও কল্পনা করিতে চাই। কল্পনার মাঝে
কল্পনা করিতে যে কোন দাড়া পাই

তেছে না। তবে আশা আছে একদিন
তীক্ষ্ণ—

—“তাব পাবে রূপের মাঝারে অক্ষ
অসীম পাবে সীমার নিখিড় সন্ধ্যা।”

কিন্তু নারীর মাঝে নতুন দাড়া পাইতেছি
—যেন হয় Bernard Shaw's manly
woman দেখা দিগছে। শ্রীমতী জ্যোতির্শ্রী,
শ্রীমতী রমলা ও শ্রীমতী সত্যাবালা বিদ্রোহের
ধ্বজা উড়াইয়াছেন। গত আশ্বিনের
‘ভারতবর্ষ’ বার্নি পড়িলেই বুঝিতে পারি যে,
নারীর মুখে ভাষা ফুটিয়াছে—নাশ্বাদরের
বক্তার ভাষা হুসু ভাসাইয়া ছুটিয়াছে আমাদের
জালাময়ী লেখনী। হৃৎ, বেসনা, অপমান
বস্ত তীর হৃৎ, তার প্রকাশও তত ভীষণ, এ
যেন আত্মক্লেশের প্রস্রবণ। রশ্মিয়ার কণা
ভাবিলেই তাতা বুঝিতে পারি। দাক্ষি-
ণাত্যের অ-ব্রাহ্মণদের আন্দোলন, বাঙ্গালার
নয়ঃপুত্রের আবেদন—নারীর অধিকারের দাবি
যেখিলেই বুঝিতে পারি। Nemesis
আসে। কবির অমর বাণী কেবলই কাণে
বাজে—

বারে তুমি নীচে ফেল তা তোমারে
বংশিবংশে নীচে।

পক্ষান্তে রেবেছ বারে সে তোমারে
পক্ষান্তে টানিছে।

অজ্ঞানের অন্ধকারে

আড়ালে ঢাকিছ বারে

তোমার মল ঢাকি পড়িছে সে ঘোর
ব্যবধান।

সত্যই ও আমরা নিজে হাতে আমাদের
অন্ধত্বজন আনিয়াছি। আজ এই চারি জন
শিক্ষিত নারীকেই এই কথা বুঝিতে চাই-

তেছেন তার মধ্যে অনেকখানি ফাঁকি আছে,
আর আছে ঘেঁষ, ঘেঁষ ও বাধা। কিন্তু একটা
বড় জিনিষও আছে সেটা হিন্দুসমাজে নারীর
উপযুক্ত আসন পাইবার উদ্যম আকাঙ্ক্ষা।
এই রাগের বেগের মধ্যে হয় ত অনেক
অসত্য আছে তাহা স্বাভাবিক। আমাদের
তর্কবিপ্লবজের বিবদমান অবস্থায় বিকল্প
হইল যে ভাষা ব্যবহার করেন, তার তুলনায়
নারীর এই প্রকাশ সংযত। তাঁহারা অনেক
কথা বলিয়াছেন—কাণে বড় কটু লাগিতেছে
কেমনা কথাটা শুন। কিন্তু শিক্ষার প্রসারের
সঙ্গে সঙ্গে নারী যে নিজের প্রাপ্য অধিকার
সমাজের নিকট কাটিয়া লইবেন ইহাতে
ফেরান সম্ভব নাই। ‘বঙ্গদর্শনের’ নবীনা
ও প্রবীণাকে মনে পড়ে—সে শূন্য ছিল
ভৈরবী, আশাবরী, কিন্তু রমলা, গোয়ালায়ী
ও সত্যাবালা যে হর তুলিয়াছেন তাহা এক-
কাবে দীপক। ‘আশা’ আছে এই আশা
সমাজের সার্বজনীন রানি পুড়িয়া একদিন
মন্ত্রারের বধনে বাঙ্গলার পনাজ নতুন ঐ
ধারণ করিবে।

তার একদিকে হর বাজিতেছে পতিতার
প্রতি ককণা—তীবে প্রেম। নবীন সেনের
‘আমার জীবনে’ (১ম ভাগ) এই ককণার
স্বপ্নপাত, এবং ‘নারায়ণের’ বৃক্ষে পণিকা-
তদের প্রতিষ্ঠা। শরতচন্দ্রের ‘চন্দ্রমুখী’ (দেবদাস)
নারায়ণ ভট্টাচার্য্যের ‘বিলাস’ (নাটক)
নরেশ সেনের চাঁপা (স্তম্ভ) আর ক্ষীরোদ
বাবুর চাঁপা (পতিতার সিদ্ধি) পতিতার
প্রতি সমবেদনায় পূর্ণ। সমাজ পতিতার
প্রতি যে ঘৃণা দেখাইয়া বাহ্যরী লম,
পতিতা ততটা ঘৃণার পাত্রী নয়। এট

ভারতেই এমন একদিন ছিল যখন এই পতিতা সমাজের হাতেই রাজকন্ডার শিক্ষা ও culture-এর তার দেওয়া হইত (বাৎসরিক খুঁজে তাহার খবর পাই)। বসন্তসেনা কথা কহেন সংগে, কিন্তু রাজকন্ডার রাজ-কন্ডা বা রাজকন্ডা কথা কহিতেন প্রাকৃত (সংস্কৃত নাটকে তাহার বর্ণেই প্রথম পাওয়া যায়)। সেই এক চারকণ্ড বসন্তসেনাকে পক্ষ পক্ষীরাপে গ্রহণ করিতে সক্ষম হইন নাই। Ode winninger-এর মৌলিক গবেষণার কল Sex and character বইখানা পড়িলে বুঝিতে পারি কোন স্তরে Pericles ও Socrates, Aspasia-র গৃহে আসিল পদ।

কিন্তু শেষতম একটা আসল কথা। গৌরবের পরামর্শ ফুটে, জীবনঃ জুলানাদি এত পোকা কথা। ন্যূনতম যে অকণ্ডের মধ্যেই পড়ুক না কেন, যেদিন মনেব মনের দেবতা জীবন—সেদিন বিদগ্ধন চিত্রামণির অভিনয় হয়। কিন্তু বিদগ্ধন ও চিত্রামণি কি ভগ্নতে হল? মদ? Watson একটু কবিতার ফোঁসিবাঁধেন একজন পরজন্মকান্তরা পতিতা একজন হৃদয়হীন স্ত্রীর ঘরে বড়—এ কথা অসীমাদ কথা চলে না। কিন্তু পতিতা সমাজকে বরণ করাও ত চলে না। জানি নন্দীয়া ছদ্ম বস্ত্র হইলে অসৌন্দর্য্য ভূমিসাৎ হয়, কিন্তু নন্দীয়ার উপকবিতা স্বীকার করিলেই তাহাকে ত বরণ করিতে পারি না। পতিতা সমাজ রানি বহন করিয়া সমাজকে সাঁচাইয়া রাখিয়াছে—এই Safety valve না থাকিলে সমাজের অবস্থা কি হইত বলা যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া পতিতার পূজা চলিতে পারে না। হতভাগিনী

Mary Magdalene-এর প্রতি করুণায় খট্টের ব্যবহার আমাদের মরণ রাখা হয়। কিন্তু কই Mary Magdalene-এর পূজা হয় না, পূজা হয়—Madonna। জানি David is the man after God's heart, কণাইজ দায় বড় হে। কিন্তু তাই বলিয়া Davidকে প্রেম্য দিতে পারি না। কিন্তু নব্যতন্ত্রের লেখকরা পতিতার বহুলা এমন করে নাহিতোছেন, এমনভাবে এই—স্বামী দেয় উক্তো পূজাধিনি দিও ছন যাবত পাইক পারিকারের মিক। পতিতার বড়ই লোভনীয় বসন্ত হইয়া উঠিতেছে। ইহা নাহিতোর পক্ষে কতিকর, সমাজ-ব্যবহার প্রতিফল। সাহিত্যকে এই 'পতিতা-প্রীতি'র হাত হঠতে বন্ধ করা অসম্ভব অস্বাভাবিক। আর দীর্ঘ মনে করেন—যে পতিতার উদ্ধার প্রয়োজন, সময়ে সময়ে তাহাদের কথাও মনে করা উচিত—তবে প্রথমে যেন ঐটিা পতিতা কবিতার 'পতিতা' কবিতা ও কবিতা গল্প বিবাদী, Maurice Maeterlinck-এর Mary Magdalene এবং গিরিশচন্দ্রের 'বিদগ্ধন' এ বিষয়ে বাবর্শ, যেখানে সেবি পূর্ণমণির সংস্পর্শে কাটাও হীরকে পরিণত হইয়াছে।

এই পতিতার প্রীতির মূলে একটা কথা আছে—সাহিত্যে বস্তুত্ব বা Realism-এর স্থান। এই সব লেখকেরা Emil Zola নাম কবিতা লোহাই দিবেন যে তাঁরা কবিতা কবিতার নিষ্ঠুর ছবি তুলিতেছেন। করানী দেশে এই লাইল কত লাইল হইয়া গিয়াছে, বাংলা দেশেও প্রথম জেঁদুরী ও অগাপক রাধাকমলের বস এজনও ছলি

Zola বৈজ্ঞানিক (Realist) বটে।
 কিন্তু তার দেশের—*Realism of vice* বা
 অসৎ বাস্তবতা—হলি আই। সে ছবি
 আঁকার ক্ষমতা অতি আকর্ষণীয়, একটি
 চিত্রের মত বিবর্তিত আছে। কিন্তু
 আত্মজীবনী "পলিকারিয়ার" উল্লেখের মাঝেই
 তার হৃদয় হতে বিগতের পরিবর্তে শিল্পিত
 আত্মজীবনী আছে। সেইজন্য Zola'র লেখাই
 নিয়ে Zola'র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্যমান করা
 হয়।

আনন্দবর্মা—বিশেষতঃ কাহিনী রচয়িতা-
 কালই ভাবভারিক—*idealistic* কাহিনীর অধি-
 কৃত্যই এখানে ফের করিয়া চাড়াইলেও এখন
 আনন্দবর্মার *Realist* চলিবে না। প্রকীর্মে
 চলিবে কিন্তু তার মিলন-প্রসঙ্গের মাঝে
 ন্যায়ের নিয়মের চর্চা করে কবী বৈদ্যনাথ
 কবী ও কুমারস্বামীর পরীচি হবি। কবীচন্দ্র
 কবী ও কবীচন্দ্রের কাহিনী প্রাচ্যের মিলন
 ঘটাইয়াছে। কবীচন্দ্রের কবীচন্দ্রের কবীচন্দ্র
 বিবর্তিত। কিন্তু এ তরুণ টেকে না, কারণ
 বাস্তবতার মনে ইহার শিকড় নাই, আছে
 কেবল লেখকের কল্পনা; যেম অর্কিডের মত
 খুঁজে বুলিতেছে। ইহার "সৌন্দর্য্য" আছে
 কিন্তু সে সৌন্দর্য্য মোঘের পুতুলের মত—
 বিকৃতী মোকানে কাঁচা ক্রীড়াতে বরকার
 হইয়া মানুষের জীবনের সঙ্গে ইহার কোন
 যোগ নাই। সেইজন্য শরৎ বাবু (মিনি
 বক্তৃতা)র প্রেত লেখক) মতই চোঁচ করিয়া
 'কল্পনা' ও 'কল্পনা' দেখিয়া আমায় সন্তোষ

কল্পিত, কিন্তু কল্পনা না, কল্পনা ইহা
 কল্পনার চিত্র নয়। কল্পিত কল্পনার
 নব্যলোকের মতই চোঁচ। কল্পিত কল্পনার
 কল্পনা উপেক্ষা করে 'viper' হইয়া আর
 কোন বিশেষণে আত্মীয়তা করিব না। কিন্তু
 হৃদয়চর্চায়ের মতই বাস্তব পরিচয় দাই
 তার মতই কল্পনার মতই কল্পনা—তাই
 চিত্রকল্পিত কল্পনার। কল্পিত কল্পনার 'কল্পিত
 ভিত্তি' প্রকৃতির মতই কল্পিত কল্পিত।
 প্রকৃতির কল্পনার কল্পনার আলপনার
 অনুর্ব্ব ভাসনের চিত্র, মনের কল্পনার
 'কল্পিত' ও মিলনবা মেলীর 'কল্পিত' হইয়া
 ও অল্পকল্পিত অনুর্ব্ব কল্পনার কল্পনার মনে
 চিত্রকল্পিত কল্পিত কল্পিত। প্রকৃতির *idealistic*
 বা ভাবভারিকের প্রেত কাল—সেই ভক্ত
 কল্পিত বাস্তবতার মনে ইহা চিত্রকল্পিত পাঁচ
 থাকিবে।

প্রকৃতির কল্পনার মনে কল্পনার মনে
 এক কল্পনার কল্পিতা বাড়াইয়াছে কল্পিত
 হইতে কল্পনা কল্পিত। এই Crossing'র
 মূখে বাস্তব পথ, আরম্ভ কল্পিত পথে চলিবে ?
 রাজনীতিকের, ন্যায়ের, সাহিত্যিকের কল্পিত
 হইয়া উঠিতেছে—ইহাকে লক্ষ্য করিতে
 হইবে, প্রেক্ষা পথ ছাড়িয়া প্রেক্ষার পথ
 বাছিয়া নইতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে
 সর্ববিধ উন্নতির ইন্দ্ৰ এই বাস্তব প্রকৃতির।
 এই বাস্তব মতের লক্ষণের মধ্যে 'কল্পিত'
 কল্পিত। দেখা যাইবে ইহা কল্পিত পথ কল্পিত
 নয়।

প্রত্যভিজ্ঞা দর্শনের ভূমিকা

[অধ্যাপক শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ এম-এ]

(১) সূচনা

পাঠক বন্ধে 'প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন' নাম শুনিয়া মনে না করেন আমি কোন অভিনব দর্শন প্রণালীর স্বরূপান্তর করিতেছি। প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন মৃতন জিনিষ নহে, ইহা ভারতীয় চিন্তা রাজ্যের একটি অতি প্রাচীন এবং দৃষ্টি সঙ্গী। কালের বিচিত্র গতিতে আজ ইহা অপরিচিত প্রাণী হইলেও এক দিন ইহার প্রভাব যে ভারতীয় সাধন কেন্দ্রের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে। আমরা 'আমাদের সত্যতার বিশিষ্ট ধারা ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে হৃদয় তাহে পর্যালোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহারা প্রত্যভিজ্ঞা-বাদের মহৎ সহজেই ধারণা করিতে পারি-
বেন। নিগম ও আশ্রম, অবস্থা বৈধ ও ভজ, ইহাদের পরম্পর সম্বন্ধ কি, এখানে সে বিচারের প্রয়োজন নাই; কিন্তু এ কথা ক্রম সত্য যে এই বিশেষ ও আগমের মধ্যেই ভারতবর্ষের মনোভাব সাধনার বীজ নিহিত রহিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতকে "নিগম কল্লত"র "পলিত ফল" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে—আমার মনে হয় এক বর্ণনা আংশিক সত্য, কারণ ভাগবত যেমন নিগমের, তেমনিই আগম, কল্লতরও "পলিত ফল"। শাকরাঙ্গ আগমের বাহ্যে কুহুমিত, শ্রীমদ্ভাগবতে তাহাই পলিত ফল রসবল ফলরূপে পরিণত। সেইজন্য প্রত্যভিজ্ঞা শিষ্যের আগমের শৈবায়নের

স্বায়ত্ব রূপ। শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বন করিয়া শৌড়ীয়া বৈষ্ণবগণ 'অচিন্ত্য ভেদান্তের রূপ' অপূর্ণ দার্শনিক সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়াছেন। সঙ্কম, যামিনী বিজয় প্রভৃতি আগম এবং তৈত্তিরীয় সংহিতা প্রভৃতি নিগম সমুদ্র মধ্য পূর্বক কাশ্মীরীয় শৈবগণ সেই প্রকার 'ঐশ্বর্যবাদ' রূপ প্রোক্ষণ স্বরূপার আবিষ্কার করিয়াছেন। উভয়ই ভারতীয় সাধনার গৌরবস্তম্ভ।

(২) নামকরণ

'প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন' নামটি যে খুব পুরাতন তাহা নহে। সাধকগণ সর্বদর্শন সংগ্রহে এই নামটি সঙ্গপ্রথম প্রয়োগ করিয়াছেন এবং আশ্রম ও গ্রাহ্যরই অনুসরণ করিয়া এই নামই গ্রহণ করিয়াছি। প্রত্যভিজ্ঞা শব্দ, ঐশ্বর্যপ্রত্যভিজ্ঞাবিশিষ্ট প্রকৃতি প্রাচীর গ্রন্থের নামকরণে প্রত্যভিজ্ঞা শব্দের ব্যাক্যের আছে বটে, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস উহা জায়, বৈশেষিক প্রকৃতির মতন দার্শনিক সিদ্ধান্ত বিশেষের স্বাক্ষর নহে। স্তর নামকরণে গোপাল ভাণ্ডারকার বলিয়াছেন যে কাশ্মীরীয় শৈবগণ হই 'ভাগে বিভক্ত—প্রথম, স্পন্দ শাস্ত্র; দ্বিতীয়, প্রত্যভিজ্ঞা শাস্ত্র। স্পন্দ শাস্ত্রের প্রত্যয়ক ইহা শুণ্ড এবং প্রত্যভিজ্ঞা শাস্ত্রের প্রত্যয়ক সোমানন্দ। এই বিভাগ ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে কিরূপে সত্য হইলেও বিচার দৃষ্টিতে বাস্তবিক। কারণ স্পন্দ ও প্রত্যভিজ্ঞা

প্রতিপাদক গ্রন্থে অবাক হই একটি বিষয়ে কিকিয়ার যতভেদের অভ্যাস থাকিলেও উভয় শাস্ত্রের মূল সিদ্ধান্ত ও আলোচনা প্রণালীতে কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। সুতরাং প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন শব্দে 'স্বপ্ন' ও প্রত্যভিজ্ঞা উভয় মতই বুঝাইয়া থাকে। প্রাচীন সাহিত্যে 'জিক দর্শন', 'মাহেশ্বর দর্শন', প্রভৃতি নাম বিশেষ প্রচলিত ছিল, কিন্তু মাধবাচার্য্যের অন্তর্করণে এখন প্রত্যভিজ্ঞা নামই অধিকাংশ স্থলে প্রচার লাভ করিয়াছে।

(৩) প্রত্যভিজ্ঞাসম্মত অদ্বৈতবাদ

বহিঃ আগম এবং উপনিষদে দ্বৈত, অদ্বৈত, ত্রৈত্যদ্বৈত প্রভৃতি সকল প্রকার দার্শনিকবাদেরই মূল স্বরূপ। দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি অধিকারভেদ এবং কতি বৈচিত্র্যবশতঃ কোন কোন প্রধান কোন একটি বিশেষ সিদ্ধান্তের প্রাধান্ত অঙ্গীকার করিয়া প্রবর্তিত হইয়াছে। শঙ্কর, রামানুজ, মাধব প্রভৃতি আচার্য্যমণ্ডলীকৃত উপনিষদ ও গীতার ভাষ্যাদি কুলনা পূর্বক আলোচনা করিলে ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। ইহা অবশ্য সত্যবতঃই হইয়া থাকে। সকল ব্রহ্মশাস্ত্রের আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের ইতিহাসেই ইহার সূত্রান্ত আছে। আগমের কাহা প্রমাণ সেই প্রকার কাশ্মীরীয় শৈবসার্বভৌম অদ্বৈতবাদই গ্রহণ করিয়াছেন, এবং এই বাদের মাধবাচার্য্য প্রদর্শন করিয়া তত্ত্ব একটি অভিন্ন দর্শন শাস্ত্রের নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের ইতিহাসে এই অদ্বৈত সিদ্ধান্ত ইন্দ্রবজ্রবাদ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। আচার্য্য্য অভিনব গুপ্ত এই সিদ্ধান্তের সর্বপ্রথম ব্যাখ্যাতা।

(৪) অদ্বৈতবাদের প্রকারভেদ

আচার্য্য্য গোড়পাড়ি মাণ্ড্যাকারিকায় এবং আচার্য্য্য শঙ্কর শারীরিক স্বরূপ ও উপনিষদাদির ভাবোক্ত অদ্বৈতবাদের যে ব্যাখ্যা প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন আজকাল সাধা-বগতঃ তাহাই অদ্বৈতবাদ শব্দে একমাত্র অর্থ বলিয়া পরিগৃহীত হয়। বলা বাহুল্য, ইহা সমীচীন সিদ্ধান্ত নহে। অদ্বৈত প্রহ্লাদ নাম প্রকার, ব্রহ্মবাদ তাহারই অন্তর্গত মত বিশেষ মান। শ্রীকৃষ্ণ, রামানুজ, বরহ প্রভৃতির সিদ্ধান্ত ঐটি অদ্বৈত মত নহে, এ কথা নত্যা-ন্য। কিন্তু ঐটি অদ্বৈতবাদ ভাবতী দর্শন শাস্ত্রের ইতিহাসে কোন যথেষ্ট বিবরণ ছিল না।

লৌকিক অদ্বৈতবাদী ছিলেন। বৃহদারণ্য 'জয়দ্বাদী' এক নামটি ছিল, এ কথা আমরা নিম্নে আপন কোষ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। 'জিক দর্শন' নামও আছে বহু প্রকার। বিশেষতঃ অঙ্গীদর্শন নামে বিদিত। বৌদ্ধ 'স্পেন্দ্য' দর্শন ও 'জয় দর্শন' মতাদেশীয় মতাবলীর নাম আছে, এবং এই সকল বাদের বিচ্ছিন্ন মত পরস্পর কালে মৌল্যাত্মিক, বৈদ্যাত্মিক, যোগাচার ও আধ্যাত্মিক এই চারিটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। তথাপি সকল মতেই যে ভাবপর্য্যায় আধ্যাত্মিক প্রবর্তিত শব্দ-বাদে গিয়া বোধিচিত্ত বিবরণকার স্পষ্টাক্ষরে সীকার করিয়াছেন—

"জিহ্মাপি দেশনাভিরা শূন্ততাবয়লক্ষণা।"

এই শূন্তবাদ কঠোর অবয়ববাদ—সৎ, অসৎ প্রভৃতি কোটি চতুর্দশ হইতে বিশদ্বুক্ত করিয়া এবং সুক্তির সহায়তার মাণ্ড্যাকাদি আচার্য্য্য-এই শূন্ত তত্ত্বকে বৈদ্যবিকল্প হইতে সর্বতো-

মধ্যে। প্রকৃতভাবে মারাকে ১৭ ও ১৮ এই
 দুইটি হইতে বিলম্ব এবং অনির্জনীয়
 প্রণয়। অস্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু,
 শৈবাচার্য্যের বলেন, ইহাতে দ্বৈত ভাব হয়
 নাই। কারণ পরমার্থদৃষ্টিতে মারার বস্তু
 তখন ব্যাক্যের ভূমির সত্যতা অথবা বিচার
 ভূমির অনির্জনীয়তা বস্তুতঃ প্রত্যেক পরিত-
 যুক্ত স্পর্শ করে না। এ কথা সত্য। কিন্তু
 তাহা হইলেও অবৈতন্ম্যের সাক্ষ্যে মারার, যে
 সাক্ষ্যের হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই
 যে জীব জড়াত্মক বিশ্ব বৈচিত্র্য, ইহার উত-
 কি? মূল বস্তু এক অথবা জ্ঞানতত্ত্ব তখন
 এ বৈতন্ম্যের হয় কেন? আর কতাব
 কাছেই বা হয়? অজ্ঞানের আশ্রয় কে,
 জ্ঞান কে? দৈর্ঘ্যাদি ঘটনার অনাদি ও
 পরমপারিত্যক বস্তুই প্রকৃত অজ্ঞান। এত
 প্রকৃতি বিবর্তীত্বক অনাদি প্রবর্তমান ব্যবহারের
 অধিষ্ঠান বা অধিকরণ মাত্র। ইহার কর্তৃত্ব
 বা স্বাতন্ত্র্য করিত, বাস্তব নহে। কল্প করনা
 করে কে? জীব অথবা দৈব—এই দুইই।
 পরমপারিত্যকে এই দুইই বাবর্তীয় বস্তু তাহাতে
 আরোপিত বা অধ্যস্ত হয়। কিন্তু বস্তুতঃ
 প্রকৃতি ইহাতে প্রবর্তন বা দৈবত্বের কি প্রকারে
 যে প্রকৃতি তাহা বুঝা যায় না। প্রবর্তনকে
 জ্ঞানাদি বস্তুই চূর্ণ করিয়া থাকিতে হয়।
 অজ্ঞানের প্রবৃত্তি কোথায় হইতে ও কেন
 তাহার উত্তর নাই। স্বপ্রকাশ চিরজ্ঞান
 জ্ঞানব্রহ্মকে কল্পনা, অজ্ঞানিকতার কোথা
 হইতে উদ্ভূত পণ্ডিতের করে। জ্ঞান অমর
 অবশ্যভাবে তাহার অমর হইয়া তাবশ্যকে
 অথবা অবশ্যক হইয়া নহে। সত্যই কিন্তু
 অজ্ঞানের প্রবর্তনিকার বস্তু বস্তু হয় না
 তখন তাহা কিয়ৎ দৈবত্বের কিয়ৎ দৈবত্বের

মধ্যে অজ্ঞান করিয়া আবিষ্কার করিবার
 চেষ্টা বাতুলতা মাত্র।

দৈর্ঘ্যাদি বস্তুও অজ্ঞান আছে, মারার
 আছে—কিন্তু তাহাও প্রবৃত্তি আকর্ষক নহে।
 উহা আচার্য্য স্বাতন্ত্র্যমূলক অর্থাৎ স্বকো-
 পরিপূরিত রূপ। নতুন জ্ঞানব্রহ্মই মারার
 প্রকারে অজ্ঞানকে প্রবর্তন করে।
 আপন ইচ্ছা মারাই মারার ভূমিকা গ্রহণ
 করেন। তিনি স্বতন্ত্র আপন স্বরূপ চাকিত্তে ও
 সমর্থত্বলিখে ও সমর্থ অথচ স্বরূপ চাকিত্তে তখনও
 তাহার অনাবৃত্তরূপ চূড়ান্ত হয় না। অজ্ঞান
 তাহারই স্বাতন্ত্র্যশক্তির বিস্তারিত মাত্র। যেমন
 নবিত্বের আপন সত্তা মধ্যে আপনাকে
 আচ্ছাদিত করেন, এ-ও সেই প্রকার। অজ্ঞান
 আচ্ছাদিত করিয়াও স্বাভাবিক অনাবৃত্তরূপে
 থাকেন। কারণ তাহা না হইলে স্বতন্ত্র
 প্রকাশ করে কে? এই রূপ বিবর্তনিত্ব
 আপন স্বরূপেরই বিশেষত্ব। মারার
 জ্ঞানপর, মারাই প্রত্যক্ষ অজ্ঞানের হেতু।
 প্রাকৃতিক আচার্য্যের মারার মারার কিয়ৎ? ইচ্ছাই
 প্রত্যক্ষ। লক্ষ্যবাদী যে এ স্বরূপ একেবারে
 মানেন না তাহা নহে। অজ্ঞান যে আচার্য্যের
 শক্তি তাহা তাহাকে প্রকারে করিতে হয়।
 তবে দৈবত্ববাদী বলেন, ইহা স্বাতন্ত্র্যমূলক,
 স্বাতন্ত্র্যমূলক, কর্তৃত্ববস্তুর প্রবর্তন বস্তু ইহা
 স্বতন্ত্র মূলক কিংবা অধিষ্ঠান চৈতন্যমূলক, এই
 বস্তুই প্রধান ভেদ। অর্থাৎ মারার বৈতন্ম্য
 মতে মারার স্বাতন্ত্র্য, স্বাতন্ত্র্যমূলক, এক, সত্য,
 নির্ভর, নির্ভর্য্যক, অনাদি, অমর, সত্য,
 সত্য দ্বিতীয় ও মারার হেতু, তাহাও স্বাতন্ত্র্যমূলক,
 স্বপ্রকাশ, স্বাতন্ত্র্যমূলক—কিন্তু তাহাও কর্তৃত্ব
 নাই। কিন্তু অজ্ঞান সত্য অমর সত্য

বিশ্বই আশ্রয় করায়। জ্ঞান ও জিহা তাঁহার নিকট এক, সাধারণ জ্ঞানের জিহাই জ্ঞান, জ্ঞানই জিহা তাঁহার দশ, এক তিনি কর্তৃত্বের বলিয়া তাঁহার জ্ঞানই জিহা। এই জ্ঞান ও জিহা উদ্ভূতের নাম ইচ্ছা। তাই তিনি ইচ্ছাময়, অথবা ইচ্ছাশক্তি প্রকৃতিমান, অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্যময়। ঐশ্বর্য, বিশ্বই পূর্ণবস্তা প্রকৃতি এই স্বাতন্ত্র্যই রই নাশাস্বর।

জাগ্রতমগত আত্মা সর্বদাই পঞ্চকৃত্যকারী—ইহা তাঁহার অসাধারণ স্বভাব। সৃষ্টি, বিস্তি, সংহতি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং বিলয়—এই পাঁচটিকে পঞ্চকৃত্য বলা হয়। শাক্তবক্তে ব্রহ্ম এতৎস্বভাবক নহেন। সেই ব্রহ্ম ব্রহ্ম-বাস্তবে আশ্রয় স্বরূপ তেমন নাই বলিয়া আত্মা সত্য হইয়াও অসংকর। মহেশ্বরাম্বর বলিয়াছেন—“ভক্তি হি অদ্বৈতমাগ্রহণোপ-পাদ্যমান মপি দ্বৈতকল্যানেবাধিরোহতি, যদত্র সত্যাসত্য ব্যবস্থা ভেদোপাধেয় কল্পনায়াং ভেদেনবাক্যেণ দ্বৈতভঙ্গ্যাদা পূর্ণাবলিহিতমনি-বার্ণ্যম্।” জিহ্বাধর্শন যোবতর অদ্বৈতবাদা, সে অদ্বৈতবাদের নিকট সম্যকভাবে সিদ্ধান্ত যেন জ্ঞান বলিয়া বোধ হয়, যেন হয় যেন শাক্ত মতে দ্বৈতভাষ্য বক্তব্য: বর্জিত হয় নাই। সংবিহ্বল্যে আছে—

“দ্বৈতাদভ্যসত্যকল্পমপ্যসত্যমাত্মাভ্যসত্য-
তদুদ্বৈতে বত পৰ্যাবল্যতি কৃতং বাজাঃ-

দ্বিবিদ্যা।

এতে তে পরমেস্বতাদনিয়ম। কল্যাণি

কল্যাণি-

প্রত্যক্ষিতা লক্ষ্যের ভূমিকা
পরিচয়, পৃঃ ১০, প্রত্যক্ষিতা লক্ষ্যের ভূমিকা
পরিচয়, পৃঃ ১০, প্রত্যক্ষিতা লক্ষ্যের ভূমিকা

প্রত্যক্ষিতা লক্ষ্যের ভূমিকা

প্রত্যক্ষিতা লক্ষ্যের ভূমিকা

যেন হয় জ্ঞান শাক্তির বেদান্তেই বক্তব্য
ভীত এক, এই বক্তব্যে আদিত দেববিশ্ব
স্বতন্ত্র্য: অসংকর। উহা বিচারে দৈবত
কোটিতেই আদিত্য পড়ে। জাগ্রত মতে
অদ্বৈত শাক্তবক্তেই—এই নিত্য নামরত্ন।
শাক্ত বক্তব্য মতা বক্তব্য মাঝকে অনিশ্চয়নীয়
বলিয়াছেন বলিয়া বক্তব্য অদ্বৈত ভাবের
ইংকর বক্তব্যেই চিত্ত কল্প হইয়াছে ততই
যেন পূর্ণত্বের প্রকাশে জাগ্রত, পূর্ণত্বই।
তিনি মাঝকে মতা বলিয়া স্বীকার করিতে
পারেন নাই, তাই তাঁহার অদ্বৈতভাব সম্যক-
বক্তব্য (relative), সম্যকমূলক (mixed
or reconciliation or elimination),
অদ্বৈত কিংবা একমূলক (all embracing
one) নহে। জাগ্রত বক্তব্য, ব্রহ্মাধর্শন,
অথচ এক মতা কিন্তু বিচার দৃষ্টিতে মাঝ
মদ্য: বিরকণ। কিন্তু মাঝকে স্বীকার
করিয়া তাহাকে ব্রহ্মময়ী, নিত্য, সত্যবক্তব্য
বলিয়া নামিলে এক ও মাঝের একরূপ হইক।
এই একরূপ মাঝকে ত্যাগ করিয়া তা
কৃত্য বোধে নহে, তাহাকে জাগ্রতই বলি
বোধে—মেঘে বৃক্ষশক্তি আবৃত হইলে আমরা
বলিয়া থাকি মেঘে বর্ষাকে আচ্ছাদন করি-
য়াছে—কিন্তু এ মেঘ নিজেও কি বর্ষা হইতেই
প্রসূত নহে? মেঘ কি স্বীয়ই যদিহা নহে?
জড়তা: বর্ষাও মাঝ, জেগে তাহাই, বক্তব্য
জাগ্রতই শক্তি। জাগ্রতমগত ভেদনই
এক হইতেই আদিত্য হই, জাগ্রতই জাগ্রত
আদিত্যবক্তব্য। কহে, আদিত্য, প্রত্যক্ষিতা
প্রত্যক্ষিতা লক্ষ্যের ভূমিকা। জাগ্রতই জাগ্রত
জাগ্রত। জাগ্রত নিজেই যেন নিজেই জাগ্রত

দ্বারা অর্থাৎ নিকশক্তি মাধ্যমারা সাক্ষ্য
কলেন—অবির চাক্ষুশিক যেন একান্ততঃ
রক্ষা পড়েন না। কারণ তিনি অনাবৃত-
রূপ। তাই বলিতে হয়, এইই তাহার
আবরণ, আবার তিনিই তাঁর উল্লীক।
তিনি ছাড়া আর কিই বা আছে? ব্রহ্ম ও
মায়া একই বস্তু—ব্রহ্ম সত্ত্ব, মায়া মিথ্যা,
এ কথা বলিলেই প্রকারান্তরে দ্বৈতত্ব
আসিয়াই পড়ে। যে অবস্থায় মায়া
এ অবস্থায় ব্রহ্ম ও মিথ্যা—কেন না, মায়া
মিথ্যা অস্তিত্ব করিতে গেলে—মায়ার সা-
ধীকার অপরিহার্য, আর মায়া সীমার
করিমেই সে অবস্থায় যে ব্রহ্মবোধ বা
মায় কল্পিত বস্তু। একথা বৈদান্তিক ও
নানানভাবে অঙ্গীকার করিতে চেষ্টাছে তার
মহাকে সত্য বলিয়া খুলিলে ব্রহ্ম ও মায়া।
মায়ার বৈচিত্র্য অনুসারে এই এক-বোধও
বিচিত্র হইবে—অর্থাৎ সকল বোধই সমভাবে
সত্য। তখন জগতের দ্ব্যর্থীয় পদার্থ—ব্রহ্মরূপে
প্রতিষ্ঠাত হইবে—সকলই যে সত্য, সকলই
যে বিশ্বয় ও আনন্দময় তাহা উৎকৃষ্ট হইবে।
‘সবঃ স্বধিবৎ ব্রহ্ম’ এই উগনিবদ শাস্ত্রাভ্যাস
সার্থকতা লাভ করবে। মায়া মিথ্যা
তৎপ্রযুক্ত জগৎকে ত্যাগ করিয়া নহে,
তাহাকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মলীলা ও তাহার বিকাশ-
রূপে অস্তিত্ব করিতে, আনন্দন করিতে
পারিলেই তবে জীবনের সার্থকতা সম্পন্ন
হয়। পক্ষি মতা, হুতরা জীব ও জগৎ
সত্য—মিথ্যা মনে, তাই সত্য বস্তুতঃ মিথ্যরূপ।
বৈচিত্র্য একেই বলায়; তেজ অভ্যন্তরেই
আত্মপ্রকাশ, অস্তিত্ব মরীচি মালা শিবরূপ
তথ্যের আপদারই হুতরা—অন্ত কিছ

নাই। ভগবান শঙ্করাচার্যের “তম প্রকাশ বদ
বিকল্পোঃ” কথাই যথার্থ অঙ্গীকার করি-
বার একথা বুলা বাইতে পারে যে আলোক
ইহঁতের স্বর্ণবসন্তঃ অঙ্গকারের আবির্ভাব হয়,
যাওয়ার অঙ্গকারই স্বর্ণবসন্তরা আলোকে পর্য-
সন্ন হয়। তাইই নিত্যসংযুক্ত, ব্রহ্মে সময়স
তাবাপন্ন—যখনে প্রাধান্তের বিকাশ হয়, সেই
প্রাধান্ত অনুসারে ব্যাপদেশ হয়। আগম
শাস্ত্রের ইহাই সিদ্ধান্ত। পূর্ববর্তীতে প্রকৃতি
কিবা প্রকৃতি হইতে পূর্বব একান্ততঃ পৃথক
নহেও, হইতেও পারে না। বাহ্যারা তাহা
করেন তাঁহারা শুধু logical abstraction
এর দ্বারা তহ বিস্মরণ করেন মাত্র। বস্তুতঃ
সংখ্যের প্রকৃতি পূর্বব বিবেক অর্থও পৃথক-
করণ নহে, তাহার প্রমাণ সাংখ্যকারিকা
ও যোগভাস্যে স্পষ্ট পাওয়া যায়। সে
আলোচনা সমন্বয়ের করিবার ইচ্ছা রহিল।

স্পন্দ শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—

“ইতি বা বস্তু নৃপকল্পিঃ জীভাক্ষেপালিনঃ অর্থঃ।
স পশুন্ গন্ততঃ বৃত্তো জীবমুক্তো ন সংশয়ঃ।”

ইহঁদের তাৎপর্য এই যে, জীবমুক্ত সকল
জগৎকেই আত্মজীভা অর্থাৎ আত্মশক্তির
বিশ্রামরূপ নিরীক্ষণ করেন, তাহার যোগা-
ত্বা কখনও ভয় করেন না। ভেদ ও অভেদ,
ব্রহ্মান ও নিরোপ উভয়ের মধ্যে সামান্য দর্শন
হইলে আর কোন আশঙ্কা থাকে না—
কারণ হইতে এক রকম। ইহাই শিবশক্তির
সামঞ্জস্য বা চিদানন্দলাভ। ইহাই জীবদ্বন্দ্ব-
বাদের বিশিষ্টতা।

(৬) প্রত্যক্ষিতা দর্শনে জ্ঞান ও সত্যের

সামঞ্জস্য

এই অবস্থায় আর একটি বিশেষ

বোধিসত্ত্ব (৩ : ২৪৩-২৪৫) বহুবিধ
বলিয়াছেন—

‘বৈতন্য মোহায় বোধোঃ প্রাপ্তে

বোধে মনীষয়া ।

তত্ত্বার্থ কল্পিতং বৈতন্যমদ্যতাপি দুঃসমম্ ॥

জ্ঞাতে সমবসাদে বৈতন্যমদ্যতাপমম্ ॥

‘মিত্রায় বিব দ্বন্দ্বো জীবাত্মনামাত্মনোঃ’

অদ্বৈতভক্তি কি এবং তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ

কি প্রকার ইত্যাদি সে বিবরণ এখানে দিয়াছেন

জন । নারায়ণতীর্থ তাঁহার চরিত্রচরিত্রিক

নামক শাণ্ডিল্যসূত্রের ভাষ্যে এই ভক্তির

বিস্তারপূর্বক ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং তাহার

বহু স্থলে ইহার এসকল আছে । ‘বিশুদ্ধা বহু

জ্ঞানবশে আছে (২০ অধ্যায়, ৩৩-৩৫)

প্রকাশ সার পরমতত্ত্ব অপরোক্ষ রূপে অস্বা-

ভিন্নভাবে সাক্ষাৎকার করিয়াও সৌন্দর্য্য বান

পরম ভক্ত প্রীতির সহিত তাহার সেবা

করিয়া থাকেন । সেবা করিতে গেলেই

সেবা সেবক ভাব চাই, অদ্বয়বস্তুর এ

ভাব কি প্রকারে সম্ভবপর ? তাহা বলি

হইয়াছে—ভেদ ভাব অবলম্বন করিয়া সেবা

করা হয়, ইহা অবশ্য অস্বাভাবিক, কিন্তু

নহে । পরম কৃষ্ণ সাক্ষাৎকরণ, সেখানে ভেদ

ভেদ নাই—সেটা সঙ্গীতের ন্যায় । তাহা

এ ভেদ আবরণ করিবার প্রয়োজন কি ?

মিত্রায়ের আশ্রিত কিছুই নহে, কেউ ভেদ

ভাবের স্বরূপ—

‘বহু (অর্থাৎ পর) পদম্ প্রোক্তভাষকং ।

ইতি কৈবল্যকর্মস্বীকৃত্য কৈবল্যকর্মজনাৎ । ৩১ ।

কর্তব্যতঃ স্বরসতো জ্ঞানতাপি স্বাবশ্যমদনং ।

বিত্তবৃত্ত্যব্যাহত্যা সৌখ্যেইত্যন্ততঃপরৈঃ ॥’

ইহা বহুতে পাওয়া যায় যে, জ্ঞানানন্তরও

ভক্তি থাকিতে পারে । ইহা কৈবল্যকর্ম

বলিয়া ভক্তি, অজ্ঞানমূলক বৈতন্য বা সাদিন

ভক্তির মতম স্বার্থীভূতস্বাদিনাশক নহে । অদ্বৈত-

ভক্তির পক্ষেও একটা ভেদ আবশ্যক—ইহা

কল্পিত এবং জ্ঞানপূর্বক । আর এক কথা,

জ্ঞানের পর যে অদ্বৈতভক্তি সকলেরই আসিবে

এমন কথা নহে । যাহার হৃদয় স্বাভাবিক

ভক্তিপ্রবণ তাহারই অদ্বৈতভক্তির উদয় হয়,

জ্ঞানার্থীর ইহা হয় না ।

কিন্তু উদিত হউক আর নাই হউক চব্বসে

জ্ঞান ও ভক্তি একাকার হইয়া যায় । যাহাকে

ভক্তি বা স্বাভাবিকতার বলা হয় তাহা

জ্ঞানের সীমা ও প্রেমের ও চরম—এই জন্ত

ইহা সমন্বয়ভূমি । এখানে তর্কই উভয় সোত

প্রবাহিত হইয়াছে ।

দাস্তাত্মক ভক্তিই ত্রিকদর্শনে অঙ্গীকৃত

হইয়াছে । ভগবান্ প্রভু, পিতা অথবা গুরু—

ভক্ত দাস, পুত্র অথবা শিষ্য । শুধু ত্রিকদর্শন

নহে, শৈবগম মতেই এই ভাবের প্রাধান্ত

হইয়াছে । বীরশৈবাদি মতেও এই সিদ্ধান্ত

স্বীকৃত দেখা যায় * । শাক্তগণেরও মতঃ

এতদনিয়ে কোন প্রভেদ লক্ষিত হয় না ।

তবে পিতৃত্ব স্থানে মাতৃত্ব সেখানে করিত

হয়, এই মাত্র বিশেষ । কিন্তু এই ভাবত্রয়ের

মাধ্যমাত্মকতাই মূলভূত, তাই ইহারই প্রাধান্ত

কীৰ্ত্তিত হইয়াছে । বলা বাতুল্য, ভক্তির মূল

তত্ত্বই যে দাস্তাত্মকতা তাহা স্বীকার করিতে

হইবে । শান্তভক্তি ভক্তির সুরূপ অবস্থা মাত্র,

একটু বিকসিত হইলেই তাহাতে দাস্তাত্মকের

রসন লাগিয়া যায় । অদ্বৈত বহুতে বৈতন্য

এই যে অনন্ত কাল ইহা নিজেই আঁখি ভিন্ন
অপার কিছু নহে। এই যে ত্র্যমুখ হইতে
শাক্তসম ও তদনুসার রাজ্যনির আবির্ভাব
হইয়া থাকে, থাকে কিংবা, দ্ব্যস্তানিতে সে
ত্র্যমুখ অল্পবৃত্ত থাকে—অথচ জাহ্নবী
উপরে শুদ্ধ আত্মকৃত সর্বের লহর ধোঁয়া।

অনুভব চাপা থাকে—আজ্ঞার বৃক
আলোরই লহর নাচিয়া বেড়ায়। এই
লহরই “উজ্জ্বল” আরম্ভ। ইহার বৈচিত্র্যই
জীবারিষ্ঠার। এ লহর শুদ্ধরূপে চির অকর্ষ-
মান, তাই বৈষম্যবর্ণের জায় শৈবগণ নিত্য-
জীবা মানিয়া থাকেন। তাই কেমনকি
শিবকে “কৈলাসাসিধি” নিত্যপ্রবর্তমান প্রমোদ
নির্ভরজীভাময় লোকান্তর প্রত্যয় বিস্তার-
রিত্রে” * বলিয়া শুভচিত্তামণির টীকাতে বর্ণনা
করিয়াছেন।

কিন্তু ভক্তি যে রসরূপ তাহা কেহ কেহ,
বিশেষতঃ আনন্দারিকগণ, স্বীকার করেন না।
কাব্যপ্রকাশকার মন্ড, রসপ্ৰকাশকার
শক্তিভট্টাচার্য জগদীশ প্রভৃতি আনন্দারিকগণ
ভক্তিকে প্রায়কোটিতে নিক্ষেপ করিয়াছেন।
কিন্তু ইহাতে কোনই বিপ্লব নাই। সাহিত্য-
স্বাক্ষরী অচ্যুত দ্বার দেখাইয়াছে যে, স্বীকার
“অথেষ্টা সর্বভূতানাম” ইহাতে “সো মদভক্তঃ
স মে প্রিয়ঃ” পর্যন্ত বাক্য হইতে জানা যায়
যে, মুখা ব্যক্তি জীবন্তিকই নামান্তর।
জীবন্তিক বিবেকে বিভ্রান্তশাস্ত্রীও সেই কথাই
কহিয়াছেন—“জীবন্তিকঃ হি প্রোক্তা বিহৃতভক্ত
কথ্যতে”। এই ভাবে দেখিলে ইহা কতটা
শাস্ত্রসম্মত অনুভব হইয়া পড়ে। আনন্দ-
রিকগণ, সেই ভক্তিকে যতদূর সম্ভব
*

স্বীকার করেন না। অর্থাৎ মুখা ভক্তি যে
রস সে বিষয়ে আনন্দারিকগণ অসম্মত নহেন,
তবে তাহা শাস্ত্র রস হইতে ভিন্ন একথা
মানিবার হেতু নাই। অপর পক্ষে, তত্ত্বগণ
যাহা বলিয়া থাকেন তাহাও সত্য। তাঁহারা
বলেন— ভক্তি যখন অদ্বৈত আনন্দভাববিশেষ
বৃত্তিবিশেষ, তখন তাহার রস স্বীকার করা
বাঞ্ছনীয়। সাহিত্যসাধকের টীকাকার সঙ্গীতগণে
বলিয়াছেন যে, ভক্তি মুখা ও গোপ, বা পরা
ও অপরাভেদে দ্বিবিধ। অমকারশাস্ত্রে মুখা
ভক্তি শাস্ত্রসম্মত অতর্কিত ও গোপভক্তি ভাব
মাত্র। ভক্তিশাস্ত্রে শাস্ত্ররস নিজই ভক্তি-
বিশেষ, মুখা ভক্তি রসস্বরূপ।

শাণ্ডিল্য ও নারদ আপন ভক্তিসূত্রে,
মধুসূদন সরস্বতী ভক্তিরসায়নে ও জীর্ণপ
গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ভক্তির, রস
উপপাদন করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে সে সব
আলোচনার প্রয়োজন নাই। এখানে ইহা
বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, প্রত্যভিজ্ঞা দর্শনের
আচার্যগণ ভক্তিকে রস বলিয়া স্বীকার
বরিয়া অধ্যাত্মরাজ্যের একটি গভীর তত্ত্ব
প্রদীপিত করিয়াছেন। উপলক্ষ্যার্থী তাঁহার
শিষ্যপ্রজ্ঞাবলীর প্রথম ক্ষেত্রে (১) বলি-
য়াছেন—

জয়ন্তি ভক্তিঃ শিব্য রসাসব বরোত্তমঃ।*

অধিতীরা অপি নরা অধিতীরা অপি প্রভো ॥
পরাজিতর ইচ্ছাই বৈশিষ্ট্য যে, এ অধ্যায়
বিতীর্ণ না থাকিলেও বিবীর থাকে। নদীয়ার
জীর্ণোদয় এই ভক্তির আত্মভেদভেদ ভেদের
প্রচার করিয়া নিয়াছেন। সাধারণ যত
করেন যে এই ভক্তিরই নিখা হইবে তাঁহার
পূর্ণ সত্যের এককোণ মাত্র দেখিয়াছেন।

অতঃ পরে কালী, এক্ষণে হইলেক
সেই একের কোলে ছই থাকিতে পারে
যদিও সে ছইও একেরই সমতা ব ভাষা
প্রসাধন। 'ন'থ বেদ্যস্বরে কেন ন শ্যোহ
লোকক: স্থিত:। বেদ্যবেদক সংকোভে
প্যসিভকৈ স্থাপনঃ"। অন্তমুখাবস্থায় সর্ব
বেদের উপশম হইলে এককরূপে বাহার ক্ষরণ

হয়, এবং ও বৈশেষ্য সংকোভে বৈচিত্র্য
প্রশংসিত হয়। তাহা হইলে সমাবেশিকা
সংকোভে স্থিত পান। যিনি বিবর্তিত,
তিনিই স্ব-বিবর্তক—অর্থাৎ উভয়ই সমকালে;
ইহা জানি ও তত্ত্বি যেখানে সমস্ত বিবর্তিত
বিবর্তক সমস্তই সেখানে প্রকাশমান।
অতঃপর সমস্তই এখানেই। ইহাই
স্ব-বিবর্তকের বিশিষ্টতা।



মহাভা

[জীনরেন্দ্র দেব]

দেই ত মানুষ, পুরুষের জাত ;—পোঁ। যে যার বক্তরা,
সৌবন যার অক্ষয় তেজে বার্থ করেছে। হু জরা !
চলেছে জগতে পতোর পথে—নিভাঁ। নিরে শীঘ্র তুলি
অমের তরে অস্ত্রের দাস হয় নি'। জন কখন ভুলি !
জন্মভূমির অনুসঙ্গে যোগী, কঠে'। গঙ্গাস দেশের কাজে
পারিত্য যার অঙ্গভরণ, আন্দ'। দীনের সাজে !
হায় প্রমজাত শিল্পে সোহাগ, মোটা কোপীনে যে ক'। প্রীত,
কমতায় নয় খর্ব্ব কখন,—পোঁ। যে নয় দুর্কিনীত
করে নিজ কাজ নিজেরই হু হাতে, ভূজ্য মনিব উক'। ই নিজে—
বা কিছু সকলই নিজের স্বার্থে, পরশে সরসে শক্তি বীজে।
মহা মানবের মহিমায় যেবা মহিমায়িত ধর'। পরে,
স্বাধিকারে সদা অধিকার যার, প্রবাসী যে বহুে গণন করে ;
মানুষ হইয়া মানুষেরে কতু করে না সে বীত্ব পার্থ লালি,
সমান সবার মান মর্যাদা—অস্ত্রের যার রয়েছে কালি।
করকের বসে কুমণ্ডলে যে অস্ত্রের অস্ত্র প্রেমে'। রাজা—
নিপাথ কার্যে মহা অস্ত্রের কুমণ্ডল কলি'। সীত।

বন্দীর গৃহ-বন্দির দার, শৃঙ্খল তার-অলঙ্কার,
 শীঘ্রম প্রহার কঠোর হার, নির্দোষনেও নির্দিকার ।
 দক্ষ যে নহে অগ্নি ধ্বংসে, বশু যে নহে অত্রোষাতে,
 ময় যে নহে সিঁধু সলিলে, জ্ঞা যে নহে অজ্ঞাবাহতে ;
 নিন্দা, কলুষ, কলুষ, ধারে ধারে না করিতে কলঙ্কিত,
 ইত্যারিরোধী সত্যাক্রম, অজ্ঞাচারও নহে যে ভীত,
 অহিংসা যার ধর্মম গহ, তত্ত্ব যাহার চরম তাগ ;
 মরম-যন্ত্রে বাজে নিশিদিন পোনের বেদনা তুংখভাগ,
 আত্মার বলে আত্মজয়ী যে, পরমাত্মার চরণে পান,
 জীবে প্রেম যার জীবনে বত, সমান যে যোগে ধনী ও দীন ।
 দেশাত্মবোধ-ভাবন চিত্তে বিরজিত জ্যোতি কনার বলে,
 প্রতিশোধ স্পন্দ পোষে না যে জন্মে, দোষে না যে কদ
 বিরোধী সলে
 অস্পৃশ্যের স্পন্দে বাহ্যে শুচিতার বিদ্বৎ হয় না হানি,
 জাতি-ভেদ-ভাষা-ভাষাজেত ল'য়ে জাতি-জীবনে দেয় না গানি,
 সাধনা-সাক্ষর-সাক্ষরতা শুধু সাক্ষর-সাক্ষর মুক্তিলাভ,
 কামা বাহ্যের অস্পৃশ্যের জিহ্বা : স্বাভাবিক সাম্য ভাব,
 বিশ্বাস যার শিশু-নিশ্চয়ী নিশ্চয়্যে যে প্রব ধর্ম প্রণয়,
 ভক্তি কেশর শরিতর মলে ধর্ম : অস্পৃশ্য বেদান্ত-মণি
 তামোহী-সেবা কৃপার কৃপা, শব্দ-বসি নার সাহিত্য-মণি,
 বাধা অস্পৃশ্য অসীম-বর্ষা, শৌণ্ডিক-স্বর সম্বন্ধতা ;
 জটিল অটল পদ-সাক্ষরতা সূক্ষ্ম-সমানে বহুত মতি,
 বজ্রসজ্জা বাণী নিশাণে, উজ্জ্বল স্পন্দ সবার গতি ।
 নিখিল রক্ষণী জন্মা যাহার, বিশ্ব-মামব সাহার ভাই,
 সুরল উদার অস্পৃশ্য যার, "না অস্পৃশ্যতা বিলুপ্ত নাই,
 আত্মনার দেব, সূর্য, চন্দ্র, জ্যোতি,—খোলসা যে নিজের স্বীকার করে,
 আত্মসমানে পানি বিনাশনে বশু বে দেয় নিজের পরে,
 বহু-কিরণ জাতি-মর্মেয় নিখিল সাহার পতাকা তলে,
 বিরোধ-ভুক্তির সাক্ষর সবে, শত্রু—মিত্র—সাহার বলে, A B

শাপিত আলির ফলকেব মত বলকে কাছের তীক্ষ্ণ তেজ,
 স্মিত প্রশান্ত উজ্জ্বল মুখ, কীমে শুভ শাস্তি 'কেজ'।
 সিজিতে যার কোটি মৃত প্রাণে স্পন্দন পুন হ'য়েছে স্তব,
 সেই মহাক্সা অজের আত্মা আত্মজয়ের মন্ত্র-গুরু।
 অখিল ভুবনে প্রসারিত যার শ্রেষ্ঠ-সুগভীর আশীর্বাদ,
 বিশ্বের হিত—কল্যাণ ধ্যানের সমাহিত কার্য ব্যক্তি বন ;
 বুদ্ধ, নানক, কি মহাত্মা, দীপ্তর বরুণ অরণে দায়—
 মরণ-বিজয়ী শঙ্করচরণ চরণে তাহার নমস্কা ।

আমার চীন যাত্রা

(চতুর্থ)

[শ্রীকেশবদেব বন্দ্যোপাধ্যায়]

হংকং পরিদর্শনটা পদব্রজে কবিবারই
 পরামর্শ ছিন্ন হইল—পোষ্ট অফিসের পণ
 ঘরা গেল। হংকংয়ের রাস্তাগুলি তেমন
 প্রশস্ত নহে, পাছাড়ের উপর সেটা সড়কও
 নহে; তবে পরিষ্কার, এবং বড় রাস্তাগুলি
 ছইধারে ছুঁপাখ দিয়া আঁটা। ঘোড়ার বা
 গরুরপাড়ির গোলমাল নাই,—রিক্সাই মান
 রক্ষা করিয়া থাকে। রাস্তার একদিকে
 ব্যাক, পোষ্টাফিস, সওদাগরী আপিস, হোটেল
 প্রভৃতি সাহেবী দোতবে শোভা পাইতেছে,
 অপর দিকে চীনাদের দোকান। দৈনিকটার
 ঘেন্না কলিকাতার বাধাবাজার, চীনাবাজার,
 টাইলী ও সুপীয়াটার একীকরণ ঘটয়াছে,
 কিন্তু পারিপার্শ্ব্যে ও শিল্পমাবেশে তাহাদের
 অপেক্ষা ঘোঁড়া।

এটা পাছাড় হইলেও বায়গিরি ময়,
 এখানে, মুক্ত থাকিলেও তাহার দোতা

করার মত ডাব পোষ্টাফিসের। ইহারে
 উৎকর্ষ বিশ্বাস করিতে পারিলেই উদারতার
 মধ্যে পাওয়া যায়। পথেব ধারে পোষ্টাফিস
 পাকড়া নিকালের পেটের কথা তাহারই
 পেটে নিশ্চিন্তে সমাধা করিয়া, বাড়াহাড়া
 হইয়া বাজারে প্রবেশ করা গেল।

হংকংয়ের বাজারটা একটি প্রকাণ্ড পাকা
 ইমারত; দীর্ঘ প্রস্থে প্রায় ছই বিঘা জমী
 আব্বসাং করিয়াছে। চারিদিকে সু-উচ্চ
 গেট, মধ্যে তিনটি প্রবেশের বিভাগ। একটিকে
 কপি, আলু, বেগুন, মটরশুঁটি, শাকসবজী;
 একটিকে বিবিধ ফলমূল; অপরটিকে পিঁয়াজ,
 রসুন, জাড়া, লুঙ্গা, হলুদ প্রভৃতি মশলা—
 সেই একটা বিভাগগুলি পরিপূর্ণ করিয়া
 রাখিয়াছে। এরূপ বিচিত্র ফলমূলের সমাবেশ
 ও প্রচুর্য্য কতাপি দোখ নাই। কয়েক ও
 কয়েক পরিচিত কসের মধ্যে দেখা যায়

কতকগুলি কারণে পানের অয়োজনটা বড়ই ভীষণ হইয়া পড়িয়াছিল। যাহা ভাবিতেছেন তাহা নহে, —এই কল কলময় রাজ্যে প্রাণ হাতে করিয়া, ক্ষুধিত, ক্রিমিকটুকু পর্যন্ত কাহারও ছিল না। জীর্ণোত্তর প্রকৃতিটা যথেষ্ট মন্দা উদয় হইয়া একটা অস্বস্তি আনিয়া দেয়। তত্বে আশা করা যায় যে গল্পের দিন শুভবাস হইতেছিল। এতদ্বারা পানটাই সমাধি বসন্ত বসন্ত। তখনই আমাদের মধ্যে দু'একটি পানের পোক ছিলেন। তাহা চটক, একটি কৃষ্ণ বর্ণে আর দুইটি চীন পান বোচিতেছে। অতঃপর যখন জল তাহাদের নিকট উপস্থিত হয় তখন এবং দরদর না করিয়া এক জন পান খাওয়া দিবার অনুমতি দেওয়া হইল। তাহারা দুইটি কুণ্ডি বালি করিয়া পানটির আশে— “খশী” হইয়া কুণ্ডি বাগায় যেন, তাহারা তখনই নানি। অল্পদূর ভায়া বলি জন— “তা’তোকে খেতে তুমি তুমি কর” পরে খেবে, তুমি না খেবে পানে চুপ করেই প্রাণ লাগিয়ে ও, তা’ পানটিকে, রক্তাভায়ে চুপচুপে এমনি পানিয়া আশে খেয়ে দিয়া স্বন্দবাসী কাবনা দিল। তাহারা এ বিলি কর্তব্য করিতে হইল। এক্ষণে আমার চীন পণ্ডিত পৌছিবে না। তাহা হইলে কিন্তু কোন কঠিই অনুভব করিলা না। এতই যোগায়েম যে, দস্তেব নিকট যাহা খুবই বিনীতভাবে প্রার্থনামূল্য করিল। অতঃপর অপরীগুলি কীভাবে নহে, —চীনে হস্ত বটে। উত্তর চীনে পান পাওয়া যাবে না, সুতরাং উদ্দেশ্যের উপযোগী আয়োজন লওয়া হইল। প্রত্যেক পানটি এক পয়সা হিসাবেই পড়িল।

এই পণ্ডিতের শিবসম্মে উদ্দেশ্য হইল। বীচেরী, লুজাংগর প্রভৃতি বড় লোকেরা খালা বানাইয়া বাস করিয়া থাকেন। তাহানি স্বাস্থ্যকর, বিস্তারিত এবং সব সময়ই ঠাণ্ডা। নহর হইতে তাহা অর্জন করা যায় উঠে। এর নিম্ন হইতে প্রায় সাত ক্রোড় আছে, অর্থাৎ দুই লাখ। নহর ও অন্যান্য নীলদেশে পৌছিবে না। পৌছি ট্রামে (Tram-tram) যাওয়াই হইল। প্রতি দশ মিনিট অন্তর, প্রায় ৩০ জন আরোহী হইয়া পানে হইতে একখানি বাড়ি উঠে। উঠেই এক উঠে হইতে একখানি বাড়ি নিয়ে নামিছে। পানটি পানটি পানি পাতা আছে এবং প্রাণের ভায়েক পানটির (Tram-tram) সাহায্যে তাহাদের পানে ও অপরগণের পানেও হইতেছে। পানি বাস্তবিক পক্ষে হয়। তাহাতে পানটির (Tram-tram) অর্থ দুইখানি বাড়ি হইল। সমস্ত ছাড়াই মনপথে তাহাদের পানটি হইতে সেখানে একই পানটি হইবার পথে বা (Sidin) এর দিকে আছে। একখানিকে সেই (Sidin) হইয়া অপরখানিকে পথ ছাড়িয়া দিতে হয়।

আমার সহযোগী সফলতা বলা হইল। “বনে ফোঁটা বাটা দিওনা” বলিয়া প্রাণের দিকে গৌরব লইয়া বাহির হইয়াছিলেন, তাহারা এই Tram-tram এর সাহায্যে শিবসম্মে পৌঁছিব। জল প্রস্তুত হইয়া পড়িলেন। আমি তাহাদের সাহায্যে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তত্বে বলিলাম— অজিহান-বাপদেশে উত্তর চীনে চলিয়াছি, যদিও যথেষ্ট কষ্ট হইল। তাহা হইলে পথে পড়িলে

বিবর্তন সিদ্ধান্তে — নিজের মজরে
 ফেঁদে নাই, কারি, সেখানে ঘোরাকেরাতি
 পাড়ি সাহাবোই সমাধা ইকরাহিল। কিন্তু
 হুকুম সহরে, পবিত্রজে জব্বান কালে, কি
 ইরার, কি গাশি, কি কাশানী, কি চীরা,
 কি, জজরাটী, কি গারাবী, কি ঘোরাইরা
 মকলকেই বেহকাংকোজি, মকল চাকা
 পরিহার পরিহার যেনে জাতি, জাতি

আমি শুধু জানি, এক জনের আশঙ্কিত পার্থক্য
অন্য ত আর জানার কোন দরকার নেই। আমি
না, আমার এই সমস্ত ভাবনা, ভাবনা-একটা
আমি তোমার চাকুরী দিচ্ছি। আর জানার
না হয়, আমারের আশঙ্কিত পার্থক্য হয়ে গেল
খোঁজে পারে এখন।”

“কিন্তু তুমিও রাগ করে একটা হত জ্ঞান
করিস—কেবল আমার জ্ঞানের ছেলে, ও কি
কি ওর একটা হুকুম হয় না?”

“আমার আর হুকুম নেই। তুমি কি,
বাক্য ভাষার মধ্যে কেবল আমার তার আর হুকুম
কিসের? নইলে কি আমি সোনার আমায়
যায়।” বলিয়া তিনি একটা বৈদ্য সজল
চোখেই সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন।

“জাতি।”

“কি মা?”

“আমি বলি, তুমি একখানা তোর হস্তকে
চিত্ত লেখ, তিনি এসে এখন থেকে তোকে
নিজের কাছে নিয়ে যান।”

“আমি কোন্‌দিন আছি, কোন্‌দিন নেই
—তোর হস্তের বজার খাকা উচিত।”

“আমি মা না।”

“তবে মর। তোর মা পুঁসি তাই কর।
হতভাগাটা গেল কোথায়? মানিকরা বলি
ও মানিকরা।”

বলিতে বলিতে তিনি মানিকরার ঘরের
সম্মুখে গিয়া দেখিলেন, একটা কি বহনকার
মায়ায় চাকিয়া দিয়া সে উঠিয়া আসিল।

“হতভাগাটা কোথায় রে?”

সেইদিকে গিয়া কিছু কক্ষের সে কছিল,
“হি হবে তাকে নিয়ে তোমার? সে অনেক

দেখা দিচ্ছিল।
“আমি কতকাল কলি, আমার মা আর
মিলনে।”

“আমি এরমো না।”

সকলের জ্ঞান হতভাগাটা দেখিয়া গিয়া কাঁতা
হইয়া গেল। তুমি কি জানার ভিত্তি হইতে টানিতে
টানিতে তাকে বাড়িতে আনিলাম। গলা
ধারিয়া ধাক্কা দিতে দিতে তাকে ঘরে হইয়া গিয়া
কহিলেন, “বেশ একটা কাজ, না? কেমন।”

মানিকরা কহিতে উঠিয়া গেল।

রাতে অল্পক্ষণ চুল কাটিতে কাটিতে ঘরে
ঘরকে জিজ্ঞাসা করিল, “আমি আবার তোমার
কপথর ভাইটির ওয়ে কি—”

কিছু বিরক্তভাবেই বাধা দিয়া স্নেহের ভাষায়
মিল, “কি আমার হবে?” “না, তুমি নিজের
কর।” নিজে করলে তো কোথায় যাব তুমি
না, বত দোর পরের। মা এই চোখের
হিসেবের খাতা আর টাকাকড়ি কেমন দিচ্
গেলেন, তিনি আর তুমি কতকাল না।

বাতাসের বাহির হইয়া গাইতে গাইতে গিয়া
থাকিয়া থাকিয়া সে কছিল, “বেশ, তাই
হবে।”

গভীর রাতে মানিকরা ঘরের কাছে কিসের
একটা উত্তাপ অনুভব করিয়া হাতকাটা
দেখিল, পাশে কেতু শুইয়া আছে। একটা
হুদায়ে নিখাস, গেলিয়া তাকে সে লক্ষণ যুক্ত
চাপিয়া শুইয়া কছিল, “কিন্তু তুমি তুমি জ্ঞান
না বাবু?”

লক্ষণ তখন পলায়িত সমবয়সী যৌ-
দিহির ঘরে আঁকি পাতিয়াছিল এবং কোণের
তথ্য দিহির কক্ষ হইয়া প্রাচীরের নানা
বিদ্যে প্রাচীরের ভিত্তি টানিতে।

“আমি কি কখনো হইব না কেন ?”

“কেন হইবে না কেন ?”

“কেন হইবে না কেন ?”

“তবে হইবে না কেন ?”

গভীরভাবে অশ্রুপা উত্তর দিল, “তাই হতে হবে।”

হঠাৎ বাহির হইয়া গেল। মাত্র ঘণ্টা দুকিয়া ডাকিল, “তুমি নাকি না আজ যমুত দিনটা কিছু খাওনি ?”

“পোড়া পেটের জ্বরেই তো সব ভুলতে হয়—ভাবচি না খেয়ে কদিন যায় দেখি।”

মার পায়ের কাছে, বিছানার বসিয়া, হাত বুলাইতে বুলাইতে সুরেশ নিজস্বা করিল, “আমার উপর রাগ করো না।”

“আমার আবার কে আছে যে রাগ করবে ?”

“কেন আমি কি কেউ নই ?”

“পেটের ছেলেমেয়ে আবার কে কবে আপনার হয়েচে ?”

হিসাবের খাতাটা ও টাকাগুলো মার পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া সুরেশ কহিল, “তোমার দুটি পায়ের পড়ি যা, আর কখনো এমন করবো না। কেতুকে আমি কাল-ই ভাঙি করবার বন্দোবস্ত করছি। ওঠ, থাকে চল। লতি, মাকে খাওয়া তে।”

বৌদিদির ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া প্রতিজ্ঞা করিল, “তখন থেকে তোমাকে বলছি, থাকে না তো আমি কি করবো।”

“আর এই খাতাখানা আর টাকাগুলো মার কাছে ফুলে রাখ।”

কাত্যাবলী নিজস্বা করিলেন, “কেতু খেয়েচে ?”

লতিয়া উত্তর দিল, “সে, হ্যাঁ এই মান-কিয়ার কথাই খেয়ে গিয়েছে।”

“তবে আন।”

কেতুকে আনিয়া যা খাওয়াইতে বসিলেন। সে তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করিয়া মানকিয়ার কাছে গুঁতে বাইরের দরজা কিছু ব্যস্ত ছিল। কাছ থেকেই কলসীতে জল নাই দেখিয়া লতিয়ারনী চীৎকার করিয়া উঠিলেন, “টাই কবে রে এক গেলান জল দিতে হয়, তাও কি কাকর পোড়া চোখে চেকেনি। একটা লোক না খেয়ে মরচে, আর সকলে খেয়ে-দেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বুসলেই হোলো।”

কেতু কহিল, “আমার খেতে বসে তুমি পায় না।”

“তা পাবে কেন ? হতজনা হয়ে অয়েচ বে।”

গোপেশ্বরকে ছাড়াইয়া আসিয়া পিসিয়া কহিলেন, “কি হয়েছে মেজবো ?”

“কি হয়েছে ? মার ! খেতে বসিয়ে এক কোঁটা জল কোথাও পড়ি না।”

“আমি শিকি।”

অন্ধকারে হাতড়াইয়া একরকম জল আনিয়া কেতুর পাতের সামনে পিসিয়া বসিয়া দিলেন।

কেতু জল লইয়া এক চুমুক খাওয়ায় তাহার মুখে কি একটা পড়ের মতন চকচক দ্রবিল। বলিল, “একবার আকোচি বরোনা না, জলে কি হয়েছে।”

আলোর কাছে পাতটা উল্টু করিতেই সে দেখিল একটা কি ময় পোক—চিরা ভট ভট করিতেছে। লতিয়া তখন ঘর ঘরে কলসী হইতেছিল।

যা বাক্যসমূহ কহিয়া উঠিত অন্ধকার

শিখরী কপালক বৃথানীর প্রতি চাহিয়া
 সে নিতমস্তকে একেবারে কিছুই যেন হয় নাই
 দেখাইল শেষ পর্যন্ত নীরবে বহিয়া গেল।
 কহিল, “আমি তো ভাল একটুও খাটনি মা।”

রাজলক্ষীর দিকে কবায়চক্ষে একবার
 চাহিয়া কন্যায়নী কহিলেন, “একবার দেখেও
 দিতে নেই মলটার কি মরণবাচন আছে,
 জীবুর কি?”

রাজেশ্বর কাণ্ডায়নকে কহে পাওরাই
 গরিল না।

“বাবু চলে—তোমার কামাতে কোথাও
 চলে যাই। সেখানে মা-ব্যাটার নাক বো,
 আমি ভিক্ষে করে এনে তেঁকে পড়াবো।”

“না, মার্কিয়া।”

“তবে শীগগির শীগগির মানুষ হয়ে নে না
 বাবু।”

“তাই হবে।”

“তোমার খরচের ক্ষেত্রে মরকার, আমি
 মাইনের টাকা থেকে সব দেবো—তুই পড়
 বাবু।”

(২)

শিখরী উল্লেকের ধারে চন্দ্রশেখর তাঁর
 শুল্ককারে ক্ষেত্রে বুরিয়া বেড়াইতেছিল, এতৎ
 কর্তৃক কাছার তাঁত পড়ি গেল চমকিয়া চাহিয়া
 দেখিল। শ্রীপ্রতাপকান্তের প্রফেসার মস্তার
 বিবৃতিজন্য লাহিড়ী। ক্ষেত্রে ব্যক্তি পাবল
 না, একই বেষ্পর্শ তাহার গোপা কিনা।

লাহিড়ীবাবু কহিলেন, “তোমার নাম
 কল্যাণ মেজ, না?”—ক্ষেত্রে শুধু তাঁহার
 কল্যাণ কল্যাণ দ্বী নিবন্ধ করিল।

“তুমি কল্যাণবাবু কহি। একটু ক্ষে
 পড়চো—তোমার ডাইও তো তোমার সঙ্গে
 পড়ে? হুঁ তোমার পড়া তেমন হয় না—
 সাজা জাচো, ঐ যে বাংলা দেখতে পাচ্চ, না
 না এসো, আমার সঙ্গে এসো।” বলিয়াই
 তিনি ক্ষেত্রে গা-বান্দা দিয়া চলিলেন।

ক্ষেত্রে মরকার মঃ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে
 চলিল। বাড়ী পৌছিয়া কামারী রাজলক্ষী
 কোলকে বৈঠকখানা খুলিয়া দিলে—বাস্য
 ক্ষেত্রে দিকে কিরিয়া কহিলেন, “বৌসো।
 নাথ, দো পেয়ালা চা—বাঁচর কুচ বিসকুট এঁরা
 জলদি লগে দে।” জাখো, এখানে এখন
 জাখো পাখো এসো, দেখা দূর হয় না।
 বাড়াতে কাউকে বলবার দরকার নেই, তুমি
 বা হুঁবধে বোধ করবে, বুকেট? তোমার না
 কিছু? জাখো মরকার আমি বলে দেবো।
 জানবে আমি তোমার বড়, কেমন? অমুনা
 একবার এঁদের জাখো দে মা।”

মরকার এঁরা এঁরা বড়ের মেয়ে
 আসিয়া ঠিক সাবশ্রমহ মঃ বিষ্ণুগিষ্ণ চকু
 পাইয়া তাঁহার চেহারের সত্যতার উপর হাত
 দাঁড়া দাঁড়াইল। লাহিড়ীবাবু এসে। পঠ,
 লাহিড়ী মরচিও বেণীর জাখো বান্দা কহিলেন,
 “মা, এই তোমার ক্ষেত্রে।” দেখে যেন আমি
 পদ কোনো সময় বাড়ী না গাবি, তোমার
 দাদার সঙ্গে বসে না হয়। এঁরা যে লগা, তুমি
 কি মল্লব উত্তর কল্যাণ তোমার? এঁরি মনে
 “বে-বাস্য চা কোরে কল্যাণ দেখাচ।” লগ
 দাদা তোমার? না, বিষ্ণুগিষ্ণের জিহ্বা
 টিপের উপর জাখো তো অমু।”

“বাবা, শুধু বিসকুট কেন দাদার কাছে

আনালে, ওপরে যা নিজের হাতে খীর-
খোঁস, আরম্ভেশ, খাজা-টুতরী কোরেচেন,
আমি জানি। মাকো জোক জানি।”

“বাক মা যাও তেজিব তে। এখন কখনও
দিন মা। আমি তো একটা নিদ্রা বাক্য,
তুমি খিটখিট করানো জানি।”

ফেব্রুয়ারি মাসের কাক পানপানগুলি তার
মরিয়া দিয়া সে একটা ইচ্ছা করে ককি-
লাগিল। মা ককি উল্লসিত, “নাও বাক্য, খারব
ফেল তুমি, লজ্জা করানো তুমি।”

বড় কাকি অশ্রু চাপিয়া সে ককিল “না মা
লজ্জা তো করিনি।”

কোয়েলন আশ্রিত, কইচের জানলা দিয়া
দেখানো পাখিটা কটাকা আশ্রিতা অশ্রু
হাত মালিল।

“দেখা, বাক্য মাও আশ্রিতা অশ্রু একটা
বড় মজার জিনিস কোরে দেখাচেন দেখাবেন
কাজন।”

কবর তুলিয়া ফেলত, দেখিল বড় এক বিলাস
নামসে। একটি পলিকার বাক্যকে ছাল-
নারী বাক্যে ককি উল্লসিত বাক্যে একটা
খানি টেলিল, ফেব্রুয়ারি মাসের, টেলিলের
এক পাশে এসেই বিলাসবাক্যে অশ্রুমাণ
একটি মেল, বাক্যে ককি উল্লসিত।
কলমদান, কইচের দেখান, কলমপঞ্জিল।

“এ সব কেন?”

“আপনার। কলম দেখা আবার মোকা
বই-টাই বাক্যে আনতে বড় ককি হয়, কই বাক্য
এনে কোরেছেন—আমি বিলাস দেখান
বেড়াতে এসে পড়ি যাবেন। পাখি, আশ্রিত।”
আবার সে তারিখ হাতমালিল।

মা আশ্রিতা ককিলেন, “আজ এসেছে,

একটা বাক্য, হাজরা ককি, তা মা টেলিলের
দিয়ে নিরে বেড়াতে।”

“তা, আশ্রিত বাক্য দেখানো মা
বাক্য।”

“তা দেখানোর পাগলী, দেখান—এইমাত্র
এলো একটা জিরু।”

“না, কাকি বাক্য থেকে তো আশ্রিত, দেখান
বই হাতে নেই, অনেক জিরুয়ে—না মা
তুমি জিরুও নি?”

“দুই বাক্যে ফের। মা বাবা, তুমি
বোলে—না, একখানি পাখি নিরে আর।”

ফেব্রুয়ারি মাসের মাকি ছাডিয়া দিয়া
আশ্রিতা গেল, ককি জিরু না।

মা ককিলেন, “কিহে পাখি আনতে কি
বুড়ো হয়ে গেছি।”

পলিকার আশ্রিতা হইল, আশ্রিতা আশ্রিত,
“ককি আমি আনব না, যাও।”

ককি বাক্য, পাগল কোরে—কি দেখান,
দেখান। মা হাজার পাগল ককি মতে চলে
যেও মা আন, খবর যেন পাত।

অশ্রু ছাডিয়া দিয়া মা ককিয়া
ককি হইল, ককি। ককি “চ না দাদা, মা
বড় চট, দাদা বড় দাদা।”

আশ্রিতা মা ককিলেন, “বিয়ে যে দেখা
করে হবে, ভেবে পারিনি।”

একখানি পাখি ছাডিয়া অশ্রু কোরে
আশ্রিতা করিতেছে দেখিয়া মা ককিলেন, “কিহে
আজ যে বড় ককি হয়ে?”

অশ্রু কোরে উল্লসিত ককি না। হাজ বাক্য
ককিয়া সে বাতাস করিতে লাগিল। “ককি
তো খাজা, এ মেয়ের কি ককি। একটা-টাই
বাক্য, একটা-টাই আশ্রিত।” ফেব্রুয়ারি মাসের

না জানেন নিশ্চয়।

“তা তো নিশ্চয়।”

“জানিনাথ! জানিনাবুই তো! বড় বড়

কাজ।”

“জা বই কি।”

“ওর এক মেজ-ডাই আছে না?”

“হাঁ, আছে তো।

* “সে কি করে?”

“সেও গড়ে।”

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল।

“বাছার পড়ায় খুব মন।”

“হু, মাথাও বেশ।”

“আজা আশীর্বাদ করি যেন ভাল হয়।”

“খুব ভাল কান্না পাশ হান।”

“বড়ী ত কি কেউ ওকে দেখে না?”

“বোধ হয়।”

“কেন এত লোক আছে তাবা কি কবে?”

“তা তো জানিনা।”

আবার কিছু সময় কাটিল।

“ওরা মৈত্র না?”

“হু।”

“ওবে তো বেশ হয়।”

লাহিড়ী বাবু চাহিয়া দেখিলেন।

“কি বলচো?”

এবার শব্দভাষায় স্ফালচনা করিলেন, “না, বলছি—অমর সঙ্গে বিয়ে দিলে হয় না?”

বিস্ময়ভরনায় লাহিড়ী বাবু করিলেন,

“কারণে কি হয় না বলচ?”

“কেন, কেনের সঙ্গে অমর বিয়ে।”

বইখানা আবার টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া

লাহিড়ী বাবু করিলেন, “কি করে করে আমি

বললাম না। তবে পড়তে আরও ভাল হয়।

মোকো? এই ভাবের কি আমি কিছুই তোকে

এনেছিলুম? বাবু, আর কখনো আমার কথা

বুঝে এনে না, মনেই স্থান দিও না। কেন

কি ভাববে, লোকের কি বলবে? আমার

পান্না বইয়া আশ্রয় গিনি শক্তিতে বিনা

গেলেন।

স্ফালচনা করিলেন, “তবে অমর”

ওবে অমর ভাবে মিশতে পাও কেন?”

“বোধ হয়, মাছে চৌর গিলবে বলে।”

“বাসের কথা এত কিছু নেই কিন্তু এতটা

গাল নয়।”

বইখানা আবার টেবিলের উপর রাখিয়া

দিয়া লাহিড়ী বাবু করিলেন, “আখো” এত নীচ

মন বেখো না। কেন, তাতে কি হয়েছে?”

“এতে নীচ মন কিসের দেখে? তুমি

পুত্র মাতৃষ, মেয়েমানুষের কি বুঝবে? মেয়ের

এক একটা দিন কাটতে, আব হাড়গোড়

সব বুকের মধ্যে সঁধিয়ে বাচে, সে খবর রাখো

কি? বড় হচ্ছে তা জানো?”

“জানি বৈ কি। ধীরে দিলে তিন ছেলের

মাও হোতো।”

“বাবু, আর কিছু বলবে না, রকমারি

হয়েছে। তোমার ছাগল, তুমি লোকের দিকে

কেটো।” বলিয়াই তিনি রান্নাঘরে চলিয়া

গেলেন।

“এই যে, এসো বোসো। নাথ, বলবার

জানো তো কে।”

নাথ একখানি রেকাবিজে। কিছু দিও

কল আনিয়া কেতুর সমুখে রাখিয়া দিল। অমর

আসিল না।

লাহিড়ী বাবু করিলেন, “তোমার প্রাণের

দেখে আমি অনেক লোক হাট কেতু।

100

“है, यो तो ठीक है।”

গোবেন্দ্রনাথ

1997

[illegible]

SECRET

কেন্দ্রের বরখানা কে কেন থাকিবে থাকিবে ?
কুরিয়া বাইরেছিল। সে যেখানে, সেই খানই কি
অনন্তর ? কতকগুলি বই লইয়া সে মানিকিয়াস
দ্বার পড়ি = বসিয়া গেল। সেদিন সন্ধ্যা হইল।

“ न इति किं न ? ”

সুদূর অতীত একটা কথা শ্রবণ করি।
কিন্তু সে অজ্ঞান কহিল, 'হাঁ নালকথা
মান পাড়াচ বাবু'। ভাড়াভাড়া তাহার জীর্ণ
ট্রাক্টা খুলিয়া আনক হাতড়াইয়া একটা
মোড়ক বাহির করিয়া আনি।

“আমার বালটনাব। এক সন্ন্যাসী আমার
এইটে দি়ার বলেছিল, তোর ভায়ে পরাস,
তাব সব কষ্ট লক্ষণ হবে। এটা সিদ্ধি কবচ—
বাব্বা পর।”

বলেটনা ভাব ছিলে। বাতীর ছেলের মত
তাহাকে ক্ষেত্রবের পিতৃ মাতৃ করিতেছিলেন।
এষ্টে ল পাশ করিয়া সে যখন বহু কালের
মায়্য মায়, কাতারনী ও তাহার খাৰী কেতুক
লইয়া গিয়া শোকসন্তপ্ত সেই কিন্ধাবারী জাঙ্গীর
কোলে তাহাকে দেখিয়া বেল। সে যখন
তিন বছরের পিতৃ। সে যখন পথে তিন্মাছিল,
খালিকীর বৃষমায়ে গিয়া সে তবু কহিল
“না।”

না কিছ নে বেবল কল্যাণ, কল্যাণ। তুই
কল্যাণ তার চেয়েও বেশি।

একর ওপর বসিয়া কল্যাণের আশ্রয়
করিলেন, “ঐ বে, মামলিয়ার এখানে মাটল
করে বসে বে। অল্লা, মামলিয়ার কি কোর
পড়া কল দেবে? কল্যাণ কি কোর বসে? ঐ
কল্যাণ এক ছেলে, এক কল্যাণ সমান চড়া
চাপড়টা আটকে বাজে, কল্যাণ অল্লা হাত বট
ধরে পড়া জিজ্ঞেস করত ও ছাড়তে না। পড়া
জন্তে আবার মান কল্যাণের কি? হতভাগ্য
মান-ইজ্ঞত কিসের? এখানে কোলি বেঁসে
বসে থাকলে তো পড়া আশ্রয় নি খাশ্রয় হবেনা
—বা শীগগির, বা বশিচ, হরো, কল্যাণ পড়া
জিজ্ঞেস করে নিগে না।”

পিসমা কহিলেন, “আমি ও তখন তুই-ই কল্যাণ
হরো, তখন তুই-ই কেন কোলি নে মা কল্যাণ।”

“অত ডাকাডাকি কল্যাণের সত্য কল্যাণ
নেই—গোপীর মত। কল্যাণ জিজ্ঞেস করেও
তো যেতে পারে। অল্লা, কল্যাণের নত।”

পিসমা হঠাৎ পাহাড়পটে মনশ্রম হাত
বুলাইতে বুলাইতে কল্যাণের “অল্লা কল্যাণ আশ্রয়
বা। ঐ কো ডাকতে।”

হঠাৎ কল্যাণেরী কল্যাণ হতভাগ্য পিসমা
হিড়হিড় করিয়া টাঁকে টানিতে কল্যাণের
হরুর মধ্যে পুরিয়া। কল্যাণের “অত ভাল
কল্যাণ কেউ নয়, কল্যাণের—কল্যাণের কেলে
কিনা কল্যাণ।”

—“এতক্ষণ আস বসিল না কল্যাণ।”
কেতু কোন উত্তর দিল না।

“এতক্ষণ আসা কল্যাণের কেলে কল্যাণ।”
কেতু তখন নিকট।

“কি কল্যাণের হরো?”
হরোর আহাঙ্কে কল্যাণ কল্যাণ টানিয়া
আনিয়া দাঁড় করাইয়া দাখিল।

“কই কি পড়া আছে, জিজ্ঞেস করে।
কেতু তখনও কল্যাণের হাতে কল্যাণ
কল্যাণ দাঁড়াইয়া।

এক চক্ষ মারিয়া আহাঙ্কে কল্যাণ কল্যাণ
দিয়া হরোর করিল, “আমি কি তোমার
কল্যাণের চাকর?”

দৈনিক আহাঙ্ক বাপারটা কোন প্রকারে
সারিয়া লইয়া নিশীথ রাতে দৈতকপানা ঘরে
উপর হইয়া-পড়িয়া কেতু কল্যাণ শিশুর মত
কল্যাণ কল্যাণ কল্যাণেছিল, মামলিয়ার আহাঙ্ক
হাত মারিয়া তুলিতে গেল। সে উঠিল না।

মনদভাজে তখন পান সাড়া ও আলপ
চাল্যেছিল। হরোর পুত্রক পাঠে নিম্ন
অথবা প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠ।

“মাথা বোদি, আস হাত—মাথা বাস
কল্যাণ।

“হী লো হী, মোহাণ তো কত? কল্যাণ
একটু গল্প হোক।”

“না, আস গল্প নয়—তোমার কি, কল্যাণ
তো গল্প চলে।”

“অমন শোয়ার কোড়া কল্যাণ।”

“নাও গো বাও, কল্যাণ বড় কল্যাণ।”

“মাছে কথা কইচাঁকি মাথা কল্যাণ, এক
বার চক্ষকর্ণের বিবাদ ভজন করে আস না
লো?”

নিশ্চয় জোগ আছেন। অল্লা, কল্যাণ
কল্যাণ।

“অল্লা, কল্যাণ-কল্যাণ কল্যাণ।”

“অল্লা, কল্যাণ কল্যাণ।”

সেইসময় সেদিন একই সন্ধ্যা হইয়াছিল।
তাই তাহার গানের গানের চেটার কবিতা
তাহার চোখে একবার তেল করিয়া
করিয়া নিজেছিল।

(৩)

কিন্তু হানি হুজুরা হুরেশর আসিয়া
কহিল, পিসিমা, আমাকেই শুধু ছাড়া না আর।
তোমার গানের ভাইসোজিক যে আমিই কেবল
কোনও দেখি — তা নয় — কলেজের
প্রিন্সিপাল মিটার মূর কি লিখেছেন, এই জাখো
— মিস্টার চিঠিখানা সে তাহার গানের কাছে
কেনিয়া ছিল। চিঠিখানা খানিকটা ভুলেব উপর
পড়িয়া গিয়াছিল, পিসিমা এতদাড়া তুলিয়া
লইলেন। আঁচলে মুছিয়া হুরেশের হাতে
দিয়া কহিলেন, “তা আমি আব এর কি বুঝব
কি হয়েছে?”

“হবে আবাব কি জন্ম যেতে হবে, তাই
হতাং আফিসে মনে পড়াতে মিটার মূরকে চিঠি
লিখে জানতে চেয়েছিলেন—ওদেন পাসে স্টেজ
ঠিক আছে কি না? এখান থেকে নিয়ে গেলে
জন্মের ফুলে ভর্তি করবে কিনা, আর এক জামিন
দিতে পারবে কিনা। স্টেজের জবাবে লিখেছেন,
আপনার কেজ্জাইক আমি কোনো মতে
ছাড়বোনা, যে ফাইট হবার মত ছেলে। তাকে
বসি নিতাই নিয়ে যান, রেজিষ্টার আমার
বিশেষ বাল্যক, তাঁকে লিখে জন্মতেই তার
আজ এই ফুল থেকে পরীক্ষা দেখার বন্দোবস্ত
করা দিতে পারি। তবে ছোটভাইটি, অর্থাৎ
হিমা, কেতাকে আপনি অনারসে নিয়ে যেতে
পারেন—সে যেমন ছেলে তাতে পাসে স্টেজ
পূরো জরুরি হবে, এবং সেই বৈধ কোনো

কলেজের জবাবের হয় না। তাই আমার আত্ম
করেক বছর পোষিত হতে পারেন। এখন
সেইজন কোথায়?” তা জেজামিন।

“এ মানিকমার ঘরে আছেন বোধ হয়।—”

একখানা গাছের বই হাতে লইয়া লতিকা
বোহিনির ঘরে আঁচলে মাখার জানিতে জানিতে
চুকিতেছিল। হুরেশ কহিল, “লতি কেতুকে
ডেকে আনতো?”

“সে কোথায় জানি না।”

“ঐ ঘরে—”

“আমি দেখলুম নেই।”

“তুই বানা একবার।”

“নৈই বলচি, তবুও—”

লতিকা কেতুকে ডাকিয়া আনি। হাতে
মাখার ইতিহাস আর একখানা ভারতবর্ষের
কাণ্ড মানচিত্র।

“কি হচ্ছে আপনার? নিন্ প্রিন্সিপাল
মশায় কি লিখেছেন, দেখুন?”

কেতু মাপখানা মুক্তিয়া পত্রটি আছোপান্ত
পড়িল, ব্যাপার কি ঠিক যেন তার বোধগম্য
হইল না।

“দেখচো কি? বাও, বছর তিনেক যখন
ঘোল-ই খেতে হবে, সার্টিফিকেট নিয়ে এসে
বাড়ী এসে জীবন কাটো, পোক্তো তো হতে
হবে! বছর-বছর বিদ্যা হুদে অতকগুলো
টাকা মাইনে স্তজতে তো পারবো না—
হোমস্কল তাতে ভাল। অনেক খেটেচো,
কিছু জিরেন্ তো চাই?”

পিসিমা তাহার গানে মাখার হাত বুলাইতে
বুলাইতে বলিলেন “আহ, তাতে আর হয়েছে
কি হুরেশ? কেল্ হওয়ার চেয়ে পাকা হবে
একবারে ও কাট হবে পার করবে। মকমেই

কি আর সন্ধ্যার হতে হয়? কখনো কখনো
হাস্যে চলে শেখে, কোনটি বাস্তবিক? —
কচি-বসে চলে শিখা। চাপা হাতের তালু
হতেও হৌ কতদিন যায়। হেঁচকি-হাস্যে
বন্ধন-পাশ করবে একেবারে কচি-বসে।

“সে আর এ জন্মে নয়।”
ওর জন্ম একটা নতুন ইতিহাসে
উঠবে।

“না, তুমি খোয়-দেয়ে যে যায়
দিয়ে এসে গুয়েচ?”

“বাকুসে খিদে পোকা, ...”

“ক্ষেত্রে যে এগুনো খায়...”

“আজ আর তব খেয়ে ... নাহ। হুই
যা লাং, মৌ হুয়ত বাস আর ...
কবিসনে বগচি।”

“নাও, চাবি দাও।”

“আমি জানিনা কোথায়।”

“তুমি জাননা ... কে ...”

“আমি ফের ...
কবিসনে!”

“তবে কি ক্ষেত্রে ...
করে থাকতে বসে?”

“আমি বসে ...
পরে যেখান থেকে ...
পূর্বেতে হবে, সেখান ...
অভ্যাস করুক।”

“কি বাজে বকচো ...
চিঠি দিয়েচো কি হয়েচ ...”

“হবে আবার কি ...
ছোটেনা!”

“আনি বেশী বকো ...
আজ রাতে না চাবি দাও।”

কামারী, অটম, কামারী ...
হাতদির ...
যদি দি ...
উচোখ বসে চলে খাবে।

মিসিরা আসিয়া কহিলেন, “কি ...
কবচা সেকবো, চাবি দাও।”

চাবির গোছটা ছাড়িয়া ...
উপবেত কেলিয়া দিয়া কাত্যায়নী ...
এই নাও, ধন্দের মত সব খেলাগে ...

“বাকার বাটা।”

ক্ষেত্রে খাতিতে বসিলে তাহার ...
টিব গোছা সমত ...
উড়াইবা দিয়া কহিলেন। “কামারী ...
মনেন ছাটগুলি কি কবে উলচে।”

“বাবুয়া, থা।”

“না।”

“এই আমার রয়েছে জাখ।”

“না।”

“তুহ না খেলে, আমার মুখে কচবে?”

“ক্ষিদে নেই।”

“ক্ষিদে কি থাকে? ...
সকতে নেই।”

“না।”

“লক্ষীবাবুয়া থা।”

“না।”

কাছে বসিয়া গারে হাত ...
জিজ্ঞাসা করিল, “সে ...
জোখার বাবুয়া?”

“আছে।”

“কই, দেখতে পাচ্চি না? ...

—আচ্ছা, বাবিনা বাবুয়া?

“না।”

“তবে আমিও ...

হাত ...

কিছুক্ষণ বিশেষ করিলেন, হঠাৎ উঠিয়া
একগোঁটা দলহ কাটি।

“কই বই কখনে কই?”

মানিকিয়া উঠিয়া পড়িয়া বইগুলার উপর
বিস্মিতা পড়িল। বলিল, “তা সে গুলোর ওপর
এই আক্রোশ কেন? আমাকেই দিও না।
আমি যে তোমার দেখতে পারিনে।”

“সব বলছি।”

“করবো না।”

“হ্যাঁ, ভাল হচ্ছে না, মানিকিয়া।”

“কেন, আমাকেই পেঁজাও না, তবে
চেরে ভাল আর কি হবে?”

“আলসানে, ছেঁড় দে শীর্ষাংগ?”

“কেন, চেরে মবার চেরে একেবারে নিকেশ
করলেই তো হয়।”

“ছাড়ো।”

“না ভাড়ো না, কি কবাবে, কবো।”

অলস কাটিগুলো বাক্যে বেলিয়া দিয়া
কাঁচাঘনী ক্ষেত্রে লক্ষ্যপাতা ধারণা ক্রীত টানিয়া
লইয়া যোঁজন। স্থানান্তরে চুকিয়া কহিলেন,
“উপোষ করে শুভে গেছে এই বড়? নাও
কালামুখে উন্মেষ ছাই কিছু হোক।”

“বৌদি যা কোনো জিনিস একেবারেই মুখে
করচেন না, কুমি গিয়ে একবার বলোনা?”

“অবশ্য আদার বাপদি, আহাজের সববেব
দরকার কি ভাই?”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ বাব বৌদি। একবার গিয়ে
বলতে তোমার কি হয়েছে?”

“আমি সবাক মানুষের মেয়ে তিনকলে কেউ
বো—একলও নিকেশ, পেঁজাও নিকেশ,
আমি আনিব। সবগুণ তাঁকে সামলাবে?”

“কত কথা জানা কবো?”

“তা হ্যাঁ জানিনি, তবে এই থেকেই তো
বহু হয়। আমি কিছু করলে তোমার
দাদার চোখে সেটা চেনালি যে। আমার করলে
আমার ক-মহলব চাকরি, রাগিলে প্রকাশ হয়ে
পড়বে অতঃপর দরকার কি বাবা। চুপচাপ
বাই দই, একপাশে পড়ে থাকি। তার চেয়ে
মাংসে বলো বা, তিনি ও সুখের কাঁচা-কানন
ছেঁড়ে যেখানে দোয়াস্তি পাবেন যান।”

“তোমাকে পারা দার বৌদি।”

“বল পাওয়া দায়।”

গাং মখানা গভীর করিয়া লতি বলিল,
“ভাল আগেনা বাবা। বাই, আমিই লেগেছি।”

“বাপ করিস্নে ভাত, শুনে বা।”

লতিকা গাড়টিন না। মাকে আসিয়া
কহিল, “আচ্ছা, পাবে না মা?”

“না।”

“কেন, কি হয়েছে কি?”

“এর চেয়েও হবে আবার কি। যুগল
গেলে, কটা ছাপালের মত দিবাযস্তির বাৎরাচ্চি,
কাঁচাঘনী মত সব গিয়ে পেটে পোরবার ডাঙে
বসে আছি—এর চেয়ে আর কত কি আছে?”

“ভাতো, চকো।”

“আনি যাব না, কেন মিচিমিচি সময় না
করিস্নে?”

“তাহলে আনিও দাড় পোক খাওয়া বক
কবলন।”

“বো, কলো। হ্যাঁ, হ্যাঁ আমিও কি?”

“নাও বসাবকই কুককটে অল্পরূপা কহিল,
“আচ্ছা, যোনো বাউর মতো অলক্ষণ ভাল
লাগে না—যা চুকতে হবে না; যাও, আলো
গিয়ে মাঁকে খাইয়ে এসো।”

“কেন, হঠাৎ পরোপকার?”

“পাঠ্যপুস্তকের তোমার মাথা। বাজিতে না
হয় খেঁচ পড়তে আসেন, আমি তোমার লক্ষ্য করে
না ঘাইএসে নাকি সরাসরি হেল দিয়ে তুলে ?”

“কেন, তুমি এটা বিছানা দোবল করছিলে
সেপলম।”

“কেন কবছিলুম, আমার খুশি আমি কর-
ছিলুম। তুমি যদি এইমাত্র না যাও, আমাকে
আর পাবে না।”

“কেন, পতন ও মুক্তি হবে না কি ?”

“ঠাট্টা করতে লজ্জা করে না ? আমার
তা হবে কেন, তোমারই উপস্থিত হ।”

“বাঃ বেড়ে ! আর কাছে গিয়ে এসকল
একদিন একবার দেখিয়ে এলে না কেন ? তা
হলে ভালো ছেলেটন মনঃ উপস্থিত হত। পেতে
কমবে না।”

“ওঃ এম চেয়েও নে, আমার বিপদা—”

কিন্তু আর বলা চতখ না। বক্তৃতা
বীভৎসমুখে টেবিলের কোন্টী ধরিত। বসিয়া
পড়িয়া সে যতদূর পাবিল চৌৎকাপ কবিতা কবিল,
“যাও, আমার মনঃ পেরে যাও।”

“মা আমি দোষ করছি, যাও।”

“হ্যাঁ না।”

“আর কখনো কববে না, মা।”

“তুমি কবো বা না কবো, তাতে আমার
কি, আর আসে ?”

“অফিস আর এ পক্ষের জন্ম যাবে না।
কেতু এইখানেই পড়বে। আমি লতাকে এক-
জামিনে পাঠিয়ে দিতে লিখে দেবো, তাহলেই
হোলো।”

অনুরূপা খড় কাড় বাস্ত।

লুটি কবিল, “আচ্ছা বৌদি, জেঁমার
আজকে কি বলো তো ? এই ভালতাল হলো-

খড় কবিতা বসে।”

“না ভাই, মেজাজকে কি না কবিলে
বলো কবিতা আছে ?”

“এ তোমার কবিতা কি দরকার ? কবিলে
কি। না হয় শুদ্ধ করে দিচ্ছি।”

“আহা, এই যেটেবিলে নাকবুখে শুভ
বেচনী একটু ঘুমতে গেছে, আমি তো বসে
আছি— হাকে আর কষ্ট দেওয়া কেন ?”

“নাঃ, আমি কবে দিচ্ছি।”

“না ভাই, এ তো হয়েই গেছে—কি বা
কাপড়গুলো বেশ হয় শুকিয়ে গেছে, কবিলে
কেল্গে বা।”

“বেকাল হিন্দী বাজিতে না বাজিতেই
উনানে আশুন পড়িয়া গেল। ধোয়া দাঁপিয়াই
লুটি ছুটিয়া আমিরা জিজ্ঞাসা কবিল, “এক
বৌদি, এবি মধ্যে তোমার যে বড় কাপড় কাচা
হবে গেল, উনান আশুন দিলে যে ?”

“তিনটে হয়েচে, এখনি তো ঠাকুরপো
আসবে, পড়তখন বেচাবীরা কি-কয় ছটকট
ববে বাড়ী ঢোকে—ভাণ্ডি তখনা গরম গরম
লুচি কব লুখি। তুই ওই আলুভলো ছোট
করে কাচার রাখ তো ভাই, ছোটঠাকুরপো
কুরিভাজার মত মচমচে আলুভাজা পেতে বড়
ভালবাসে। আচ্ছা, আমিই নিচ্ছি, গরম-গরম
হয়ে গেছে—তুই ততক্ষণ কিছুটা বার কর।”

সন্ধ্যা কিছু পূর্বেই, হাকে বিয়া অনুরূপা
জিজ্ঞাসা কবিল, “আজ কি ব্যাটা চলে না ?
আমাদের তো সকালের জাই হয়েছে, তাই
গরম মিশিয়ে নিলেই হবে—আলুকপির একটা
ভালনা করি, দুপাটি চাল আর এক ছোটবাট
একবাটি ভাল নিলেই হো হবে।”

হাকে সকলকে জিজ্ঞাসাই। দাঁপিয়াই

করেন। অল্পকাল পরেই "হায়ে মানকিয়া" নামে এক ছাত্র আসে। সেও তাঁর পদে এসেছে। এই ছাত্রের একজন ছাত্রের পক্ষে বিছানা করেছিল সে। "তুমি যবে হো গাল" কব হোরকগুলো তোলা রথচ—আচ্ছা আমি এখন দি।"

ছাত্রেরা আসিয়া ভাঙ্গ কবির বিছানা পাতিয়া সে কহিল, "হুকুরপো, মে শো। আচ্ছা, এই কথা শিরপিন করচে, কামডে ছিড়ে খেয়ে কেতবে রে।" "শারি বাটাস্মি কেন? এই বে কড়ি রয়েছে, আমি আটরে দি।"

ছোট পান আসিয়া মানকিয়াব হাতে দিয়া কহিল, "পান পাননি বুকি মানকিয়া? কে আর দেখে বল? এমনি ভুলে গেছি! পোড়া পেটে তো খেতেই শুধু শিখেছি এই নে—খা দিদি।" হস্ত খেয়ে অবধি কত গা খুলোচে, আমায় তো বাপু ধরে উঠে ছোট পান না মুখে দিকে ঘুম-ই আসে না, সব ফাঁকা ফাঁকা বোধ হয়।"

একরাটি ভেল লইয়া ছাতি কনের মাথায় তাড়াতাড়ি চড়াইয়া দিয়া অমরুপা কহিল, "না, আপনার একটু ঘেন কালি হয়েছে দেখলুম—একবার লাটী এগিয়ে দিননা, এইটে মালিস করে দি।" নাকটা শুষ্ক থাকলে ঘুমের বাধাত হবেনা, শরীরটাও বেশ স্বাচ্ছন্দ্য হবে।"

শিমিয়ার ঘরের ঘোরটা টবং তেলিয়া অমরুপা কহিল, "শিমিয়ার ঘোরটা একবার খুলুন না।"

শিমিয়ার ঘোরটা

শিমিয়ার—আমায় মরণ আর কি! ঠাকুর-হো পানকিয়া অমরুপা আনি বসে। একটা দেশ-লাইয়ে পানকিয়া কলে গেছি।" কহিতে হবে

না, বোকা কহিয়াছে।" "সেইটে বসে। হাত বাড়িয়ে নি।"

লাটী আটকান অমরুপার দ্বারা পানকিয়া ছাড়াই মত। নীরবে খুলিয়া দেয়। হোইতেছিল। হাসিয়া কহিল, "কি কথা ক'হাও পানকিয়া কখন?"

"সে হবে অমরুপা, এখন তা আর—ছোট পান মুখে দে একটা পানকিয়া কহি।" "ও, ভাল কথা মনে পড়ছে।" "তাহার পানকিয়া এক-বারে তবা হয়নি। শাউরে তবের দরকার হয়, আমি আসি।" "তবে তবকণ পানের বোটাগুলো ছাড়া ফেলিস না।" "হুকুরপো সাজে বোটা না পেলে অমরুপা পান হবে না।"

"শোনার ঘরের মুখে আসিয়া।"

"তোব মুখে আসিয়া পানকিয়া।"

কলশবার বাধা খুলিয়া ছাতির চিঠিগুলো বাড়ি কবির কবিতা লিখিয়া বসিয়াছিল। যখন সে পত্রগুলি পায়, এখন তাহার মধ্যে যে এটা অর্থ নিহিত ছিল, সে বাকি পাবে নাই।

অমরুপা ঘরে ঢুকিয়া কহিল, "কি লো ঠাকুরবি, আচ্ছা যে তোরা বড় পাতাটি-পর্বাত পাওয়া বাজে না? যদি একটা নিরিবিলিতে কবচিস কি?"

গাড়াগাড়ি চিঠিগুলো বাস্তব মধ্যে পুরিয়া আঁচলে বাধা চাউনি।" "সেইটে লাগাইতে সে কহিল, 'বড় হুকুরপো হুকুর হয়েছে, তাই গুচোছি।' *"

"তা বন্ধ করলি মে। শুচা না। দে আমি শুচিয়ে দি।"

"না থাক—" কহিয়া সে চাউনি লাগাইয়া আঁচলটা পিঠের উপর ফেলিয়া দিল।

বোধ হয় অমরুপা আপনাকে কিছু খুঁজিত পারিয়াছিল। এমনি নিরিবিলিতে ফেলিয়া দিল

কিছুক্ষণের জন্যে হঠাৎ গায়ে
 "কই না!"
 "কই না?"

সকলক্ষণ ভাইয়ের বিবাহ...
 "কি দাবে মাকি?"
 "না।"

"না কেন?"
 "ভাল লাগে না।"

"ভায়ের বিয়ে, ভাল লাগে না কেন?"
 "সব বেচে-বরতে অথবা স্বদেশ থেকে, তা
 হলেই হোক—বলিয়া হঠাৎ গায়ে আঁচল
 টানিয়া মাটিতে থৎ মিয়া আবার কাহিল, "ভাই
 বেন তিনি রাখেন।"

মুখ চিপিয়া জেথ হাসিয়া লক্ষ্য করিল,
 "বলি আজকাল দিনদিন কি হয়ে যাচ্ছে গো
 ঠাকুর? তা, জবাব কি দেবে?"

"শীত পড়ে আসচে, শীগগীর বরষা পড়
 হয়ে যাবে—এ সময়ে কি করে যাই
 "তা ভালো, সুবিধেই হয়ে গেছে। ছাত্র
 চেয়ে সত্যি কথাটাই লিখে দাও না?"

"কি?"
 "দাদাকে ছেড়ে থাকটা আগে স্বাক্ষর
 নেই।"

হঠাৎ চোখের জল গায়ে গায়ে
 বলিয়া উঠিল, "সকলের ভাগো তা কেন
 "কি?"
 "কিছুক্ষণের জন্যে হঠাৎ গায়ে
 "কি দাবে মাকি?"
 "না।"

কিছুক্ষণের জন্যে হঠাৎ গায়ে
 "কই না!"
 "কই না?"
 "কি দাবে মাকি?"
 "না।"

"না কেন?"
 "ভাল লাগে না।"
 "ভায়ের বিয়ে, ভাল লাগে না কেন?"
 "সব বেচে-বরতে অথবা স্বদেশ থেকে, তা
 হলেই হোক—বলিয়া হঠাৎ গায়ে আঁচল
 টানিয়া মাটিতে থৎ মিয়া আবার কাহিল, "ভাই
 বেন তিনি রাখেন।"

মুখ চিপিয়া জেথ হাসিয়া লক্ষ্য করিল,
 "বলি আজকাল দিনদিন কি হয়ে যাচ্ছে গো
 ঠাকুর? তা, জবাব কি দেবে?"

"শীত পড়ে আসচে, শীগগীর বরষা পড়
 হয়ে যাবে—এ সময়ে কি করে যাই
 "তা ভালো, সুবিধেই হয়ে গেছে। ছাত্র
 চেয়ে সত্যি কথাটাই লিখে দাও না?"

"কি?"
 "দাদাকে ছেড়ে থাকটা আগে স্বাক্ষর
 নেই।"

হঠাৎ চোখের জল গায়ে গায়ে
 বলিয়া উঠিল, "সকলের ভাগো তা কেন
 "কি?"
 "কিছুক্ষণের জন্যে হঠাৎ গায়ে
 "কি দাবে মাকি?"
 "না।"

এই যে কবিতার এক কবিতা, জালির
নিচেতে।

রাঙার কতকগুলি কতকগুলির কাছে পড়িতে
পড়িতে সে কবিতা গিয়াছে—এত অল্প লোকজনে
সে এত বেশী পড়ি হয়, সে একেবারেই
জানিতনা।

কিন্তু সত্যের আবিষ্কারের স্তমভনই বিচিত্র
কথা লইয়া সে যখন বাড়ী ঢুকিল, তখন সদর
দরজার একখানা গাড়ী ও বৈঠকখানার কতক-
গুলো বাজ, ব্যাগ। পাশের ঘর হইতে দোরট
ঝং ঝং করিয়া ঝড়িতে ডাকিলেন,
অম্বরুপা!

“কি বোদি?”

“ঠাকুরপো, তোর ছুটি পায়ে পড়ি, আমার
একটা উপকার কর।”

“কি?”

“এই নোটখানা নে, যেখানে পাস্ কিছু
আপিং এনে দে।”

“কেন?”

“কি জানি, যদি দরকার পড়ে।”

হঠাৎ লতিকার কড়ের মত ঘরে ঢুকিয়া
কেতুর হাত হইতে কাগজখানা ছিনাইয়া লইয়া
কহিল, “বোদি তুমি কি পাগল হলে? ওপরে
শিমিয়া, গোপী, মানকিয়া, সব রয়েছে—
তোমার ভয় কি? যা কি ব্রকম গুম হয়ে বসে
পড়েন, যেখানে না? তোমার কি এখানে
করকম করা উচিত?”

“আমি যে বড় গাঙ্গী তাই—”

গোপী কে নয়? জানকি কখনও জানিত
তোমার ঘর কিছু হয় জগদীশ, কিশোর, অম্বর
এই কবিতা হলে যাবে। কবিতা, কবিতা

পাশ

কি? “তোমার কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা
কবিতা”

“আমি যে বড় গাঙ্গী তাই—”

“তোমার কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা
কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা
সে কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা
কি? তোমার কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা
কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা
না? কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা
পাশে। কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা
চাওনি, কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা
কিনে যাবে না?”

“ঠাকুরপো, তোর কি জান?”

“কি জানার? কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা
—কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা

“কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা
কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা

“কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা
কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা

“কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা
কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা

“কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা
কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা
কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা
কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা

“কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা
কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা

“কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা
কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা

“কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা
কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা

निर्वाहक निदेश

[illegible]

পরিচালনা করিয়া কেউ বড়লাক হইয়া থাকিবে

১৯১১-১২ বিহান তব মত গোপী মীচ আমির কহিল,

৩. ভট্টের দোকান থেকে দুগ্ধের এক

ববফ আন তো। নাই, না, কই

কক-ভাঙ্গাবকে টেলিকোপ করেচি, এছাড়া

প্রদেয় বলে। আমিই জানি, তুমি তাঁকে ওপরের

স্বামীজী বলিলেন—“আবার বিদ্যাতের মতই

কো-অপারেশন গেল।

১. ক্রান্তি মিত্র আগিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি

१५५

জানিনা তো—আপনি আসুন, যেমন

বন্ধন ছাড়ে গেছেন।”

উপরে গিয়া সে আর ঘরে ঢুকিতে পারিল

২৭. ডাক্তারবাবু অধ্যাপক ডাক্তারদের জিজ্ঞাসা

স্বাধীনতা, এ অবস্থাতে কতকগুলি লক্ষ্য করতেন

নিট পনেরো।”

॥ श्रीग ॥

নিট দশ।

“তোমার এই সামান্যতা ?”

* ও প্রায় বস্তা খানেক হবে।*

৩৭. তাই তো—বড়ই রেটলেন্স দেখা

আমের পাপড়ি রাখতে চান না। ঘামও নে

४४६-नाशन कि असाढ़े हते ।”

হা এতকণ তো সেন্সিট বিহানায় ও

ক'দারো রাখি হানি কিহ এখন

শ্রী কনকজাম ডাঃ

100

“एकान (७) पात्रं चतुर्दश नमः”

[illegible]

SECRET

বাবু বলে—

কেতু ভীতে হামিরা কান্নাকাতি।

“বাবু, কেন? হাতির এসেছে?”

“হ্যাঁ।”

“বহুকটো ভিতর সে আত, তাই।”

হিমায়া হামিরা আলোর গন্ধিরের ঘর খুলিয়ে
নিয়া খুয়োহিত দেখিলেন, হুরেখর বাবুর ছোট-
তাই হেয়েখর স্বর্গশয়ান অবস্থার রকটার
পড়িয়া আছে।

“বাবু, এখানে আগনি?”

কেতু তাহার রক্তচকু দুইটা একবার তুলিয়া
জাহার মিকে চাহিলমাত্র, কিছু বলিল না।

“আমার ছেলে- ফাট্টিভিভিশনে পাশ হয়েছে,

বাবু, কখনো কখনো পাশ দিয়ে এসেছি।

সে কখনো এক কখনো পশুভক্তির পাশ কর-
তো, তা জানো?”

হিমায়া বলে—

“কেন, ভিভিশনে পাশ হয়েছে—তাহা

হ্যাঁ, সেবেও ভিভিশনে।”

হাত বইতে কবচটা শুলিয়া বাহিরের বন-
কবলটার সে খেঁখি ছুঁড়িয়া কেনিয়া নিবে, হঠাৎ
কান্নার রোল উঠিতে সে চমকিয়া দিকটায়
করিল, “ও কে?”

“আমাদের পাড়ার নাথকোল— আহা,

দীর্ঘনিশ্বাস্তি করে বুড়ো নাকে খাড়ায়ে,

সংসারে আর দেখবার কেউ ছিল

না, বাবু।”

চুখীর জগৎ

[শ্রীপ্যারিমোহন সেনগুপ্ত]

জীবন আমার কাছে দিনে দিনে হয়ে শুভে কিঞ্চি দুর্ব্বার
পাশাশের ভার।

এ জীবন বহে বহে আমি

পথে পথে কঁদে কঁদে সান্না দিবা বাসি।

কিরিত্তে পারি না আর দুয়ারে দুয়ারে

ময়ন - আশারে।

রক্ত নুকে নোহ জখ্ম হুজিয়া বাস

কৈশাখ-বোমের গুণ্ড কপালি প্রাণ

সাঁথি প্রেমের হাট

কেবল জাগিয়া আছে তুমি কোথা হুই নাই ।
 কেবল জাগিয়া এ অনন্ত আকাশে
 কিন্তু হুইসে
 বসে আছে নীলিমায় উদ্ভাস্ত মহান
 নিত্য প্রাণবান
 অনন্তের অচপল চিরট উল্লাস—
 করুণার প্রশান্ত বিকাশ ।
 সেথা নাই দ্বন্দ্ব হুই হুইরন্ত বেদন;
 জামরি জীবন
 কেঁদে কেঁদে জলে জলে যায়
 জলন্ত ব্যথায় ।
 পাখী গেয়ে যায় গান
 প্রফুল্ল বসন—
 কুতূহল জাগিয়া শুভে, আনন্দ দোলায়
 স্নাতক নাচিয়া যায় অবাধ খেলায় ।
 এ মোর জীবন
 কেবল বাহিয়া মরে অনন্ত পীড়ন এ
 মোর দুঃখ-দাগ বিশেষ কোথা নাই পড়ে
 অনন্তেবে ভরে
 কেবল জাগিয়া আছে অক্লান্ত চরম
 এক্ষণে নিঃশব্দে শান্ত পবন ।
 প্রাণে মনে লায় তাই অনন্ত বেদন
 নিকরক আকাশে পাতি ব্যগত নয়না

সাহিত্যিক ও সত্য-বিবর্তা

Thence comes the realism of much good poetry now being written: true, as all genuine realism must be, since it proceeds out of a spiritual conviction, a mental process, and actual craftsmanship—Mrs Sturgeon.

Quoted in New Ways in English Literature.

আমাদের দেশে সাধারণতঃ সমালোচনার অর্থ গালাগাতি, মার্ক দিটকান অথবা বিক্রমের মাথা বিচিত্র জাজ্ঞাতা বিশেষ কিছুই নয়। রবীন্দ্র নাথের কাব্য লইয়া আলোচনা করিতে গেলেই একদল দক্ষ জন বিমোহিত হইয়া মাথা নাড়িতে থাকে এবং উঠে মাথা নাড়িয়া মাত্র। এমনই বাড়িকে পাঠক দেখিয়া আলোচনা ছাড়িয়া দিয়া উচ্চাঙ্গের মাথাকে তেঁকে বার উচ্চাই তোলা লইয়া উঠে। তাহা হইলেই বুঝিবা আলোচনা কালের স্রোত পাতে প্রশংসার স্রবসে বহি পড়িলে থাকে ও অহতঃ শব্দে দিগ্ভ্রমের পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। এই গেল এক দিক।

আর এক দিক শুধু এই যে, মাই হারা নহা। ই হারা প্রথমেই অশ্রদ্ধা পূর্বক সচিহ্ন সর্বসমক্ষে প্রচার করিয়া ভ্রমবাসিনের দ্বারা ই হারা কোম কালেই ইবিবাবুর ডাক নন। (ভবে রবিবাবুর প্রতি ইবিবাবুর মাত্রা আছে, কারণ, যদিও ই হারার সচিহ্ন কখনও ই হারার আলোচনায় হয় নাই তথাপি ই হারার আলোচনায় ইবিবাবুর বেশ লোকের ইবিবাবুর কবিতার যে কোন সাধারণ ভাবের ই হারার কবিতার

কারেন না—ই হারের পরিকার মাথার না কি মিত 'মিটিং' ভাব স্থান পায় না। তবে ই হার নাকি সত্য যে লোকে বড়ই বড়ক রবিবাবুর প্রতিকাশ করিতাই অর্থহীন শব্দের নিকট মাত্র। কখনও কখনও ই হারি হইয়া পড়েন না তাহা নয়, তবে বশী দূর অগ্রসর হইবার পূর্বেই humbug, nonsense বলিয়া সেই পুস্তক দূরে নিক্ষেপ করিয়া আলোচনা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তোলেন।

বাইরে আমরা যতই গুরু করি আর বড়ই বলিয়া বেড়াই যে সাংবাদিক ভাষা বিবাহিতো রবীন্দ্র নাথের অতুল কাব্যসম্পদ শুন করিয়াছে, অন্তরে অন্তরে আমরা কিন্তু এই দুর্জাতীয় সমালোচনারই বিশেষ পক্ষপাতি। অবশ্য কখনও কখনও নইবের মলাট ছাপা এবং সূচ্যস্বরূপ লইয়া তৃতীয় জাতীয় স্বর্গীয় সমালোচনা যে মা করি তাহা বলা অসম্ভব। আমাদের মাঝে সমালোচনার এই যে অবস্থা ও দুর্গতি, ইহা আমাদের জাতীয় চরিত্রের ও সাহিত্যিক মর্যাদার যে কি পরিচয় দিতেছে তাহা তাহা দেখার সময় কি আরো বলা যায়? ই হারের ই হার অনেকের ওয়া

আমরা আরও বলি—কবিদের ইচ্ছা সবার
মুখ—সুখের হোখার, সবার সবার বিরহ
কবিতায় বহন হয়। সবার কবিতায়
কবিতা পাঠ্য করে কবিতার প্রাণের দান করিয়া
দিতাহে, এবং কি কবিতার ও বিচার কবি-
তার অবসর আছে ? তাহা নাই বটে—যে
কলার মনও হিতেরে ভাষকে এই জগতের
মতো বুদ্ধিগা বাহির করা সহজ নয়।

মোকে বধন, বাহা। পায় তাহাই বিনা
বিচারে খাওয়া করে তখন প্রাণের স্বাধা সহজে
বেশ একটু আশ্রয় হয়। সমালোচনার
অভাৱে সেই প্রাণের আশ্রয়ই উদ্রেক
করে। বহিমুখে সমালোচনার আবির্ভাব
হইয়াছিল, যেমন কবিতার বিচারপূর্ণ সুখের
পক্ষপাতহীন আলোচনা আর হয় না।
সে কথা থাক—সব বস্তু সর্বাঙ্গীন আলো-
চনার অভাবের কথা এখন বলিতে বসি নাই ;
মুগ্ধভাষ্য যে, বর্তমান সাহিত্যরাজ্যে যিনি
সম্রাট—সেই রবীন্দ্র নাথ সঙ্কেত আমরা
আজ পর্যন্ত বীর ভাবে ভাবিতে বসিয়াছি
বলিয়া মনে হয় না।

রবীন্দ্রনাথ সঙ্কেত কেবল প্রশংসা কেবল
নিষ্কর ভূগ চলিয়া বিরাটে—এখন আমরা
নিবন্ধ করি না। বিদেশী প্রশংসার সম্মুখে
মোকে লাইজের সম্মুখে সঙ্কেত আসে।
প্রশংসাও করি না বিদেশীরাই ত করিতেছে
তার চেয়ে আমাদের দৃষ্টি কি বেশী স্পষ্ট
আমাদের আলোচনা কি বেশী সত্য হইতে
পারে ! কিন্তু আমরা সঙ্গ প্রহর করিব এবং
কবিতা না, তাহার বিচারের তার পশ্চিমের
কবি হইয়া দিয়া যে কলিকাতা জাতীয়
কবিতা সঙ্কেত তাহা জাতীয় কথা জীব

মতা কবিতা কবিতামধ্যে সত্য সত্য কবি
তাহা পশ্চিম কবিতার সমগ্র আশ্রয়। কবি
কবিতা কবিতা কবিতা পশ্চিম কবি। কবি
কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা
একটা সময় এ কবিতা আসে। কবিতা
কবিতা ও আজ আমাদের কবিতা একটি পরি-
পূর্ণ লাবণ্য ও রূপ সহী। কবিতা কবিতা। কবি
কবিতা বলিবেন যে আমি কি কবিতা কবিতা
হইয়াছি না কি ? একবার সবটা উত্তর দেওয়া
এখানে সম্ভব নয়। সঙ্কেতে এইটুকুই বল
যায় যে মোটামুটি ভাবে দেখিতে গেলে
রবীন্দ্র নাথের যাগ্য দান তাহা সম্পূর্ণ হইয়া
গিয়াছে একথা সত্য, কবি সে দিনও কবি-
তার নূতন ছন্দ ও গদ্য কবিতার নূতন রীতি
দেখাইয়া নবীন কবিতার নকল নবীন
একটা সুযোগ দিয়াছেন, কিন্তু কবিতা বস্তু
যাহা, রস বাহ, তাহা আর আমাদের রসনার
নূতন বলিয়া মনে হয় না—তাঁহার আজিকার
কবিতা পরিচিতির মত আনন্দ দেয়, কিন্তু
অসীমতার কোন নূতন আভাসে পুলকিত ও
বিস্মিত করে না।

যে হোক রবীন্দ্র নাথের কবিতার সম্পূর্ণতা
সহীদ্যে বিচারের এখানে প্রয়োজন নাহ।
তাঁহার সমগ্র কাব্যের একটিকে আজ দৃষ্টি
নিবন্ধ করিব। আমার বক্তব্য যে অমৃতত্ব
প্রসূত তাহা কতখানি সর্বাঙ্গীন হইবে
তাঁহা জান না—ইহা মতো কোন নিশ্চিত
ইঙ্গিত আছে কি না তাহা পাঠকের বিচার
লাপেক।

আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথের কাব্যকবিতা
পাঠ্যকবিতা হইতে স্পষ্ট ভাবে একটা বিশেষ
মিকে গতি লইয়াছে। কবিতা ও কবিতা

কবির ভিত্তি কোনার ভিত্তির কোণে, যেন
কোনো কবির ভিত্তি কোনার ভিত্তির কোণে,
প্রতিভা লাগি অসি ছায়া" প্রভৃতির
বেদনার কবির ভিত্তি কোনার ভিত্তির কোণে—

“দুলাহে বসিয়া থাকে

ভিত্তির ভিত্তির কোণে

তোমারি করুণা মাগে।”

এখানে কবি ও কবিতার মাঝখানে, অমৃতভূতিও
ভাষার ভাষার মাঝখানে, অল্প কোনও
কবিতা বা অমৃতভূতি আসিয়া উৎপাত কুড়িয়া
নিম্নে মাঠ। আবার বহন কবি

পায়ে আঁধার পুলাক লাগে

চোখে খনার ঘোর।

জন্মে মোর কে নে খেছে

রাজ্যধারী ডোর।

কবি ও অমৃতভূতি যতই অবাক ও কি জান
কবির হোক না কেন, উহার মধ্যে অমৃতভূতি
বিহীনতাটি এত স্পষ্ট যে তাহা স্বয়ংই প্রোতান
একটু বিহীন না করিয়া ছাড় না; নিম্ন
বলেন বুঝিয়া না, উত্থাপন না। মোট
কবি এই যে প্রথম প্রেরণার এই দুটটি কবি-
তার বিশেষ উত্থাপনের বিস্তৃত অমৃতভূতি, অমৃত-
ভূতি একাধারে। কবির সতিত অমৃতভূতির
একমাত্র বস্তু: অল্প কোনও বিজাতীয় ভাব
কবির অমৃতভূতিতে বসিত কবিতা পারে
হই। অমৃতভূতির প্রাণলা বস্তু: উত্থাপনের
এই অমৃতভূতিই প্রাণলা পাঠ্য। কবি
হই না।

কবি ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির
কবির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির
কবির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির
কবির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির

কবির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির
কবির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির

কবির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির
কবির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির

কবির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির

কবির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির

কবির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির

কবির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির

কবির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির

কবির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির

কবির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির

কবির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির

কবির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির

কবির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির

কবির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির

কবির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির

কবির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির

কবির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির

কবির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির

কবির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির

কবির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির

কবির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির

কবির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির

কবির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির

কবির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির

কবির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির

কবির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির

কবির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির

কবির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির

কবির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির

কবির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির ভিত্তির

কবি-স্বপ্নে যে বিরহমগ্ন কবিতায় ঘুর
 গিয়াছে কবিরাই — তাহা পূর হইয়াছে
 কবি-স্বপ্নের মধ্যে শেষ জাতীয় কবিতার
 আভিমান-বহিরা হুৎ হুৎ স্বতঃ প্রাণে
 একটি এক জাগে — য এমনটি কেন হইল।
 পূর হইয়া তাহার অলঙ্কারই ছাড়িয়া না,
 নবোন্মেষের পাণপাতি উচ্ছ্বাস, আবেগও
 অনেকটা লাইয়া ফেলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ
 সে প্রেম-আসার নাই। একদিন এক কবি-
 কবর-সংস্কারের বাণীর মত কত না বিচিত্র
 স্বর স্বকারে বক্তৃত হইয়া উঠিয়াছিল; সে
 একটা রূপের ধাবন আগোকে পড়া,
 উৎসাহের কলহেল — কবির হৃদয়াকাশ
 তাপাইয়া বাহির হইয়াছিল — সে রূপতত্ত্ব,
 সে সুর স্বকার সবই আবার নিঃসৃত হইয়া গেল।
 শব্দস্বরের পরিবর্তন একদিন অসংখ্য জ্যোতিঃ
 মণ্ডিত হইয়া কবির চিত্ত হইতে মোহন বর্ণে
 ছুটিয়া উঠিয়াছিল — অসংখ্য তরল বিদ্যুৎ-
 পুলকে জগতের দিকে প্রত্যক্ষিত — নেত্র
 চাহিয়া বলিয়া উঠিয়াছিল যে — রূপ ত
 কলনও দেখি নাই। রবীন্দ্রনাথ সেদিন
 বাঙ্গালীকে এক নতুন জগৎ দেখাইলেন,
 সাকাশ নুতন, বাহ্যিক নুতন, বাস্তবস্থিতি
 সেদিন বাহারই নুতন রূপ, নবীন দীপ্তি,
 তাহারই মধ্যে নবীন প্রাণ — অথবা সে দিন
 বাঙ্গালীর নিকট রূপান্তরিত হইয়া গেল — সে
 দিন বিশ্বের বাহ্যিক অর্থাৎ একটা revelation
 একটি revelation, উচ্ছ্বাসিত পদাশ্রয়
 অশ্রুত আলোকপাত হইয়াছিল।

किहू कः १२ जनसंख्या २०००
 उल्लिखित। ये जनसंख्या विवरण
 विवरण १२ जनसंख्या २०००

ছিলেন সেই ভূমিক নরে মলিনা বির মলিনা
 উঠিলেন

তে মান কাছে নাগে না যোয়

कतिपय शब्द कदा

মহাকবি, তোমার পাতে

দ্বিতে চাই যে ধরা

তাহার অন্তরের সাধক আমিটি কবিকে লক্ষ্যে
 কেলি। নিম্ন বৈচিত্র্যের বাহিরে ছুটি।
 আপন অন্তরের ব্যাকুল একতাটি মার
 লইয় রসজ্ঞান বাড়া করিলেন। তাহার
 কবিতার ভঙ্গ্য পরিবর্তনের অন্তরালে তাহার
 জীবনের এই হাতধামটুকু কি পাণ্ডুর ঘাঘ
 ন।

এই ভাবের পরিবর্তন কেবল রবীন্দ্রনাথের
যে হইয়াছে তাহা নয় আরও বড় বড় কবি শিল্পীদের
মধ্যে এই পরিবর্তন দেখা যাইতে পাওয়া গিয়াছে।
এই পরিবর্তনের অন্তঃকরণ দিকে তাকাইলে
একটু কথা এই মনে হয় যে—সাধক ও কবির
মধ্যে জীবন গঠন এমন একটা বৈপর্য্য রচিয়াছে
যাহাতে একরের মিলন টিক হইতে পারে না।
সাধক ও কবি উভয়েরই জীবন কল্প অনুভূতি
লইয়া। শুধু যেই “সত্য শিব সুন্দরং” এর
জন্য বাসনা। সাধকের অনুভূতি আছে,
কবিরও আছে। সাধকের মধ্যে অনুভাবকতা
নাই, কবির মধ্যে অনুভূতির বিশ্লেষণ নাই।
সাধক একটা লইয়া বাসা করি কপড়া উঠি-
ব না। সাধক বলিতে আমি তাহাকেই বলি
তিনি কাঁপেনে অর্থকতার তীব্র সন্ধান করেন
এবং শথিক বলিয়াই প্রতিপদে তিনি সত্য
হইয়া চলেন। এই জন্তই তাঁহার জীবন
সংযমাত্মক ও চিরমরণী। অস্বাভাবিক হাফির
মধ্য — কবির মধ্যেই আছে।

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়কার একটি গুরুত্বপূর্ণ দলীয় প্রবন্ধ। এটিতে ভাষ্যকার প্রবন্ধে বর্ণিত বিভিন্ন দলীয় কর্মসূচি এবং কর্মসূচির ফলস্বরূপ প্রাপ্ত বিভিন্ন ফলাফল বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও তিনি দলীয় কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তা এবং দলীয় কর্মসূচির ফলস্বরূপ প্রাপ্ত বিভিন্ন ফলাফল বর্ণনা করেছেন।

কলিকাতা

৩এ বাধা প্রেস লেন, মণিকা প্রেসে
প্রিন্টিং দ্বারা মুদ্রিত।

কাশীধাম

অলকা কার্যালয় হইতে প্রকাশিত।
কর্তৃক প্রকাশিত।

ଅଢ଼ିଆ ଗାଳିକ ଅଢ଼ିଆ ପ୍ରାୟାଗାଧିନୀ

संविधान संख्या २४०, आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा संविधान संख्या २४०, आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा

[illegible]

স্বাধীন প্রাচীনার রচনার বাস্তব উৎসাহ দেওয়া হয়। বিজ্ঞাপনের দ্বারা
প্রতি বঙ্গীয় বক্তৃতা করে।

বায়ু এণ্ড বায়োটেকনোলজি

२४ नं० (पोताना) कालेज स्ट्रीट बाई बाई कालिका

প্রকৃতি হইতেছে

প্রকাশিত হইতেছে

স্বাধীন জাতিসত্তা ও উন্নয়ন চলে যাবে মহাপ্রবল কণ্ঠস্বারা ও শক্ত প্রাণিক
স্বাধীনতা ও উন্নয়ন চলে যাবে মহাপ্রবল—

সঙ্গীত

কর নিষিদ্ধ গ্রহণ করিয়া থাকিলে ডাক বাতুল নাগিবে না । বন্দী হইয়া আসা ।

अ. वि. प्र. — विभागाधिपति कविशंकर । कविशंकर ।

SECRET

1944

ବିଶ୍ୱାସୀ ଚରଣ ଶ୍ରୀ

THE NEW YORK TIMES

ନାବ

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

100-443887-100

সম্প্রদায়িক অসহনিতা
 বৈষম্য-প্রতিদ্বন্দ্বিতা
 বিমুক্ত কালীপ্রসন্ন সান্নাওড়ী প্রমুখ
 লোক-অসহনিতা চুক্তির দাবী

সাহিত্যের ভবিষ্যৎ বন্ধন এত দূরে সম্পন্ন হইল
 ত্রিভুধরচন্দ্র গুপ্তেশাখ্যায় প্রণীত

[কাব্য] ভ্রমরভঞ্জন ২

মামল ১০০ ধূসর ১০০ তরঙ্গ ১০০ গায়ত্রি ১

স্বদেশের সম্রাট প্রকাশিত পুস্তকের প্রতিকার কর্তৃক আপনি আশ্রয় দিয়াছেন এবং
 আশ্রয়ের আট আনা সংস্করণের গ্রাহক হইয়াছেন।
 এখানে যাবতীর বাঙ্গালী পুস্তক পাওয়া যায়।
 অন্নদাবুধ ঈল, পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা, ২২০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট,
 কলিকাতা।

সম্মানী জরাতক সুখা প্রদত্ত

ইহা স্বদেশের সম্রাট সেবন করিতে কোন প্রকার ভয়ের কারণ নাই। ইহা সেবনে
 দুঃখ ও দুঃস্বপ্ন নহে, শ্রীহা যুক্ত ও ভ্রমরভঞ্জন কর, সান্নাওড়ী, কল্যাণ ও স্বদেশের
 প্রাচীনকর, কল্যাণের আট আনা সংস্করণের গ্রাহক হইয়াছেন।
 নিম্নলিখিত কল্যাণের আট আনা সংস্করণের গ্রাহক হইবে।

সর্ব সাধারণকে সাহিত্যের সহিত জানাইতেছি যে, যদি এই কল্যাণের গ্রাহক হইয়া
 আট আনা সংস্করণের গ্রাহক হইয়াছেন।

মূল্য—১ পিলি ২

অন্যান্য—কল্যাণের বাঙ্গালী প্রকাশক প্রকাশিত, ৩৪২৭ অগস্ত্য রাস্তা
 কলিকাতা জরাত সুখা হইয়াছেন। ২২০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা
 প্রকাশক—সি. এ. এ. প্রকাশক

স্বদেশের সম্রাট প্রকাশিত পুস্তকের প্রতিকার কর্তৃক আপনি আশ্রয় দিয়াছেন এবং

চরণ নিম্নে বিকশে কমল, সুর-সুরধ্বনী বহিয়া ধার—
 বিশ্বের যত লক্ষ্মীছাড়া মা নিম্নে করির বন্দনায়।
 ক্লিষ্ট কণ্ঠে বেদনানন্দ বাজিছে আকাশ বাতাসময়—
 জয় জয় শুভ শতদল-দল-বাসিনী জননী জয় মা জয়।

তব মা শরৎ আকাশ-বীণাপাণে-কহারে তব তব বাসিনী,
 আশ্বিনের রাগে সাজিল কান্তন, উদারী দেহায়েল-শিখিয়া শিক,
 বিহগ-কণ্ঠে বেহাগে লুণ্ঠে তব আগমনী অশ্রুস্রব—
 জয় বীণাপাণি মরাল-বাহিনী জয় মা জননী জয় মা জয়।

হতাশে না আজ হতাশ বাতাস পুরবীর বায়ে করেন লোর,
 উদীর সিক দখিনা সমীর ঢলায় চামর মাতা গো হোর।
 নিবিড় নীলে মা সাজায়ে পগটি গাতিছে প্রণত দিহলয়—
 জয় বীণাপাণি মরাল-বাহিনী জয় মা জননী জয় মা জয়।

সুদূর আকাশ অচপল-আঁখি-আনত তোমার চাক্ষুঃ পথ,—
 উদয় না সে মা, অস্ত-তোরণে উদবে তোমার পুষ্প-রথ।
 বন-বালাদল কচি কিশলয়ে সাজিয়া ঢুলিয়া ঢুলিয়া কয়—
 জয় বীণাপাণি মরাল-বাহিনী জয়-মা জননী জয় মা জয়।

লক্ষ্মী মায়ের লক্ষ্মী ছেলেরা নয় গো মা তোর সজ্জারী দেহ,
 তাপস ছেলে মা আমরা এসেছি গৈরিক-রাঙা পরিহিত সাজে
 বাণা-পাণ্ডুর শীর্ণ গণ্ড বাজিয়া হুগের অশ্রু বয়—
 জয় বীণাপাণি মরাল-বাহিনী জয় মা জননী জয় মা জয়।

অজলি-ভরা আমের নবীন মঞ্জরী দিয়ে তরোড়ি ধরি,
 মঙ্গল-ঘটে দুখ-লোর ধারা, দীর্ঘ ত্রিয়ার ছিন্ন ডাল
 রোদনে বন্ধিও-বোধন মা তোর, মা'র কাছে নাই হতভাল ভয়—
 জয় বীণাপাণি বাণী-বিহারিণী তাপস-জননী জয় মা জয়।

প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের, ভূমিকা

অধ্যাপক শ্রী গোপীনাথ কবিরাজ এম.এ.]

(১) শঙ্কর ও আগমসম্প্রদায়

আমরা শঙ্করপচারি, ব্রহ্মবাদেব দৃষ্টি
কল্পব্রহ্মবাদেব পদ দেখাইলাম। কিন্তু ব্রহ্ম
কইতে কেবল যেন মনে না জাবেন যে শঙ্কর
চার্য্য ঈশ্বরবাদবাদ মানিন নন না। বরং
শঙ্কর প্রত্যভিজ্ঞাসিক হই নিতেন এবং নিজেও
তাহা বহুস্থানে প্রকাশ্যে প্রচারিত কবিয়াছেন।
এ কথা আমরা পূর্বে আলোচনা কবিব।
সাধারণতঃ সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ে যে মত পচলিত
আছে এবং বহুতঃ ঘবন্দন কবিয়া “অবৈতন্য”
প্রস্থানের গুণাদি রচিত হয়, আত্ম কাল নাই
শঙ্করের এক মাত্র মত বলিয়া গৃহীত হয়।
কিন্তু তাঁহার মধ্যে বহুতঃ মত পচারেবও যে
সম্বন্ধ ছিল তাহা একবারে অস্বীকার করা
যায় না। আনাব মনে হই আগম ও নিগম
উভয় মার্গেই তিনি সম্প্রদায় প্রবর্তক হইয়া
ভগদগুরুগণের সার্ণকতা সম্পাদন কবিয়া
ছিলেন। জ্ঞান এবং উপাসনা, —সন্ন্যাস এবং
গার্হস্থ্য, উভয় দিকেই তাঁহার প্রচারশক্তি
অব্যাহত ছিল। মহাপুরুষগণের উপদেশ
দিবার ইচ্ছা সনাতন পদ্ধতি। বুদ্ধদেব,
মহাবীর প্রভৃতি ধর্ম প্রচারকগণ সকলেই

নানার্থিক পরিমাণে এই পদ্ধতিতেই অনুসরণ
কবিয়া গিয়াছেন।

কয়জন শঙ্করাচার্যের বিখ্য উপলভ্যমান
গ্রন্থমালা হইতে জানিতে পারা যায় যে আলো-
চনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। তদ্বশাংষ্ট্রেও
একাধিক শঙ্করাচার্যের পরিচয় পাওয়া যায় কি
না, তাহা স্বতন্ত্র কথা। তবে নানা দিক হইতে
ঐতিহাসিক আলোচনার ফলে ইহাই অনুমান
হয় যে তিনি একলাদী শঙ্কর তিনি আগম-
শাস্ত্রবিৎ ছিলেন। শুধু তাহাই নহে। তিনি
বহু আগমগ্রন্থের মতনা ও ব্যাখ্যা করিয়া ছিলেন।
বিশ্বদাত্তীও এই কথা।

প্রত্যভিজ্ঞা মতের সাহিত্য জিগুর্বাশিকাত্তের
হথবা জীবিত্তার আত্ম বনিষ্ট সম্বন্ধ। শঙ্কর এই
জীবিত্তার একজন একনিষ্ট সাধক ছিলেন।
পূজ্যবী মতে এখনও তাঁহার জীবিত্ত
বহিঃস্থ আছে, এখনও সেখানে তাহার উপাসনা
হইয়া থাকে। শঙ্করাচার্যের পবনগুণ
গৌড়পাদাচার্য্য জীবিত্তা প্রতিপাদন করিবার
বহু “ব্রহ্মগোন্দ” নামক গ্রন্থের রচনা করেন।
ইহার উপর শঙ্করের টীকা আছে * এবং

* সূত্রমালায় পূর্বে শঙ্করাচার্যেরও ব্যাখ্যা আছে। টীকা ব্রহ্মগোন্দই পাওয়া যায়। লক্ষীধর চন্দ্রশঙ্করহরীর
ব্যাখ্যাত্তে শুধু শঙ্করীটীকাই একটি উদেখ কবিয়াছেন। সম্ভবতঃ তিনিই টীকা তাঁহার রচনা হয় নাই।

কল্পিত হইলে উহা নানা বা বিচিত্র আকারে প্রতীকৃত হয়। যিনি স্বাধারী ভায়, মহামৌলীর ভায়, শুধু পেছাতে এই বৈচিত্র্যময় বিষয় বিজ্ঞতন করেন, তিনিই আত্মদো—
—কল্পদেব। এখানে এই যে মারাবী ও যোগীর দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল প্রত্যভিজ্ঞা ও ত্রিপুরাদর্শনে ঠিক এই দুইটি দৃষ্টান্তই আছে এনা ভগবতের সৃষ্টি যে ইচ্ছাশক্তিমূলক—উপাদান নিরপেক্ষ—তাহার বিচার আছে *। প্রত্যভিজ্ঞা কারিকাতে উপলব্ধি বলিয়াছেন—

চিদাত্মের দেবোক্তঃস্থিতমিচ্ছাবশাদ্ বহিঃ।

যোগীর নিরুপাদানমর্থজাতং প্রকাশ্যেৎ ॥

অর্থাৎ সৃষ্টি বলিতে অন্তঃস্থত পদার্থের বহিঃ প্রকাশকে বুঝায়। সকল পদার্থই চিদাত্মার অন্তঃস্থিত, শুধু ইচ্ছাবশতঃ কখন কখন কিছু কিছু বহিঃপ্রকাশিত হয় মাত্র। এই বহিঃপ্রকাশনই বস্তুতঃ সৃষ্টি শব্দের অর্থ। সূত্রের দ্বারা বাস্তব প্রত্যক্ষ সৃষ্টিতে উপাদানের অপেক্ষা নাই। ইচ্ছাশক্তি অবলম্বনে যখন বস্তু নিষ্কাশন হয় তখন পূর্বসিদ্ধ পরমাণু প্রয়োজন হয় না। যাহারা যোগীর সৃষ্টিব্যাখ্যা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহারা এই দৃষ্টান্তে সার্থকতা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে যোগীর সৃষ্টিও পরমাণুসাপেক্ষ—যোগী যখন ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করেন তখন উহার প্রেরণায় পরমাণু সকল আপনা আপনি আসিয়া একত্র হয়।

কিন্তু অভিনবগুণ উক্ত কারিকার ব্যাখ্যায় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে এ প্রকার কল্পনার কোমল নাই : “ন হি একং বক্তৃক্যম্—পরমাণুবো যোগীচ্ছয়া সৃষ্টিতি সংখ্যতাঃ কার্য-স্বাপ্যন্তে ইতি” (ঈশ্বরপ্রতিজ্ঞাবিশিষ্টা, পৃ. ১৮৩)। ইহার কারণ এই যে যাহারা পরমাণুবাদী তাহারা সাক্ষাৎভাবে পরমাণু হইতে সৃষ্টিবস্তুর উৎপত্তি স্বীকার করেন না। মদ্যে অবাস্তুর অব্যবহার ব্যবহৃত আছে বলিয়া মানেন। এমন ঘট নিষ্কাশন করিতে হইলে শুধু পরমাণু সমূহকে বিশিষ্টসংস্থানে অর্থাৎ ঘটাকারে সমীকৃত করা সাক্ষাৎভাবে সম্ভবপর নহে। পরমাণু হইতে বায়ুক, বায়ুকের সম্মিলনে ত্রসরেণু, এইরূপ ক্রমশঃ সূক্ষতর কার্যের উৎপত্তি হইতে থাকে। পরে কপাল নির্মিত হইলে দুইটি কপালের পরস্পর সংযোগে ঘটের সৃষ্টি হয়। শুধু তাহাই নহে। শৌকিক সৃষ্টিতে কিংবা উপাদান-সাপেক্ষ সৃষ্টিতে নির্দিষ্ট সহকারীর আশ্রয় চাই, শিক্ষাও অভ্যাসের প্রকর্ষ চাই। নতুবা বস্তু নিষ্কাশন সম্ভবপর নহে। কিন্তু যোগীর সৃষ্টিতে এসব কিছুই অপেক্ষিত হয় না। সূত্রের যোগীও পূর্বসিদ্ধ পরমাণুকে অবলম্বন করিয়া সৃষ্টি করেন একরূপ কল্পনা নিবৃত্তক। যোগিজ্ঞানের এমন মহিমা যে আভাসবৈচিত্র্যময় পদার্থসমূহ ইচ্ছান্যেই প্রকাশিত হয়। আসল কথা এই যে সংবিৎ স্বাতন্ত্র্যময়ী (free), যখন

* প্রত্যভিজ্ঞানদর্শনের সিদ্ধান্ত আলোচনা করিলে এই সব বিষয়ের নিশ্চয়িত বিবরণ থাকিবে।

† মাঘবাচার্য্য সবদর্শনসংগ্রহে ‘প্রত্যভিজ্ঞানদর্শন’ শিরোনামে (জ্ঞানলাভন বংশধর, পৃ. ৪৯)। “যে তু সৃষ্টিতি যোগ্যমানং বিনা” ইত্যাদি বাক্যবাহ্য এই মতের উল্লেখশূন্যক গওন করিয়াছেন, অর্থাৎ যাহারা বলেন যে যোগীর ইচ্ছায় পরমাণু আকৃষ্ট হইয়া সূক্ষবস্তু নির্মিত হয় তাহাদের সিদ্ধান্ত অসঙ্গত বলিয়া প্রত্যাশিত করিয়াছেন।

তাহাতে ইচ্ছার উদয় হয় তখন সেই অপ্রতী-
যাতরূপ ইচ্ছার বশে অন্তর্স্থিত অর্থাৎ জ্ঞানরূপে
কিংবা আত্মার সঙ্গে অভিন্নরূপে স্থিত পদার্থ
সমূহ ক্ষেয়রূপে অবতাসিত হয়। বাহ্য 'অতঃ'
রূপে দৃষ্টার সহিত এতদাকার ছিল তাহা 'ঈদং'
রূপে পূর্ণগুণভাবে ক্ষুটিয়া উঠে। কল্পিত প্রমাতা
অর্থাৎ দেহাদিতে প্রাদাআবোধকৃত দৃষ্টার
কাছে,—পরিচ্ছিন্ন সার্থিঃ এর তাচ্ছ—এই
পদার্থ বাহ্য বস্তুয়া পরিণামিত হয়।

অতএব এই বিশেষ আভাসবোধের
মূল চিন্তাধার স্বাতন্ত্র্যশক্তি প্রত্যক্ষপ্রত্যক্ষ
উক্ত দ্বিতীয় প্রোক্তার বাস্তবিক এই রূপেই
ইচ্ছাশক্তির উপাদাননিরূপণের সৃষ্টিসামর্থ্য
বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে
বিশাখিত প্রভৃতি পরিণকসম্মাধি অবিগণ
উপাদান, উপকরণ ও প্রয়োজন বাস্তবকেও
কেবল মাত্র স্বেকার সকল প্রকার ভোগ
সামগ্রীতে পরিপূর্ণ স্বলোক সৃষ্টি করিয়া
ছিলেন। ইহাই যোগিস্টির দৃষ্টান্ত। ঈশ্বর-
সৃষ্টিও এইরূপ, কাবণ তিনি স্বতন্ত্র ও সর্বশক্তি
(বার্তিক ৪০) *। তিনি আশ্রয় বলিয়াছেন
যে ঈশ্বর কীরকব্যাপার বিনা কঠা, এবং
প্রমাণব্যাপার বিনা সর্বজ্ঞ, কারণ তিনি
অপ্রকাশ। তাহার জ্ঞাতব্য, কর্তব্য প্রভৃতি
তাঁহার স্বাতন্ত্র্যশক্তিরই মনোভর। তাহার
ইচ্ছাশক্তি স্বজনকারিতারূপ—ইহা অল্প
নিরূপক এবং অপ্রতিহত। এই ইচ্ছাবলে
তিনি "কর্তুং", "ন কর্তুং" ও "অত্যা কর্তুং"
অর্থাৎ প্রবর্তন, নিবর্তন ও পরিবর্তন করিতে
সমর্থ—ইহা স্বতন্ত্র। যোগিগণ এই ইচ্ছাশক্তির

স্বরূপকেই সামাজ্য বলেন—দশম স্লোকে ২১
কারিকা উক্তব্য। সামাজ্য সর্বত্র আত্মতাবের
বিকাশ, বাহ্যদের সমাধি পরিপক হইয়াছে
ঐচ্ছাদেই ইহা লাভ হয়। ইহাই পাদমৈশ্বর্য
—অন্ত্যন্ত খণ্ডবিভূতি ইচ্ছার উদয়। কিছুই
নাই। আত্মা মতেই—(১০।৩)
স্বরেশ্বর বলিয়াছেন—

বদ্যৈশ্বর্যাবিপুড়িতঃ স্ববিজ্ঞানবান্দয়ঃ।

ঐশ্বর্যবস্তো ভাস্যে স এবাশ্রয় সমাধিবঃ ॥

পরবর্তী কারিকায় আছে যে পূর্ণাঙ্কতা লাভ
ইহা এই ঐশ্বর্য আপনিই নিশ্চিত হয়, সে
জন্য বস্তুর চেষ্টা করিতে হয় না। অগ্নিলাভ
হইলে তাপলাভের জন্য স্পর্শকর্তব্যে যত্ন করিতে
হয় না। স্তোত্রের দশম স্লোকে শব্দর মিজো
এই সর্বাঙ্গতা বা পূর্ণাঙ্কতার 'মহাবিভূতি'
বর্ণনা করিয়াছেন। এই 'অদ্যাহত
ঐশ্বর্য', অগ্নিমানি অসমিদ্ধি তাহাও পরিণাম
মাত্র। এই "অহং" নির্দেশের, স্তবরাং
অপরিচ্ছিন্ন ও পূর্ণ—ইহা সর্বত্র নহে, মলিনও
নহে (৪।৩১)। নবম ও দশম উৎসর্গের বার্তিকে
(১২, ১৪, ১০।১০) পরোক্ষতার দ্বিতিকে ৩৬
শ্রুতাত্মক অর্থাৎ বিশ্বাসের পরিণাম বর্ণনা করা
হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে ৩৬ তত্ত্ব
প্রত্যভিজ্ঞা ও ত্রিপুত্রা জ্ঞানব সুপরিচিত
সিদ্ধান্ত। এই সব তাৎপর্য্যে করিলে স্পষ্টই
প্রতীতি হয় যে শব্দর ও প্রোক্তার এই গুণে
সাক্ষাদভাবে আগমেরই অনুসরণ করিয়া
চলিয়াছেন। এই যে পূর্ণের সৃষ্টিতে
উপাদাননিরূপণের কথার কথা ইহাও শব্দর
বেদান্তেও ইহা অতিদূরনিরূপণোপাদানবাদ বলিয়া

ঈশ্বরোচনশক্তিধার স্বতন্ত্রোজ্ঞানপোষিতঃ।

বেদান্তোক্তেই সকলং সজ্ঞাতাব্যক্তি তচ্চি ৫ ॥

১. পরম প্রকাশ, রাসদেবী পত্রিকার প্রকাশ

পরিচিত আছে। অবশ্য অপর ভাষায় জানিলে নিমিত্ত ও উপাদানের ভেদ স্থাপন করিতেই হইবে। কিন্তু কথ্য এই শাস্ত্রীয় ভাষা ব্রহ্মের মূখ্যকর্তৃত্ব অস্বীকার করে নাই। শব্দর স্পষ্টাক্ষরে লিখাছেন যে ঈশ্বরই সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান নহে, উহা অবিজ্ঞাত ও অপরিচ্ছিন্ননিবন্ধন, সুতরাং সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান বিজ্ঞাত্বকোপাধিপরিচ্ছিন্নভাবে কমেবৈতৎসম্বন্ধে সর্বজ্ঞত্বং সর্বশক্তিঞ্চ চ ন পশ্যন্তঃ। (বসু-পাক্ষসর্বোপাধিস্বরূপ আত্মনির্দেশিত্বমবজ্ঞানবিবাকার উপপত্তয়ে। ব. পৃ. ১৩৪, ভাষা)। এই ভাষাংশ হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে চিদাচার ঈশ্বর অবিজ্ঞাত, স্বতঃসিদ্ধ নহে—সুতরাং ঈশ্বরত্ব যখন বিজ্ঞানলৌকে অবিজ্ঞাতকর্তৃত্ববোধিত হইয়া যায় তখন ঈশ্বরত্ব থাকে না। দক্ষিণামূর্তি স্তোত্রের ১০ম শ্লোকে শব্দর স্পষ্টাক্ষরে লিখাছেন যে ঈশ্বরও থাকে, সর্বজ্ঞত্বস্বরূপ মহাবিভূতি থাকে, পূর্ণতত্ত্ব থাকে—এই চিদা আত্মস্বরূপ হইতে বিলক্ষণ মতঃ, ঈশ্বরত্ব দেবের স্বভাবভূত, অবিজ্ঞাননিবন্ধক নহে। সুতরাং চার্য্য ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন—

ঈশ্বর্য্যামীশ্বরত্বং তিষ্ঠত্যন্যাত্মপূর্ণকর্তৃতিঃ।

পুরুষে ধাবমানোহপি তদ্ব্যাপ্তমবধাতি ॥

ঈশ্বরতাব ও শুদ্ধতাব পৃথক নহে, সুতরাং আত্মজ্ঞান হইলে ঈশ্বর্য্যাত্ম আপনাই লাভ হয়।

(৮) ত্রিপুরা ও প্রত্যভিজ্ঞানশাস্ত্রের

পরস্পর সম্বন্ধ

আমরা প্রসঙ্গতঃ প্রত্যভিজ্ঞানশাস্ত্রের সহিত ত্রিপুরা ও স্পন্দমতের অনিষ্ট সম্বন্ধের কথা বলিয়াছি। যে আগম একের আকার গ্রন্থ অপরেরও তাহাও। উপাসনার পার্থক্য বক্ষ্য করিবার জন্য পৃথক প্রস্থান রচিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাও একই মূলের উপর প্রতিষ্ঠিত। ফলে উভয়ে পদ্ধতির ভেদ ভিন্ন তাত্ত্বিকদৃষ্টিতে বিশেষ কোন ভেদ লক্ষিত হয় না। এই জন্যই আমরা প্রাচীন আচার্য্যগণকে ত্রিপুরাসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে লিখিতে দেখিয়া শিবসূত্র ও প্রত্যভিজ্ঞানসংগ্রহ প্রত্যভিজ্ঞান-বিমর্শিনী, তত্ত্বানুগোচর প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ শৈব-গ্রন্থ হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিতে দেখি। পক্ষান্তরে উৎপলদেব, কেমরাজ, অভিনবগুপ্ত, মহেশ্বরানন্দ প্রভৃতি শৈবাচার্য্যগণ যথাপ্রয়োজন বোগিনীসদয়, কামকলাবিলাস, ত্রিপুর-সুন্দরীমন্দির প্রভৃতি গ্রন্থের প্রামাণ্য স্বীকার করেন। সাংখ্য ও যোগে যেমন নিকট সম্বন্ধ ত্রিকমত ও ত্রিপুরা মতেও সেইরূপ। পরমহংস-রামকল্পসূত্র, বিন্দুসূত্র, তত্ত্ববাজ, ত্রিপুরারহস্য, নিত্যানন্দর, বামকেশ্বরতন্ত্র, পবমানন্দতন্ত্র, সৌভাগ্যরত্নাকর প্রভৃতি ত্রিপুরামতের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ—ভাস্কর রায়, রুবি রামেশ্বর, লক্ষ্মীধর, উমানন্দনাথ, অমৃতানন্দ এ মতেও উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যাগণ। এই সব পর্য্যালোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়—প্রত্যভিজ্ঞানশাস্ত্রের সহিত ত্রিপুরাসিদ্ধান্তের দার্শনিক আশ্রয়ের অর্থাত্ জ্ঞানকাণ্ডের ভেদন কোন পার্থক্য নাই।

প্রত্যভিজ্ঞান ও ত্রিপুরা সিদ্ধান্ত আত্মতত্ত্বের একই। অনেক হলেই স্তোত্র ও ব্যক্তিকের ব্যাখ্যায় ভ্রম করিয়াছেন। ফলে সে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠান হইবার দীক্ষাতে তাহার আত্মসত্তা নাই।

তবে একটা কথা অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে। উভয় নংই ৩৬ তত্ত্ব অলৌকিক হইয়াছে—যাহার পরে যাহা তাহা তত্ত্বাতীত। বিশ্ব এই ৩৬ তত্ত্বের সমষ্টি। তত্ত্বাতীত হইতেই তত্ত্বের উদ্ভব, তাই উভয়ই মূলে এক। সেই কল্পই সেই পরম বস্তু যুগপৎ তত্ত্বাতীত অর্থাৎ বিশ্বাতীতও বটেন, আবার দর্শনতত্ত্বময়, সূত্রগাং বিশ্বাত্মকও বটেন। এই বে বিশ্বের কথা বলা হইল ইহার মধ্যে ৩৫শ ও ৩৬শ সংখ্যক তত্ত্ব, যাহার পারিভাষিক নাম শিব ও শক্তি, তাহা নিত্য—এমন কি তাহার আবির্ভাব তিরোভাবও নাই, তাহা সদাশিবিতা। তাই প্রকৃত প্রস্তাবে ৩৪টি তত্ত্বই অর্থাৎ পৃথিবী হইতে সদাশিব তত্ত্ব পর্য্যন্তই বিশ্বনামে অভিহিত হইবার যোগ্য। সূত্রগাং সৃষ্টি বলিতেই সদাশিব প্রকৃতি তত্ত্বমালায় ক্রমশঃ আবির্ভাব বুদ্ধিতে হইবে। এই আবির্ভাবের বীজ, যাহার ক্রম-বিকাশই বিশ্ব, তাহাই শক্তি। এই শক্তির সঙ্গে শিব চিরমিলিত। শক্তি অন্তর্মুখ হইলেই শিব, শিব বহির্মুখ হইলেই শক্তি। অন্তর্মুখতাব ও বহির্মুখতাব উভয়ই সদাশিব—কেন না পরমেশ্বর নিত্যই “পঞ্চ-রূপাকারী”। শিব তবে শক্তিভাব গোণ, শিব-তাব প্রধান,—শক্তি তবে শিবভাব গোণ, শক্তিভাব প্রধান। কিন্তু যেখানে শিব ও শক্তি উভয়ই একরূপ, সেখানে শিবের ও শক্তির নাই শক্তিরও প্রাবল্য নাই—সেটা সামান্যত্ব। ইহাও নিত্য অবস্থা। ইহাও তত্ত্বাতীত। কেহ কেহ ইহাকে ৩৭শ তত্ত্বও বলেন। কেহ বলেন ইহার সঙ্গে কিছু বলা যায় না, কিছু তাহা বার না—ইনিই

সংসারের চরম লক্ষ্য। শৈবের ইনি পরমশিব, শাক্তের ইনি পরাশক্তি, বৈষ্ণবের ইনি ক্রীড়গবন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে এ সব নামও শুধু নামমাত্র—ব্যবহারলোকেরে লক্ষ্য করিতে যুগপৎ।

৩। আগম ও সূক্ষ্মমত

ত্রিপুরা মাতর সহিত প্রাতিজ্ঞামতের মৌলিক সঙ্গতি প্রতীত হইল। এই উভয় মতের সঙ্গে গোড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তের ঐতিহাসিক সঙ্গত আছে বলিয়া মনে হয়। ইচ্ছা আছে গোড়ীয় সিদ্ধান্তের বিখ্যারিত ব্যবরণ করিবার সময় বাল্যকালে এই বিষয়ে আলোচনা করিব। কিন্তু শুধু তাই নহে; আমার বিশ্বাস সূক্ষ্ম মতের সহিতও ত্রিপুরাদিসিদ্ধান্তের সঙ্গতি অনেক আছে। এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কাহারও দৃষ্টি আকর্ষিত হয় নাই। সেই কল্প সে সঙ্গত হই একটি কথা বলিয়া আপাততঃ আমরা এই সুমিষ্ট উপসংহার করিব।

ক্রিমার (Von Kremer), ডোজি (Dozy), সাচি (Sylvestre de Sacy) প্রকৃতি আচার্যগণ মনে করেন সূক্ষ্মগণ আপন সিদ্ধান্তের সঙ্গে বেদান্তদর্শনের নিকট গর্ভী। কল্যাণ বৈষ্ণব প্রাঙ্গণ কবি গেটেও তাহাই বিশ্বাস করিতেন। তাহার West-Ostlicher Divan নামক গ্রন্থে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে নিকলসন (Nicholson), গিব (Gibbe) প্রভৃতি পাণ্ডিত্যগণ মনে করেন নব্যপ্রাচীন (Neo-Platonic) মতের সহিত সূক্ষ্মমতের সাম্যত্ব। এই বিপরীত সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য হইতে

এই কথাটি বলিয়া থাকেন। এই প্রকারে
বস্তু ত্রিপুঞ্জমতে ইজাইট "সৌন্দরী" বা "সৌন্দর্য-
সুন্দরী"—শব্দরাচায্যের সৌন্দর্যালঙ্কার ইজাইট
স্বরূপবর্ণনা। সৌন্দর্যালঙ্কার ১২শা প্রকার
কথিত হইয়াছে যে পূর্ণ সৌন্দর্য্য
হাস্য তুলনা নাট্য কবিতা হাঙ্গ বর্ণনায় নান
অক্ষরামণ্ডলীর সৌন্দর্য্য হাঙ্গর
তুল্য নহে—হাঙ্গর দর্শনাভ্যুত্থানোত্তম
জলন কেন সমগ্র জগৎ আনন্দ
সৌন্দর্য্যেরই কণমাত্রি পাটয়া বিক্ষ
মুর্ছিতে সাক্ষ্য শব্দকে ও মোহ
ভ্রাস্তন, ইজাইট রূপায় মদন মনিষ্য
মোহন করিয়া থাকেন—সৌন্দর্য্য
শ্লোক ও বামকেশব মহাশয়ের
প্রকণা বর্ণিত আছে।

এই সুন্দরীর উপাসকগণ ইচ্ছাকৃত
রূপে উপাসনা করিয়া থাকেন। চোড়শ
ষোড়শ কলা সমস্ত কলাই নিম্ন, এই
সম্মিলিতভাবে ইহাদিগকে ত্রিত্রয়োদশিক
বলিয়া বর্ণনা করা হয়। তবে প্রথম ১৪
কলার উদ্যম আছে, তদবধি জ্ঞান, চোড়শীর
জ্ঞান নাই। তাহা অসম্পূর্ণ নারী
চন্দ্রকলা। বৈয়াকরণগণ ইহাকে শুদ্ধ
বাক বলিয়া থাকেন, দর্শনশাস্ত্রে ইহার
জাদিক নাম আত্মা, মনুশাস্ত্রে ইহাকেই
বা দেবতার স্বরূপ বলা হয়। অতএব বাহ্যিক
পূর্ণচন্দ্র বলি তাহা, বস্তুতঃ পূর্ণ চন্দ্র, কারণ
তাহার ক্ষয়েরই আছে। বাহ্যিক পূর্ণবিক-
শূর্ণ তাহাতে নানাবিকাভাব থাকে তাহা
না। ইত্যাদি পূর্ণতা যেহেতু নাহক
আছে—তাহা নিত্যানন্ত, অমৃতত্বময়, অক্ষয়।
ইনিই মহাদ্বিপুরাণের বলিষ্ঠা—সুন্দরী

[illegible]

निम्नलिखित तालिका में दिए गए विवरणों के अनुसार प्रमाणित किया जाता है कि

দেখান বাইরে গিয়ে। প্রগতিজ্ঞানমতের
কামীরীর শৈবজ্ঞানমত ও পঞ্চাশকে
ভাবেই পান করিয়া থাকেন।

তারপর তৃতীয় সিরাজ বা চন্দ্রাজী
মহাও আপা পাওয়া যায়। এই মহাও
জ্যোতিঃই চন্দ্রাজী চন্দ্রবিশ্ব (বা চন্দ্রবিশ্ব)
বৈদিক মহাভাষ্য। দেবতাসকলকেই
রখিয়া। উচ্চাটিকা, মাতৃকা, মণ্ডা, মণ্ডা, মণ্ডা
প্রভৃতি নামে সম্বোধিত করা হয়। এজন্য
মাল্য আপা চন্দ্রাজী চন্দ্রবিশ্বের
বহির্বিকাশ। এই চন্দ্রবিশ্বেরই প্রথম।

অধ্যাপক চন্দ্রাজী চন্দ্রবিশ্বের প্রথম
রস ও প্রেমার সঙ্গী। পান নাই।
(Ottoman Empire vol I, p. 64) এই
মতের ইতিহাস। অধ্যাপক চন্দ্রবিশ্বের
নবপ্রাচীন মতের চন্দ্রবিশ্বেরই প্রথম।

এই চন্দ্রবিশ্বের আধুনিক সিদ্ধান্ত ও
চন্দ্রবিশ্বের গবেষণা করিলে মনে হয় অতীত-
চন্দ্রবিশ্বের মতামতের সহিত চন্দ্রবিশ্বের
এটা সমস্ত আলোকজাগ্রততার ততটাই নহে।

(১০) উপসংহার

আমরা অত্যন্ত সংক্ষেপে প্রগতিজ্ঞানমতের
ইতিহাস দিলাম। প্রগতিজ্ঞানমতের প্রচলন
এবং কামীর ও দক্ষিণাপথে চন্দ্রবিশ্বের
চন্দ্রবিশ্বের মধ্যে পরিচালিত হওয়া
করিলে মতের বহির্বিকাশ। এখন আমরা অবশ্য
চন্দ্রবিশ্বের প্রথম প্রচলিত বিচারের
অধ্যাপক প্রথম চন্দ্রবিশ্বের প্রথম।
চন্দ্রবিশ্বের প্রথম চন্দ্রবিশ্বের প্রথম।
চন্দ্রবিশ্বের প্রথম চন্দ্রবিশ্বের প্রথম।
চন্দ্রবিশ্বের প্রথম চন্দ্রবিশ্বের প্রথম।

ফাগুন

[চন্দ্রবিশ্বের প্রথম চন্দ্রবিশ্বের প্রথম]

চন্দ্রবিশ্বের প্রথম চন্দ্রবিশ্বের প্রথম

অধ্যাপক,

ও সে চন্দ্রবিশ্বের প্রথম চন্দ্রবিশ্বের প্রথম

পলাসে গিয়ে চন্দ্রবিশ্বের প্রথম চন্দ্রবিশ্বের প্রথম

চন্দ্রবিশ্বের

ও চন্দ্রবিশ্বের প্রথম চন্দ্রবিশ্বের প্রথম

শোকের প্রথম চন্দ্রবিশ্বের প্রথম

চন্দ্রবিশ্বের প্রথম চন্দ্রবিশ্বের প্রথম

চন্দ্রবিশ্বের প্রথম চন্দ্রবিশ্বের প্রথম

অধ্যাপক,

ও গো মীল হিঁসে আকাশটাকে

হঠাৎ কাটালে

কে মেঘ-সাগরে ডেউ হেলানো

জোয়ারে জাগামে

বসন্ত ভাঙে মনে বনে

দিচ্ছে দূর স্বপ্নে

কোন মাতালে মাড় চলেছে মনসে

বীণায় মনোহারা

দীর্ঘ র নিয়ন্তা

[শ্রীমতীর চরিত্র]

চড়কের মেলা। রাধধনবাবুও নাঠিল
চারদিক্‌ ঘিরে মেলা বসেছে। পুতুলের
দোকান—খাবারের দোকানে নাটকের অর্ধ
কের ওপর ভরে গেছে। ছোট, বড়, ছেলে,
মেয়ে—বেউ বাবার হাত ধরে, কেউ দাদা-
কোলে চড়ে আর কেউ বা বি চাকরদার
সঙ্গে মেলা দেখতে এসেছে। চারিদিকে
আনন্দ বল কল শব্দে ছুটে চলেছে।

মেলায় প্রবেশ পথে ফুল পানি দিয়ে
একটা ফুটক ফটক তৈরী করা হয়েছে।
এই ফটক দিয়েই সকলে যাচ্ছে—আসছে।
নাঠের সঙ্গে মেলা তখন খুব জমে উঠেছে,
কোথাক নাগর সোনার কলকল কলকল ছোট

কোঁ চেয়ে বসন্তের কীট পড়িয়ে
ছড়, কোথাও কাণ্ডে কোথাও ছড়
সাদা দীর্ঘের ঘোড়ার উপর নাটকের
মিলে।

শোভনা আজ লোকের সঙ্গে
বসেছে। ছাড়াই লোকের সঙ্গে না
কি করেছে। আশপাশের লোক
দিয়ে মোড় দিয়ে রাস্তার ধারে
একটা বড় বড় খাড়া পত্র পত্র—
কত কি। শোভনার মা নেই—
আদ্যবৈ কখন অল্প থাকে না। এই
সকলের ব্যবসার মতোই
কবে দিতে একটি মনে

“এইবার তোমার কী হবে?” শোভনাও ভাবছিল। “এই চলে বাবা, সন্ধ্যা হলেই ফিরে আসবে।”

হাত তখনও তখনও—শেষ পর্যন্ত কিছু একটাও হঠাৎ করেই—সেই যে কখনো, প্রায় খেলনা, গুলুগুলা, সেই যে কখনো, বাড়ীর সাইনবোর্ডের—সেই যে কখনো, তাব’কি অসংখ্য—সেই যে কখনো, কুটে উঠে—সেই যে কখনো, ফিরতেই বাবা—সেই যে কখনো,

সাজান’ ফাঁটুর—সেই যে কখনো, ত্রিধাবিনী ছোট—সেই যে কখনো, ফটকের সামনে—সেই যে কখনো, হাঁটু গেড়ে—সেই যে কখনো, শায়—সেই যে কখনো, শর দিকে—সেই যে কখনো, না। কত যে—সেই যে কখনো, খেলনা ভাব, সেই যে কখনো, কেউ থাবাব—সেই যে কখনো, ত্রিধাবিনীর—সেই যে কখনো, দেখছিল, তাই যে—সেই যে কখনো, দিকে। কত যে—সেই যে কখনো, ছোট ছোট হাঁটু—সেই যে কখনো, আকার তখন—সেই যে কখনো, অমন খেলনা—সেই যে কখনো, কক্ষচুলগুলির—সেই যে কখনো, বুকের মধ্যে—সেই যে কখনো, গণিবের মেয়ে—সেই যে কখনো, হু’বলী ধরে—সেই যে কখনো, গুলিকে সে—সেই যে কখনো, বার কেউ—সেই যে কখনো, কোনমতেই—সেই যে কখনো,

বারা বসে, শোভনাও—সেই যে কখনো, গুলুগুলা—সেই যে কখনো, প্রচলিত—সেই যে কখনো, “এইবার তোমার কী হবে?”

সেই যে কখনো, “এই চলে বাবা, সন্ধ্যা হলেই ফিরে আসবে।”

সেই যে কখনো, হাত তখনও তখনও—সেই যে কখনো, শেষ পর্যন্ত কিছু একটাও হঠাৎ করেই—সেই যে কখনো, প্রায় খেলনা, গুলুগুলা, সেই যে কখনো, বাড়ীর সাইনবোর্ডের—সেই যে কখনো, তাব’কি অসংখ্য—সেই যে কখনো, কুটে উঠে—সেই যে কখনো, ফিরতেই বাবা—সেই যে কখনো,

সাজান’ ফাঁটুর—সেই যে কখনো, ত্রিধাবিনী ছোট—সেই যে কখনো, ফটকের সামনে—সেই যে কখনো, হাঁটু গেড়ে—সেই যে কখনো, শায়—সেই যে কখনো, শর দিকে—সেই যে কখনো, না। কত যে—সেই যে কখনো, খেলনা ভাব, সেই যে কখনো, কেউ থাবাব—সেই যে কখনো, ত্রিধাবিনীর—সেই যে কখনো, দেখছিল, তাই যে—সেই যে কখনো, দিকে। কত যে—সেই যে কখনো, ছোট ছোট হাঁটু—সেই যে কখনো, আকার তখন—সেই যে কখনো, অমন খেলনা—সেই যে কখনো, কক্ষচুলগুলির—সেই যে কখনো, বুকের মধ্যে—সেই যে কখনো, গণিবের মেয়ে—সেই যে কখনো, হু’বলী ধরে—সেই যে কখনো, গুলিকে সে—সেই যে কখনো, বার কেউ—সেই যে কখনো, কোনমতেই—সেই যে কখনো,

সর্বেশ্বর বাবুও ভাবছিলেন—মেয়েটা কতখানি আবদার নিয়ে একটা বাণী জার কাছে চাইছিল। তিনি পেচন ফিরে থাকিয়ে দেখলেন ভিখারিণী তখনও তেমনি করে কাতর হয়ে, কত লোকে কাছে ভিক্ষার জন্ত হাত বাড়চ্ছে—কিন্তু সেই প্রার্থনা একটাও সফলতার রূপ ধরে তার মনোরথ পূর্ণ করতে, পড়ে না। শোভনার হাত ধরে আবার তিনি বাড়ী মুখো হলেন।

খানিকটা পথ অতিক্রম করবার পর সর্বেশ্বর বাবুর দৃষ্টি পড়ল, যে হালটী অন্ধ মেয়ের হাত ধরে ভিখারিণী আসছে! তার স্রুণ গতির প্রত্যেক ইচ্ছাতে একটা নিফল-তার স্রোত ফুটে ফুট উঠছিল। সর্বেশ্বর বাবু দীর্ঘে চলতে লাগলেন।

রাস্তাব একপাশে গাঁকতরা দখবে নাদা দাড়ী বৃক পৃষ্যন্ত ঝুলিয়ে এক বুড়ো একটা খেলনার ঝড়িতে রকমু দকম খেলনা সাজিয়ে কাগজের তৈরী একটা কুমকুমি বাঁজিয়ে ফ্রেণ্ডার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে চেষ্টা পাচ্ছে।

ভিখারিণী মেয়ের হাত ধরন পথ চলেছে। চলতে আর পাচ্ছে না—ঐ দিব করাত পড়ছিল না, তার পা টলাচ্ছে—না, পৃথবী! বুড়ার হাতে কুমকুমি বেড়ে উঠেছে—একহাতে নার কোমরটা গড়িয়ে মুখের দিকে চেয়ে, অল্প হাতখানি বুড়ার খেলনার কুড়ির দিকে ছোঁলে বললে “চল না—একটা ঐ খেলনা কিনা দে।” সে নিঃস্বপ্ন কৃত্ত শব্দে মাকে ঠেকা লাগল। ভিখারিণীও গল্প করবার সীমা ছাড়িয়ে সেই একখানি সখা পরমাটা দিয়ে মেয়েকে একটা

কুমকুমি কিনে নিলে। মেয়েটা কাঁদছিল সেটাকে বুকে বুকে মার সঙ্গে আঁবরে চকতে লাগল।

সর্বেশ্বর বাবুর রোডের সামনে যে পাঁচটা জুয়াকপ হুঁড়ি ধরে দাঁড়াগো। তিনে বাস্তার একপাশে ধমকো লাড়িতে পড়লেন। ভিখারিণী তাঁর পাশ দিয়ে একটা মোড় দিবার অল্প বাস্তার চলে গেলে তিনি তাপ আ-সরণ করে দেখেন পেচন চললেন। খানিকটা পথ চলেই ভিখারিণী সব অন্ধকার একটা গালির মধ্যে ঢুকলেন! গালির শব্দে দেখেই সর্বেশ্বর বাবু বুঝে নিলেন—কোন শ্রমীর লোক এখানে থাকতে পারে! তিনে হ'পাশে ছোট ছোট খোলাব ঘর—তার একখানা বরের দরজা খুলে ভিখারিণী মেয়ের হাত ধরে তার মধ্যে প্রবেশ করল। সর্বেশ্বর বাবুও বাড়ীখানা দেখে নিয়ে অল্প বাস্তা ধরলেন।

ছোট খোলাব দরপানার এক পাশে, চার পাঁচটা একবোসিন কাঠের বাস্ত এক করে—তার ওপর ছোট কাঠের নিয়ে একটা খিটনা পাঁচনা ধারে ধারে মেয়েটিকে তার ওপর শুক রদিয়ে, বরের এক পাশে একগাম্বি খড় দেয়ানো আর একটা শরায় ভিখারিণী নিজেকে এলিয়ে দিলো। বরের এক কোণে মুড়াকা একটা কুড়ো কুড়ো—তার পাশে জীব ছোট একটা বাস্তের ওপর ড'একটা মাতীর কলসী, একটা কলাই করা গেলস ও একটা কলসী—আসবার! মাতীর দেওয়ানের ওপর এক কোণে বেরোসিন তেলের জিঁব, আঁকানো কাঠে বঁদ না কাঁলে

দিয়ে খোঁজা দিচ্ছে তার অনেক বেশী! একটু পরেই ভিখারিণী ক্রান্ত শরীর শূন্য থেকে জোর করে তুলে পথের ধারে ধরে মেয়ের বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালো; দেখলে সে ঘুমিয়ে পড়েছে কিন্তু তবুও তার ক্রীণ শক্তি দিয়ে বুঠার মধ্যে ঢেপে রেখেছে কাগজের কুম-ঝুটি। ভিখারিণী মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে দেবতে লাগল—কটি রাঙ্গা চোঁট ছুটির ফাঁক দিয়ে কি মুখের হাসির ছটাই না ছুটে ছুটে বেরচ্ছে! এ মেয়েকে বুকে চেপে চুমু খাওয়ার জন্যে এমন তার ব্যগ্র বাহু ছুটি বাড়িয়েছে অমন নিজেবলী মনে পড়ে গেল "বুমিয়েছে—পথে পথে চাইবে।" কোন খানের ক্ষেত্র মনে পড়ল আবতির কটোর এক বাতাস এসে নাকের বাক্স দিয়ে গেল। আজ ছোটো ভিগবানেরই ক্রীণ না খেয়ে মরবে—দুর্ঘটনা পাণ তঁরা কেনন করে তা সহবে। মন্দিরে গেলে নিশ্চয়ই সে কিছু ভিক্ষা পাবেই! ভিখারিণী আঙুল দুখানাটি খুলে বেড়িয়ে পড়ল। আশার উল্লসে তার এক বুকম ছোটাই সে খানিকটা পুখুর করে হাল কিম্ব পর মুহুর্তেই তাকে প্রত্যেক বাড়ীর দেওয়াল আলো করে চলে গেল। মন্দিরের কাছে এসে সে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ ইপাতে লাগল।

মন্দির থেকে বহুদূরীর অম্বর পরা, গলায় সোনার স্ত্রীকাকার মালা জড়ানো, হাতে সোনার তাবিজ জড়ানো একজন ধানিককে বেরতে দেখেই ভিখারিণী তার পলা পথ রোধ করে—হাত খানা পেতে ভিক্ষা চাইবে—তিনি সে দিকে ক্রক্ষেপ না করে কদম্বের খানিকটা জল—তার গায়ে ছিটিয়ে, পাশকটে সবে পড়লেন। তবুও সে হতুলা হতুলা না। এক যুবতী অলঙ্কারে

দেখানি মুড়ে দেবতার দর্শনে এসেছিলেন—ভিখারিণী তার কাছে চাঁট গেড়ে কাতর ক্রন্দনে ভিক্ষা করল কিন্তু নিখল—সবই নিষা। গেছন থেকে কে একজন তাকে ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় ফেলে গেল। এমত বোধে নিরাশা বুদ্ধের মধ্যে জমা পড়ে তার অবশিষ্ট ক্রীণ শক্তিকে বুড়িয়ে দিল হাত দুখানা জোড় করে, মন্দিরের দিকে তেজে বললে এ কোন ধর্ম দেবতা, যাতে অস্তির প্রতি দয়া নেই, ব্যাধিতের প্রতি সমবেদনা নেই! ভিখারিণী চোখে জগতটা ঘেঁষে ঘেঁষে মনে হ'ল—আজ তার নিজে দৈহিক মরবে! মন্দির সত্যরূপ সেন দয়া পড়ে গেছে! এমত বোধে নেই, লোকের ব্যাধ লোকে বুঝতে চায় না। মন্দিরে গেলের জন্যে আসন—তাড় লাগ! হাত—কপবতী নিজেও কদম্ব দেবতা না নিজেও ক্রীণা দেখান।

ভিখারিণী মস্তিষ্ক হাত দুখানা তুলে তুলে কি এক ভীষণ চিন্তা করতে লাগল। দেখতে দেখতে ভিখারিণীর করুণা কান্দন মূগ কঠোর হয়ে উঠলো। রাস্তার লোকের হাতকে আগল লাড়িয়ে তার সংস্পর্শ পেরে নিজেদের সক্রিয় চলাত লাগল।

মন্দিরের আশে পড়ল খাবারের স্টোকার গুলো, এ হরেক তরকন খাবার স্তরে স্তরে সাজান রয়েছে। অমলোর ছটা তার কপটে লাড় সেগুলি দশককে গুল করে তুললো। ভিখারিণী কঠোর দৃষ্টিতে এ দিকে চেয়ে রইলো। সে ঠিক জানে, চামড়া এর এক ক্ষুদ্র কন্য কেউ দিবে না। এখানে অনাত্মীয় ভাবে রঞ্জিত করে ভাবলে "এক মুখে খাবার তুলে ছুট দি।" এমত ভাবতে গিয়ে তার চোখে

ভারা তখনি নয় সিদ্ধ দৃষ্টিতে ভরে গেল
মুখে স্বাভাবিক মমতার ছাপ ফুটে উঠলো !
ভিখারিণী উলরে উলতে দাকানগুলো ছাড়িয়ে
চলে গেল ।

মন্ত একখানা বাড়ী—তার দ্বারের
বাগানাব রোয়াকে একটা লোক একবাটী
ভাঁও নিয়ে কতগুলো কুকুরকে খেতে দিচ্ছে !
ভিখারিণী কুটিলো ! বে দরবান পুকুরের
সামান্য জীব কঙ্কণ ওপর এত দরদ—ভগবানের
শ্রেষ্ঠ জীব মাছের সে, নিশ্চয় তিনি তাঁর ককণার
দৃষ্টিতে তার সকল দৈব যুচিয়ে দেবেন । সে
ছুটে এসে কুকুরের ভঁও সেই ভাঁওর অংশ নিতে
একখানি ছোট ছাড়িয়ে দিলে—কিছু সেই
মৎস্যের হাড় খানো সরিয়ে নিতে পল পেল না !
যে লোকটা দাকান বিনাছিল, সে “কাকুর” করে
তাকে ভেড়ে গেল । সে কত ব্যক্তি, কত
মিনাত এই লোকটাকে করতে লাগল কিন্তু
লোকটার দরদ এক তিলও সে অধিকার
করতে পারেনা ।

ভিখারিণী স্থির করলে সে মরবে—বে
কম্বোত বীণ বেদনা বুঝতে লোকে পারে
না,—চল না । বেদনাম ভগবানের নাম—
একটা ভেক ! সে পাড়া গারই দোজাই
দিয়ে এত লোক মুখ কবছে—অরে সে—
হয়ত তাই মত আরও কত হতভাগা এমনি
কষ্ট পাচ্ছে ! কি হবে সে কম্বোত থেকে ।
বিন্দুচোর একটা আঙুল প্রবল বেগে তার
হৃদয়ে ধু ধু করে জলে উঠবে । সে উদ্ভিজ্জিত
হয়ে হাত কামড়তে লাগল—চুলের গুদী ধরে
টানতে লাগল ।

মরবার কথা ভাবতেই মনের আশ্রিতে
একখানি মুখ ভেসে উঠবে । তার কাছে সে

মুখখানি কত শান্তি, কত স্বস্তি ! ভিখা-
রিণী তেমনি করে বেদনাম ধরে রাউর দিকে
চললো ।

ভিখারিণীর মেয়েটা কত সুখি—তার
হাতের শক্ত মূঠোর মধ্যে কান্দাকা কান্দামিটী
তখনও সে চেপে ধরে জামেই মেয়েটা
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সুখ দেখতে লাগল । যেন
একটা খুঁড়খুঁড়ে বুড়ো—একডালা খেলনা
তাকে দেবার জন্তে ডাকছে । সে ছুটে গিয়ে
খেলনার ডালা থেকে কত সুখ, বাণী,
বাজনা তুলে নিলে । সে শুধি বুঝে চেপে
মাকে দেখাবার জন্তে ছুটে আসতেই দমাস
করে একটা আঁচড় খেয়ে সান সে পড়ল গেল ।

চীৎকার করে কেঁদে সে জামে উঠলো !
শিশুর মধুর স্বপ্ন ছিল যেন সেখানে বিছানায়
জেগে চোখ রগড়ে বগল সে চারদিকে চাইতে
লাগলো । কিন্তু না দেখতে পেল খেলনা ওয়ালা
বুড়োকে, না দেখতে পেল মাকে । বলিকা
প্রাণের আবেগে মা, মা, বলে চৈচিরে
উঠলো !

তৎক্ষণে ভিখারিণী উলরে উলতে ঘরের
দরজা অবধি পৌঁচতে কঙ্কার চীৎকার
হুনেই সে দমকা হাওয়ায় দরজার ঢুক-
বেয়েকে বকে চেপে “মা” হুয়েছে “মা আনার”
বলে তার মাথায় কপালে মত বুলোতে
লাগল । মেয়ে কেঁদেই কেঁদেই মাকে
তার স্বপ্ন কথা বলতে লাগল ।

এদিকে সর্বোচ্চর খান মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে
ভিখারিণীর ঘরের রাঙার গুদিকার একটা
দোকানে ঢুকলেন ! দেখান থেকে কিছু কাপড়
চোপড় কিনে অল্প একটা খাবারের দোকানে

গিরে বিলাসকারী কন্যাসমূহ। মেয়ের হাত
খরে আবার তিনি ভিখারিণীর মাতীর দিকে
চলেন। তখন হাতের কিছু রয়েছে। অতঃপর
সাত বছর মেয়ে শোভনাকে বাবার সঙ্গে
সঙ্গে বেশ চিড়ে। সর্বোত্তম বাবু ভিখারিণীর
দরজার কাছে গিয়ে জাকজলি “খরে কে
আছে—ওরুচি?”

ভিখারিণী মেয়েকে কোথা থেকে নাহির
বিছানার বসিরে দরজা খুলে আশ্চর্যভরে
সর্বোত্তম বাবুর দিকে তাকিয়ে রইল। তখন
সর্বোত্তম বাবু ঘরে ঢুকে তার হাতে একখানা
কাপড়, মেয়ের জন্য একটা জামা, ছাত্রের জন্য
বুড়ি কাপড় আর একটা টাকা দিয়ে বললেন,
“নাও বাবা—এগুলো তুলে রাখ।” তখন
ভিখারিণী বিপদের অতীত এমন একটা
জায়গায় পৌঁছেছে যে তার হাতে হচ্ছে বাকি সে
মেয়েকেই মত পত্র দেখছে। ভিখারিণী মত
খানায় ওপর মাথা রেখে দেওয়াল বেয়ে
রকমে নিজেই এতদূর খাড়া করে রেখেছিল
পাত্রটোর আর শাক হা না—সেইর বোঝা
মাথায় করে কাঁড়ে থাকে—ভিখারিণী
অবসর জাবে সেভের ওপর বসে পড়ল। সে
বসে থাকল চিড়ে খাঁক। একখানা জামা মত।
মুখ দিয়ে তার কথা বেরুছিল না—কিন্তু চোখ
দিয়ে দুটে বেরুছিল একটা বিপদের আভা।
তার দারদার অতীত এ কি করে গুলু হতে

পারে। “অথচ কেমন” করেই বা প্রত্যক্ষ
সত্যকে সে বিশ্বাস করে? ভিখারিণী কাতর
চোখের সমুদ্র চাহনি খসচ করে—অন্তরের
সব কলঙ্কটুকু উজার করে ঢেঁদে দিলে
“ওই মহাত্মার পায়।” নিঃশব্দেই সে দান
শেষ হয়ে গেল।

শোভনা দেখলে ভিখারিণীর মেয়েটা ডাগর
চোখ মেলে তার খেলনাগুলোব দিকে কেমন
চেয়ে আছে। সে ভাবলে “তার ত কত
খেলনা আছে কিন্তু খেলবার জন্তে ও মেয়েটার
একটাও খেলনা নেই। আব ওকে কিনে
দেবার ও কেউ নেই। এগুলো দিয়ে দি ওকে।
সে বাবাকে বলে আবার নয় খেলনা কিনে
নেবে।” শোভনা হাতের দাঁশী, খেলনা
সবগুলো তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে
“এই নাও!”

ভিখারিণীর মেয়েটা ছোট সেগুলি বেলে
চেপে ধরলো।

ভিখারিণী সর্বোত্তম বাবুর দিকে চেয়ে
আছে দেবতার সম্মুখে—সর্বোত্তম বাবু কল্লার
দিকে চেয়ে আছেন আনন্দে, মেয়ে গলে—আর
শিশু ৩টি চেয়ে আছে ওপর দিকে। সর্বোত্তম
বাবু শোভনাকে বুকে চেপে আনন্দে চুমু
খেলেন। ভিখারিণী মেয়ের মাথায় হাত দিয়ে
দেবতাও দেবদেবতার আনন্দ খেলা দেখতে
লাগল।

পাশ্চাত্য দর্শনে চিন্তার ধারা

[অধ্যাপক শ্রীঅনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়]

যে আলোকের ধর্ম বস্তুকে প্রকাশ করা, সেই আলোক বস্তু সহসা তীব্রভাবে নয়নপথে আসিয়া পড়ে, তখন সে বস্তুর গোপন কবে। ঐ আলোকের তীব্রতা ইন্দ্রিয়ের স্বভাববিরুদ্ধ বলিয়া এ ক্ষেত্রে উহার বস্তুত্ব ধর্মটির অতি-ব্যক্তি হইতে পারে না। যদি কোন কবিতা ইন্দ্রিয়কে ঐ তীব্র আলোক দর্শন করিতে বাধ্য করা হয়, তাহা হইলে দর্শনেন্দ্রিয়ের যে স্বাভাবিক ধর্ম তাহারও লোপ পায়। তেমনি হিন্দু সমাজের আদর্শ হানীর ভোগম্পর্শ বিরত কোনও সদব্রাহ্মণকে যদি পাশ্চাত্য সমাজের রীতি অনুসারে কেঁটাপ্যাণ্ট ও বুট পরিয়া উপাসনা, কাঁটাচামচে লইয়া টেবিলের উপর ভোজন ও নেক্‌টাই গলায় লাগাইয়া চেয়ারে উপবেশন করিতে বাধ্য করা হয়, কিংবা একজন পাশ্চাত্য সভ্যতার অভ্যস্ত চরাক্ষকে ললাটে ত্রিপুরা গন্ধে নামাবলি, অঙ্কুরাসনে উপবেশন, হবিচার ভোজন প্রভৃতি তিন্দুধর্মের কঠোর মানিবা চলিতে বাধ্য করা হয়, তাহা হইলে উভয় পক্ষেই মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গলের আশঙ্কাই অধিক। মানুষকে যদি হস্ত দ্বারা ভ্রমণ ও পদ দ্বারা গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হয়, তাহা হইলে এই হস্তপদের নিজ নিজ ধর্ম পরিবর্তনের জন্ত মাত্রের যে অমঙ্গল হয়, একটা সমাজের

ধর্ম সমাজান্তরিক ধর্ম দ্বারা বিনষ্ট হইলে, বিশ্ব মানবেরও সেই প্রকার অমঙ্গল হইবাবই সম্ভাবনা। অতএব যেমন প্রত্যেক জিনিষের একটা স্বভাব ধর্ম আছে, তেমনি প্রত্যেক সমাজ ও প্রত্যেক সভ্যতারও একটা বিশিষ্টতা আছে। এই স্বভাব ও বিশিষ্টতা আছে বলিয়াই জগৎ কণ্যামের আকর্ষণ, তাই সাধারণতঃ সেদিক দিয়া যে, যাহারা ঐ ধর্ম পরি-ভাষণ করিয়া ধর্মবস্তুর গ্রহণ করেন, তাহাদের মধ্যে এই ধর্মবস্তুর একটাও সম্ভাবনা লাভ করিতে পারেন না। ব্যক্তির সংস্করণ ব্যক্তির ধর্মের স্বরূপ হয় না; যে দ্বিতীয় সংস্করণকে তিনি গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহাও হয়, নতুন ধর্মের স্পর্শে তাহা বিনষ্ট হইয়া গিয়া উহাকে পরিহার করাই প্রেরণ। এই ধর্মবিষয়ে ভারতের বাণী—স্বধর্মো নিবৃত্তঃ শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ। এই ধর্মবিশ্বাসের আদর্শ ব্যতীত ভারতের আদর্শ একটা আদর্শ আছে সেটা হৃদয়স্থিতে দেখিতে মনে হয় ইহা জন্ত ভাবের; এটা জ্ঞানের আদর্শ, এজন্যই রাজ্যে ভাব-তের বাণী—অজ্ঞানং সর্বভূতেষু যঃ পশুতি সঃ পশুতঃ। ধর্মজীবনে চাই ব্যক্তির সংস্করণ, কিন্তু এখানে চাই ব্যক্তির বিসর্জন। জ্ঞানের রাজ্যে নৃতনের স্পর্শে পুণ্ড্রম করিত না হইয়া

বহু পুষ্টিলাভ করিয়াছে তাই সামান্যই মনে
কর যে, এই ক্ষুধার্ত হইলেই পুষ্ট্যের
বিরোধ আছে। কিন্তু আসল কথা এই যে, বিকৃত
ভাবাপন্ন নয়, এজন্য যেমত ভাষায় সাধনার
বিশেষত্ব বলিয়া বোধ হইবে। এখানে ধর্ম ও
জ্ঞান পরস্পর একইরকম। এখানে
জ্ঞানের পরিণতি হয় জ্ঞানের সম্যকতা, আর
বিসংকল্পের পূর্ণতা হয় আত্মতত্ত্ব। সেই জন্ত
ভারতের সংস্কৃতিতে আত্মতত্ত্বের জ্ঞান, তথাপি
জ্ঞানের উপাসনাকে ধর্মপন্থা পরিগ্রহ করিয়া
চলে না। এটুকুটা ইহা বোঝা যায় যে, অতীতের
বক্তব্য।

জ্ঞানের পক্ষে আমাদের জ্ঞানের প্রয়োজন
কেন হয় তাহার এককটি সত্যের সাধারণ
জ্ঞানের লক্ষণ হইতেই পাওয়া যায়। জ্ঞান-
বাহ্যের নিয়মই এই যে যেখানে সত্যিকার
ভাবে কোন জিনিষের জ্ঞান নাই, সেখানে
নতুন ও পুরাতনের মধ্যে বিরোধ নাই।
আমি জ্ঞানের পক্ষে যে সকল কাজে
ব্যক্তিগত সীমার মধ্যে বদ্ধ থাকিতে চাই না।
যে জিনিষ সত্য হইয়াই শব্দ হইয়াছে আমি
আমার রোগের ন্যায় উপলব্ধি করিয়া
যদি হইতে বলি, তাহা হইলে এই কল্পিত
গভীর মধ্যে সত্যকে প্রত্যক্ষ করি না। সেই
জন্ত যিনি জ্ঞানের উপাসক হইতাকে আপনার
কৃত গভীর জ্ঞানকে বিবেচনা করে অস্তিত্ব হইতে
হয়। তেমনই আবার আমি যদি প্রতিদিন
ব্রাহ্মমূর্তিতে শব্দ ভোগ করিয়া, গম্যমান
সম্যাকবুদ্ধি করিয়া পরে মনুষ্যকে একবার মাত্র
নিরামিষ আত্মপার জ্ঞান করি, এবং
ইহাতে যদি কোন ভাটের আশঙ্কা
অন্যকালে কখনোকার ও আত্মতত্ত্বের ভাবিয়া

প্রাতে স্নান করিবার সময় শব্দভোগ করিয়াই
বিশ্রুতিসহ চা, মধ্যাহ্নে আশিষাদি গৃহীতব্রত
জ্ঞান প্রভৃতি সভ্যজগতের রীতি অনুযায়ী
পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে তাহার
উদ্দেশ্য বড়ই সাদু ও উচ্চ হইতে না কেন,
আমার তাহার দ্বারা উপকারের অপেক্ষা অপ-
কার হইবার বেশী সম্ভাবনা। এ সকল
বিষয়ে আমার বক্তব্য ও অভ্যাস বড় পুরাতন
তাহাকে নবম জন্মে মিলিতে হইলে তাহাতে
কিছু বেশী নিগদ। কিন্তু যদি কোন শিশু
তাহার পুরাতন অভ্যাসে উপর নির্ভর করিয়া
সে তরফে দিগ্বিদ্যের হস্তান্তর নিদর্শক বলিয়া
চিন্তা করে, তাহা হইলে এক্ষেত্রে তাহার
পূর্ব অভিজ্ঞতা ও পুরাতন অভ্যাস ছাড়াই
কাব্য হইয়া উঠে। কারণ জ্ঞানভোগের
বিশেষত্ব এই যে, সেখানে যাহা পুরাতন,
তাহাকে আকাঙ্ক্ষা ধরিয়া রাখিলে চলে না;
নতুন অশিষ্ট জ্ঞান অস্তরের দাবী সর্বদাই উদ্ভ-
বিত না রাখিলে জ্ঞানের উপাসনার সকলতা
গোত করি বাব না। বর্তমান সেই এক ধর্ম-
ভিত। সত্যের স্বরূপ আমার নিকট প্রক-
টিত না হয়, ততদিন আমি যদি আমার পূর্ব
সঞ্চিত রক্তরাজি প্রয়োজন হইলে নবাগত অতি-
থির চরণে উপচোঁকন দিতে পা পারি, তবে
কেবল পূর্ব পরিচিত বস্তুর আকর্ষণে অভ্য-
গতের অর্চনা না করিয়া পারি। তাহা হইলে
আমার জ্ঞানের উপাসনা বিভ্রম মাত্র; কারণ
আমার মস্তিষ্ক পুষ্ট এখনও কাচে নাই, আদ-
র্শের জন্ত যে একনিষ্ঠতা ও ব্যাকুলতা প্রয়ো-
জনীয়, আমার মস্তিষ্ক তাহা এখনও দেখা দেয়
নাই। সত্যজ্ঞানের সিনি প্রকৃত সাধক তিনি
যেখানে বহু দেখিতে পান তাহাকেই মারা বা

সত্যের এই বিশ্বপ্রামাণিকতা যখন আমরা
ভুলিয়া যাঁই, তখন জ্ঞানের রাজ্যে নতুন
পূরাত্তনের মধ্যে বিবাদ ঘটিয়া যায়। সেই
জগৎই যখন পূর্বপশ্চিমের আলোক প্রাথমে
পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের উপর পড়িতে আরম্ভ
করিল, তখন তাঁহারা ইহাকে অপরিচিত
দেশের অবস্থা করিতে লাগিলেন। ভাবত
যে জ্ঞানের রাজ্যে কোন একটা আদম
গ্রহণ করিতে পারে, তাহা তাঁহারা স্বীকার
করিতে পারিলেন না। কিন্তু এখন তাঁহাদের
সে ভুল ভাঙ্গিয়াছে; তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে,
যে জগতে চিনি লবণ ও কুইনাইন সকলেই
শাদা, সেখানে কেবল মাত্র বর্ণকে মূলমন্ত
করিলে—জ্ঞানের অন্ধকার দূরকরা যায় না।
কেবলমাত্র সাইবলের দোহাই দিয়া কী
পাশ্চাত্যজগৎ কোম্পারিকস্, নিউটন প্রভৃতি
পণ্ডিতগণের মূর্ত্তন চিত্রাঙ্কণ করিয়া বন্ধ
করিয়া দিতে পারিতেন, তাহা হইলে আজ
যে বহুমূল্য রত্নময়, মহাসাগর জগৎকে সজ্জিত
করিয়াছে তাহা অকালেই শুকাইয়া যাইত।

[illegible]

মার্কসই একজন বালক, যখন সেই জনের
মেরিনী শব্দে "আমি" "তুমি"র ব্যবধান
হ্রস্বতর হইয়া জন্মিয়া পড়ে। এই বাক্যের
কেবলমাত্র শুধিতে পাওয়া যায়—সর্বমহীতি
উপাসীক ভবু ভবু ভবু ভবু। আমরা যেন এই
আদর্শ ভূমিতে বসিয়াছি। জাতীয় উন্নতির
প্রেরণা—আমাদের অন্তরের মাঝে এমনই
একটা মোহজাল বিস্তার করিয়াছে যে জ্ঞানের
রাজ্যেও আমরা প্রাচীর ভুলিতে আরম্ভ
করিয়াছি। দেশ কাল, সমাজ জাতি, বর্ণ
গোত্র এসকলের শৃঙ্খলে জ্ঞানের আলোক
বন্ধ থাকিতে পারে না। আমরা এই সহজ
সত্যটা ভুলিয়া বাইতেছি বলিয়াই যেন আজ
পাশ্চাত্যজগত আমাদের কানের কাছে সেই
সনাতন অর্ধবিস্তৃত শিশুটির সুরটা বারবার
বাজাইয়া মনে করাইয়া দিতেছে যে তোমরা
এই জাতীয় উদ্বোধনের দিনে তোমাদের
জাতীয় সুরটা ভুলিও না; তোমাদের যে
সুরটা আজ সমস্ত জগতের চিত্তকে আকর্ষণ
করিয়াছে, তাহার অমৃত নিখর হইতে
নিজেদের বঞ্চিত করিও না।—তাই আমার
মন হয় যে এই বিদেশীবর্জনের দিনে
পাশ্চাত্যচিন্তার আলোচনা ও পশ্চিমের
তপস্বীকে সম্মান প্রদর্শন করা ভারতসম্প্রদায়ের
পক্ষে অগৌরবের কথা নয়।

পাশ্চাত্য চিন্তার ধারা সম্বন্ধে আলোচনা
করিতে হইলে লেখানুসার পণ্ডিতগণের বিস্ময়ে
দর্শন কি, আর দার্শনিকের লক্ষণ কি,
প্রশ্নেরে কিছু বলা দরকার। এখানে প্রথমেই
একটা কথা নিবেদন করিয়া রাখি। আমরা
সকলেই জানি যে, একই সূর্য্যরশ্মি কাদ,
ফটিক, মৃত্তিকা প্রভৃতি বিভিন্ন বস্তুতে পড়িয়া

বিভিন্ন আকার ধারণ করে; ফটিকের
নিকট সূর্য্যের বে ক্রম করা পড়ে, মৃত্তিকায়
নিকট তাকি আশ্রয় করিতে পারা যায় না।
সেই প্রকার, পাশ্চাত্য দর্শনের রূপ লেখকের
চোখে যেভাবে ধরা গিয়াছে, তাহাই এখানে
বিস্তৃত হইবে, এবং অল্পভূক্তির দোষে যদি
দর্শনের স্বরূপ বিকৃত হইয়া থাকে তাহার
জন্ত লেখক কক্ষার পাত্র।—আমরা যখন
বিশ্বের রূপ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আরম্ভ
করি, তখন দেখিতে পাই যে পূর্ব হইতেই
কতকগুলি বিশ্বাস আমাদের মনে বদ্ধমূল
হইয়া আছে। এই বিশ্বাসগুলির মধ্যে
আবার কতকগুলি এমনই প্রকৃতিগত হইয়া
গিয়াছে, তাহাদের শিকড় অন্তরকরণের পরতে
পরতে এমনইভাবে জড়ইয়া আছে যে, উত্থাকে
উপড়াইতে গেলে যেন বোধ হয় যে মর্ম্মের
গ্রন্থিগুলিও ঐ সঙ্গে শিথিল হইয়া পড়িল;
মনে হয় যেন আগছান্দুলিতে গিয়া কোন এক
অন্তরতম প্রদেশের বহুদিনের সঞ্চিত রত্ন-
গুলিকেও তুলিয়া ফেলিয়া দিতেছি। যেহেতু
আমাদের বাহ্য জগতের অন্তর সম্বন্ধে বিশ্বাস।
ঐ যে গাছগুলি উন্নতশির হইয়া কত যুগ-
যুগান্তরের ঘটনার সাক্ষী স্বরূপ ঐ স্থানেই
দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, এই যে সূর্য্য অট্টালিকা
দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের
পর বৎসর একই ভাবে এইখানেই অচল ও
অকম্প থাকিয়া মানুষের সুখদুঃখের অনিত্য-
তাকে হুটাইয়া তুলিতেছে, ঐ যে পশ্চিম গগনের
মেঘের উপর নানাবর্ণের বিভিন্ন খেলা আমাদের
শাস্ত্রচিন্তে কি এক অনন্ত অসিদ্ধতার স্বপ্নময়
তরঙ্গ তুলিয়া দিতেছে—এই সকল প্রাকৃতিক
বস্তুসমূহ জটরা এই যে দুর্ভাগ্য জগত আমাদের

তাহাকে যে শিক্ষা দেয়, পরমুহুর্তে তাহাকে
কলিয়া কেলে। বতাদন শিশু জন্মের রহস্য
ভেদ না করিতে পারে, ততদিন আপনীর সুখ-
দুঃখের নিমিত্ত তাহার মাতা-পিতার উপর
নির্ভর না করিলে চলে না। কিন্তু এমন পর-
স্থাপেক্ষী হইয়া বৈশিষ্ট্য থাকা অসম্ভব।
কলের ক্রীড়নকের ফল উপায়া বিলেই সে
নির্দিষ্টভাবে কিছুক্ষণ চলিয়া থাকে, কিন্তু দম
হইলেই, সে আবার অস্ত্রের উপর নির্ভর
কবে! মানুষের কিন্তু আত্মনির্ভরতা না
থাকিলে চলে না। সেই জন্য কিয়ৎ পরিমাণে
বাধ্য হইয়া, এক বাধ্য বিদ্রোহকেও শিল্পকে
জগতের কৃত্রিম ভাঙ্গিতে হয়। দত্ত তাহার
উদ্যমকে ও দত্ত তাহার অধ্যবসায়কে। তাহার
অদম্য কৌতূহলের ফলে ঐকজ্ঞাপিকের বাচন
ক্রমশঃই খুলিতে থাকে। তখন সে জানিতে
পারে যে অগ্নির রূপ নয়ন মুদ্রক হইলেও তাহার
অগ্নিস্বভাৱে সুখ পাওয়া যায় না, যে তবর্ণ কখন
কখন সত্যি জ্বলের পথপ্রদর্শক হইলেও তাহার
স্বভাব মূল সময়েরই অনুসরণ করিলে প্রজা-
বি হইতে হয়, জগতের যে সকল বস্তু পিতা-
মাতার বাহ্যিক আবরণ দ্বারা থাকে তাহারা
স্বভাবের প্রকৃতিগতাবস্থার আশ্রয় হইতে পারে
না। এখন হইতে কোন একটা বস্তুকে
জানিতে হইলে যে আর একটামাত্র ইঞ্জিনের
তোষামোদ প্রভাবিত হইতে চায় না; এক-
জনর বাহিনী অস্ত্রের দ্বারা সংশোধিত করিয়া
হয়, একটা কণের অভিজ্ঞতাকে অস্ত্র কণের
শক্তিতে চিত্র পুট করিতে চেষ্টা করে, এবং
আপনার অভিজ্ঞতা অপরের কষ্ট পাথরে
কবিতা বেধিতে চায়। এইরূপে তাহা গভীর
মধ্য দিয়া সে নিজের জ্ঞানমন্দিরটী এমনই

ভাবে প্রস্তুত করিয়া যত যে জাহ্নব দৈনন্দিন
জীবনের কাজকর্ম উদ্ধার দ্বারা সুস্পন্দ হইতে
পারে। এই দৈনন্দিন জীবনের কাজ চালান
জ্ঞানকে আমরা সাধারণ জ্ঞান বা ব্যবহারিক
জ্ঞান বলি। এই সাধারণ জ্ঞান ক্ষুদ্র শিশুর জ্ঞানের
জ্ঞান কণভঙ্গুর নয়, ইহা এক মুহুর্তে জল-
দ্রব বৃক্কে উঠিয়া পরমুহুর্তে জলধির বাক্স
মিশাইয়া যায় না। এই সাধারণ জ্ঞানকে
আমরা সত্য বলি তাহার কারণ ইহাও এই
অবিনশ্বরতা। বহুমুহুর্তেব মতো ও ইহার মুক্তি
অক্ষর থাকে, আর বহুবাচ্য। বহু হকে অতিক্রম
কারণ ইহা নিজের একর বহুতা রাশিতে
পারে। তিন ও পাঁচের গুণ কাঁচের পনের
হয়, ইহাকে আমরা সত্য বলি তাহার
কারণ, এই বহু রাশির ও বহুক্ষণের বহুতায়
অতিক্রম করিয়া তাহাদের পদস্পর্শ মধ্যকটী
এক ও অবিনশ্বর থাকিয়া যায়। এই এক ও
নিত্যসম্বন্ধটী অক্ষরপ্রবাদের আরাধ্য বস্তু।
জ্ঞানের লক্ষ্য যদি হয় সত্য, এবং সত্যের
লক্ষণ যদি হয় একতা ও নিত্যতা, তাহা
হইলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে প্রকৃতজ্ঞান
ব্যবহারিক জ্ঞানের অনেক উপরে অবস্থিত।
সাধারণ জীবনে যেটুকু আলোক না হইলে
পথের অন্ধকার দূর হয় না, সেটুকু আলো
পাইলেই আমরা চরিতার্থ বোধ করি।
আমরা জানি যে অন্ধুর স্পর্শে যন্ত্রণা হয়,
তাহার শক্তিতে বাতাসকে প্রস্তুত হয়, এবং
তাহার উত্তাপে শীতের কষ্ট দূরীভূত হয়।
অগ্নি সম্বন্ধে এই তথ্যগুলি সংগ্রহ করিতে
পারিলেই আমরা সাধারণতঃ আর কিছুই
অনিবার্য জ্ঞান ব্যতী হই না। কিন্তু যখন
মানুষের জ্ঞানশীলতা ব্যবহারিক জীবনের

অবশ্যকগুলিকে আত্মকল্প করিয়া উঠে, যখন সে কেবলমাত্র শূন্য ভোজন করিয়া তৃপ্ত থাকিতে পারে না, তখন যে মল্লিরটী কত দিনের কত সাধনার ফলে খাড়া হইয়া উঠিয়াছে তাকে সে পুনরায় পর্যবেক্ষণ করিতে আরম্ভ করে। যে বিশ্বাসগুলি বহুকটা জীবনের শাসনে, আর কতকটা দিদিমান গায়ের মতামতের কর্তব্য বলে হইতে পারে তাহা উদ্ভূত হইয়াছে, নিজের স্বত্বাধিকার সন্ধানের সহিত সেগুলির কোন সন্দেহ আছে কি না, তাহা বিচারে নিমিত্ত একটি আশঙ্ক করিয়া উঠে। সে সময়ে মাতামহের মস্তকধারনে এক বিশুদ্ধ জ্ঞানের নিপাতা উদ্ভূত হইয়া উঠে, তখন হইতে তাহার দার্শনিক জীবন জন্মগ্রহণ করে। এখন এই যে জ্ঞানকে কেবল জ্ঞানের জগত উল্লসিত করে, আর সত্যকে কেবল সত্যের জগত শাশ্বত করে।

এই জ্ঞানের প্রাপ্তি বিশুদ্ধ স্বত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। কাজ অনেকগুলি উপাদানের দ্বারা, যে উপাদান সমূহের অভাবে আমাদের অনেকের মস্তিষ্ক ইচ্ছা করিয়া হইয়া থাকে না। কিন্তু যদি একবার এই মতামতের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, সে ক্ষেত্রে ক্রমে নিখিল-প্রাপ্তির উপর এমনও একটি আনিপাতা-বিশ্বাস করে যে এখন হইতে মনে হয় যেন জীবন-নাটকের একটি নতুন অঙ্কের আরম্ভ হইল। এখন আর জ্ঞানকে জীবনের দেয়া পাওয়ার হিসাবের সহিত খতাইয়া দেখিবার দরকার হয় না। ভগবান সত্যকে আমার বিশ্বাস কেমন হইলে সকলেই আমার প্রকৃত হিন্দু ও ব্রাহ্মণকুলধরদের বলিবেন বিশ্ব সৃষ্টি সত্যকে

কোন সত্যকে বিশ্বাস করিতে পারিলে আমার দেখিয়া কেউ কখনও বলিয়া নাসিক। কৃষ্ণ ও করিবেন না, আমার ও আমার বিশ্বাস আমার বিশ্বাস কিপ্রকার হইলে আমার পুত্র কস্তার বিবাহোৎসবের কে - বাধা হইবে না—এই প্রকার জ্ঞানের সহিত যেখানে ব্যবহারিক জীবনের সম্বন্ধ, সেখানেই সেইটুকু জানিয়াই আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারা যায় না। এখন হইতে আমাদের সত্য হইবে কেবলমাত্র একমের অধিকারী। এখন একবার এই পূর্বে বর্ণিত আনিপাতের মত চাহিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে তাহার অনেক মনের অতি দক্ষতা, এই যে কল্পনা-বাহিত পেশমাজের ইচ্ছা ভাবনা পড়িতে পারে। তাহা স্পষ্টই জানা যায় যে আমাদের "ভাঙ্গাঘড়া"র কাজ এখনও শেষ হয় নাই। যে মতো আমরা এখনও অসিদ্ধ পৌত্তলিক হইয়া কতকটা সময় ও সাধনার অর্থব্যয় করিয়াছি তাহাতে যোগসম্পদের একশতাংশের অভাব আছে। মতাব-যে আনিপাতের ১০ মাস্ক ভৌতিকতা তাহা আমাদের ব্যবহারিক জীবনের জ্ঞানে পাপোয়া পায় না বলিয়াই, দার্শনিক ইচ্ছার সামান্য অতিক্রম করিতে বাধ্য হইল। সাধারণ মানুষের দার্শনিক মনো প্রবেশ হইবে যে সাধারণতঃ মানুষ দৈনন্দিন জীবনের ক্রীড়াস। সেই জগৎ আমাদের বিশ্বাস চরিত্র ও ব্যবহারের মনো গরমিল বা অসঙ্গত থাকিলেও তাহা নিরাবরকের জগৎ মনো বাস্তব হইয়া থাকে না। কল্পেজে বিজ্ঞান, জ্ঞানে জ্ঞানকে সর্বজনীন প্রমাণ করিয়া যখন গুণে প্রমাণিত করি তখন আমার চোখের দোষা বুঝি

সম্মুখে ভাসমান হইয়াছে, ইহা এইভাবে ঠিক এই ভাবনাই সঙ্গীন থাকিবে, ইহা ইহাকে প্রত্যক্ষ করি অর্থাৎ করি। আমরা যদি আজ একত্রীকৃত হইয়া তাহাদের সম্মুখে কোন চিত্তবিশিষ্ট না করিতাম তথাপি এই বস্তুগুলির বাস্তবতার কোনই পরিবর্তন হইত না ; ইহারা আমাদের বিরুদ্ধে একটা ক্ষুদ্র নিঃশ্বাসও ত্যাগ করিবারও প্রয়োজন বোধ করিত না। এটা যেন আমাদের প্রকৃত্তিক বিশ্বাস। একটা অক্ষুরূপের মধ্যে ত্রিভুজ হইলে, তাহা যে সমকোণ হয়, ইহা শিখা। কঠোরতম জন্তু আমাদের স্কুলে যাইবার দরকার হইতে পারে, কিন্তু এই প্রকার বিশ্বাস বা জ্ঞানের জন্ত শিক্ষক মহাশয়ের রক্তচক্ষু দেখিবার কিংবা বেত্যাঘাত সহ্য করিবার দরকার মোটেই হয় না। শিক্ষিত অশিক্ষিত, হিন্দু মুসলমান, ভারতবাসী—ইংলণ্ডবাসী—সকলেই এই মতো এই সহজ সত্যগুলি যেন মজ্জা হইয়া পড়িয়াছে। যদি কেহ বলেন, এই দৃষ্টমান জগত মিথ্যা, কিংবা এ বিশাল বিশ্ব তোমারই দর্শন সাপেক্ষ, তোমার মন ব্যতীত উহার আর দাঁড়াইবার স্থান নাই, তাহা হইলে আমরা যদিও প্রকাশ্যভাবে কিছুই না বলি, তথাপি অন্তরাত্মা যেন এই অদৃশ্য তথ্যের বিরুদ্ধে বিরোধ ঘোষণা করিতে থাকে। আমরা মনে মনে চিন্তা করি, ইনি হয় পাগল, হয় দার্শনিক। আবার অল্প কতকগুলি বিশ্বাস আছে বাহ্যিক দৃষ্টির বস্তুসমূহ রক্তে রক্তে এমনভাবে মিলাইয়া যায় যে যেন আমরা সকলেই বিশ্বাস করি যে অদৃশ্য দার্শনিক শক্তি আছে, এবং বুদ্ধিজীবীর অদৃশ্যবলি নাই। আমাদের এই স্বাভাবিক বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যদি কেহ বলেন যে ঐন্দ্রিয়ালবিকার

প্রভাবে আমাদের শক্তি নষ্ট হইতে পারে, কিংবা যদি কোন বৈজ্ঞানিক বলেন যে বুদ্ধির জীবন ও মানব জীবনের মতনই স্থল ভূষণ, ও স্থান-কালীয় পূর্ণ, তাহা হইলে আমাদের মন পূর্বের ভার বিদোহ ভার ধারণ করে না। তেমনি আবার যদি কোন বৈদ্যাস্তিক ঘোষণা করেন যে, জীবাশ্ম ও পরমাণু এক, বিশ্বের স্বরূপ এক নিরাকার অনাদ্যমূল্যসোপাচার অদ্বৈত চিন্ময় আত্মাকে চিন্তা করিতে পারি, তুমি আকাশ বিশিষ্ট কনিয়াফেল ; কিংবা যদি কোন সাধারণ দার্শনিক বলেন যে, তুমি যে দর্শনেন্সিয়ের প্রমাণ শক্তিতে বিশ্বাস করিয়া ঐ সম্মুখস্থ পদার্থটিকে টেবিল বলিয়া জানিতেছ, এবং ঐ বস্তুটিকে আমফল বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছ, তোমার সেই উদ্ভিন্ন বিশ্বাসঘাতক। তোমার নয়ন দুইটা রূপের স্বাক্ষরীকৃত, সেই জন্ত ঐ টেবিলের চব্বটিপে বাস্তব টেবিল বলিয়া ভ্রম জন্মাইতেছে, এবং ঐ আমফলের রূপ ও আকার বিশিষ্ট মূপিওটাকে সত্য সত্যই আমফল বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছে! এই সকল উদ্ভিন্ন জন্ত এবার আমরা আর পূর্বের ভার পাগলের পার্শ্ববর্তী স্থানটা দার্শনিকের জন্ত নির্ধারিত না করিতেও পারি। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে স্পষ্টই প্রতীতমান হয় যে, আমরা যে সকল বিশ্বাস ও জ্ঞান লইয়া সাধারণতঃ জীবনের পথে চলা-ফেরা করি, তাহাদের সকলগুলিই যে কঠিন ছাঁচের মধ্যে পড়িয়া জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে তাহা নয়। কতকগুলি বাস্তবিকই এমনই শক্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহাদের আকার পরিবর্তন করিতে গেলে তাহারা একেবারেই চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। এখন দেখা যাক যে এই বিশ্বাসগুলির কতটুকু

রা হইল কেন, আর তাহার কারণ একবার একটা
মূর্তি লইয়া একটিও বস—আবার পর ঐ প্রাক-
ত্মিক আকারের পরিবর্তন করিবার প্রয়োজন
হইল কেন। এই মূর্তি ও পরিবর্তনের আদি কারণ
লগ্না বায় কেবলমাত্র জীবনের শাসনের
মধ্যে। আমরা যে জগতে বাস করি তাহাকে
একেবারেই অপরিচিত বা অজ্ঞাত রাখিলে
সে স্থানে মূর্তির জন্তও বাঁচিয়া থাকিতে
পারিতাম না। পাণ্ডবেরা এক বৎসরের কষ্ট
অজ্ঞাতবাস করিতে পারিয়াছিলেন তাহার
কারণ এই যে বিরাট রাজার রাজ্যে তাঁহারা
অজ্ঞাত ও অপরিচিত হইলেও সে রাজ্যটী
তাঁহাদের নিকট সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত ছিল
না। যদি বাস্তবিকই বিরাট রাজ্যের সকল
বস্তুই রহস্য কুহেলিকার আচ্ছন্ন থাকিত, যদি
সেখানকার স্বচ্ছনীবে শরীরের ক্রান্তি দূর না
করিয়া অবসাদ বন্ধ করিত, যদি আহাদের
শব্দবাহুর অল্পপাত্রে চতুর্দিকের সঠোরাষি হুহু
করিয়া জলিয়া উঠিত এবং জলপানের সঙ্গে
সঙ্গে পিপাসার জ্বলন্ত নীরসত্ব হইয়া থাকিত,
আর যদি ভীমের গদা সে রাজ্যে প্রবেশ
করিতাই নিত্য প্রকৃতি পরিবর্তন করিয়া শোলা
প্রকৃতি অবলম্বন করিত, তাহা হইলে কীচক
বধ ত দূরের কথা, পাণ্ডবগণ এই অজ্ঞাত রাজ্যের
মধ্যে অগণবর্ষের জন্তও বিশ্রাম করিতে পারি-
স্তেন না। জীবনের শাসন এমনই চর্লকা,
এমনই কঠিন। যে সকল বস্তু সমূহ আমা-
দিগকে চতুর্দিকে বেঁটন করিয়া দহিয়াছে,
তাঁহাদিগের সহিত যদি আমরা অপরিচিত
হইতে না পারিতাম, যদি ঐ উদ্ভাদের প্রকৃতি
সবকে আমরা কোন প্রকার ভবিষ্যৎ দাবী
করিতে না পারিতাম, তাহা হইলে আমাদের

ত সন্তান। পাশ্চিকই বস্তু আশিকর যেটুকু
জানালোক না থাকিলে, আমরা জীবন
পথের অন্ধকার দূর হইয়া, সেই সাধারণ
জ্ঞানের অভাবে এই অগণবর্ষে বাঁচিয়া থাকি
অসম্ভব হইত। এই যে জগতের সঠিত দূর
হাপস ইহার ধারা যদি আমরা একটু চিন্তা
করিয়া দেখি, তাহা হইলে দেখা যায় যে এই
পরিচয় একদিনে হয় না। অজাউদীনের
প্রদীপের নিকট মুহুরের আলো বিশাল অ-
লিকা প্রস্তুত সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু বাস্তব
জগতের জ্ঞানমন্দির প্রভাবে সঠিত হইতে পারে
না। জ্ঞানের বিকাশ হয় ক্রমে ক্রমে, এবং
ইহার সফলতা আসে গৃহ শিক্ষণতার মধ্য
দ্বারা। ক্রমশঃ যখন জ্ঞান অট্টালিকাটির
রচনা করে, তখন তাহাকে কতবারই গড়ান
জিনিষ তাকিয়া ফেলিতে হয়, কতই আশা—
নিরাশার ব্যতীত তাহাতে সন্তুষ্ট করিতে
হয়। জগতটী যেন তাহার নিকট একটা
প্রকাণ্ড হেঁয়ালি, এটা যেন কোন এক বাচ্-
করের চর্চত্র সম্মোহন মন্ত্রের দ্বারা প্রস্তুত ব্যত-
বর। তাহার সরল বিশ্বাস এখানকার কুহক
ভেদ করিতে একেবারেই অক্ষম। একটা বস্তু
তখনই তাহার সমুখে আসিয়া উপস্থিত হয়,
আবার পরকণ্ঠেই কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়।
হাত পাগুলি যেন নিজের শাসনের বাইরে,
তাঁহারা নড়িয়া চড়িয়া কখনও তাঁহার চপ্তি
সাধন করে, আবার কখনও অসহ্য ব্যপার সৃষ্টি
করে। কোন সময় খুঁচার চোখ তাহাদের
না করিতেই তাঁহার পরিচয়, আবার কখনও
গরিব আহারের কষ্ট না দুরাইতেই পুনঃ
আহার। এমন জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত কি
এক অত্যাশ্রয় কঠিনতার পূর্ণ। এক মুহূর্ত

কর্তব্যের কথাই বলা যায়। কিন্তু আমরা
 বিচারে সত্যপ্রিয়তার বারো করি। কিন্তু
 পরিজ্ঞান ও মনোবল নিজ হস্তেই
 রাখি, এই ইচ্ছার জন্য কোন অসামঞ্জস্য
 আছে কিনা, আর যদি থাকে তাহা হইলে
 এই বিরোধের কোনপ্রকার প্রতিকার হইতে
 পারে কি না, ইহা চিন্তা করিয়া না দেখিলেও
 জীবন নির্বাহের পক্ষে বিঘ্ন হয় না। তাৎক্ষণিক
 প্রকারে তাহা অসম্ভব। যদি অসম্ভব
 সম্ভব হয়, তাহা হইলে এই দুই প্রকারের
 মধ্যে যে সঙ্গত তাহার স্বরূপ নির্ণয় না
 করিলেও বাস্তবজীবনে কিছু যায় আসে না।
 একটি লোক আসিবে এর নেশায় বা জ্বরের
 হিকারে যে সকল চিন্তা স্পষ্ট দেখিতে পায়
 তাহা সাধারণতঃ নরম পোড়ার হয় না।
 বলিয়াই একটিকে প্রত্যক্ষান ও অপরটিকে
 ভ্রম বলা হয় কেন? এবিধে গবেষণা না
 করিলেও আমাদের আচার বিহীন কেনই
 প্রকৃত হয় না! সেইরূপ আবার সরকার
 বাহাইরের সঙ্গে সহযোগিতা বর্জন স্তম্ভসমত
 কিনা, এবিধে আমাদের মতভেদ থাকিতে
 পারে; সে বস্তুর আবার নিকট সৌন্দর্যের
 আকর্ষণ, যত্নের নগ্নতা তাহা কবিতা হইতে
 পারে; একজন তাহাকে পাপ বলিয়া
 পরিহার করেন, অন্য একজন তাহাকে অসঙ্গ-
 তব্বা বলিয়া বরণ করিতেও পারেন। এই
 সকল দৃষ্টান্ত হইতে বুঝিতে পারা যায় যে
 আমরা একই বিষয়, কিন্তু একটীর সঙ্গে
 সাধারণতঃ সংঘর্ষ উপস্থিত করে, এবং
 অন্যের বিচারে আমার মতভেদ অসঙ্গত
 থাকে। কিন্তু এই বিরোধও অসঙ্গত থাক
 না। সেইজন্যই জীবন কোন দিকই হয় না।

কিন্তু আমরা একটিকে যদি কেহ আমার
 মনোভেদে পরিণত করে তাহা হইলে কি
 যায় আসে না, কিন্তু "একটু পানির
 দেব" হইলে যদি কেহ মত আনিয়া উপস্থিত
 করেন, তাহা হইলে আমাদের মধ্যে যে পার্থক্য
 সেটা তখন হানিকর হইয়া উঠে। যে জ্ঞানের
 মধ্যে এতখানি অসম্পূর্ণতা, তাহাকে লইয়া আর
 জীবনের কাজ চলিতে পারে না। সেই প্রকার
 মতভেদ একটা অসামঞ্জস্য বা একটা সমস্যার
 সমাধান না করিলেও সাধারণ জীবনের কোন
 হানি হয় না, ততক্ষণ আমরা আর মিথ্যা
 মাথা ঘামাইবার ইচ্ছা করি না। কিন্তু যিনি
 দার্শনিক তাহার নিকট এই দ্বন্দ্ব ও বিরোধ
 বড়ই অপ্রীতিকর। সাধারণতঃ আমাদের
 বহির্জগতের দৃশ্য যেমন অশান্তিকর, তাহার
 পক্ষে অন্তর্জগতের বিরোধও তেমনি অসহনীয়।
 সলিল যদি প্রতি মুহূর্তেই মিথের প্রকৃতি পরি-
 ভ্রম করিয়া কখনও বা অনিলের এবং কখনও
 বা অনিলের ধর্মকে গ্রহণ করে, তাহা হইলে
 যেমন আমাদের জীবন দুর্বিসহ হয়, তেমনি
 জ্ঞান ও বিধাসমাজে মতভেদ বিদ্রোহের লক্ষণ
 হইতে, ততক্ষণ দার্শনিকের জীবনও কেবল
 অশান্তিকর ও যন্ত্রণাময়কই থাকে। বিরোধ ও
 মতভেদের করালমূর্তি তাহার প্রাণে সর্বদাই
 জীবিত থাকার করিতে থাকে, তাই তিনি বহু
 ইচ্ছার বহু তাড়া ও নানালোকের নানাকথার
 গভীরে অভিভ্রম করিয়া সেই এক সনাতন
 সত্যের দ্বারে পৌছিবার জন্য ব্যস্ত হন যেখানে
 বিদ্রোহের কোলাহল, ও বহুকে জীবন-মূর্তি
 পৌছিতে অক্ষম, সেখানে কেবলই অবিভ্রান্ত
 শান্তির দ্বারা আবৃত হইয়া তাহার প্রাণে কি
 এক অসামান্য স্বপ্নের কথা সিকন করে।

দার্শনিকের এই আদর্শতাই একথা বলিতে
এই ইহার সৌন্দর্য্যই চিত্রপটে অঙ্কিত করিয়া
ভাষ্যের অঙ্গনায় সরসে ঘেঁষিতে পাইয়াই
তিনি পাণ্ডুর হইয়া পড়েন। এইটাই তাঁহার
আমল পাপপানি। সেইজন্য বতরুণ অন্তরের
সকল তারুণ্য মিলিত হইয়া একটি মলিত
বকীর না ভোগে, ততরুণ তিনি কেবলই তান-
পুরার কাণ টিপিতেই থাকেন, এবং অনেকের
পক্ষেই সেটা আসে। আনন্দদায়ক হয় না। ঐ
আদর্শ বকার তুলিতে গিয়া কতকগুলি ভগ্নী
ছিড়িয়া যায়—আর কতকগুলি সাধারণ কানে
বেহুগে বাজে, তাই তাঁহার সাধারণ বস্তু
পাণ্ডুর অসম্বন্ধ প্রসঙ্গ বলিয়া প্রতীয়মান
হয়।

এইবার আমরা দর্শন ও দার্শনিকের লক্ষণ-
এক কথায় এই বলিতে পারি যে, দার্শনিক
চিন্তা এবং অধিতীর দেশ, কাল ও সংখ্যার
দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন সমাজের সমস্ত উপাসনা,
আর যিনি ঐ আদর্শের সার্থকতার জন্য জীবনের
সমগ্রদক্ষণে সমস্তই 'পরিত্যাগ' করিতে কুণ্ঠিত
হন না, তিনিই দার্শনিক।

এই আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া পশ্চিমের চিন্তা
শ্রোত কোন পথ দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে,
তাঁহার বহন আমরা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করি,
তখন সত্য হয় যেন বাস্তবিকই একটি কুদ্র
শ্রোতবৃত্তী পাশ্চাত্য দেশের একটি শ্রোত
হইতে আদ্যপ্রকাশ করিয়া এই জায় আড়াই
হাজার বৎসর বয়ঃ পুরিয়া পুরিয়া সমস্ত বিশ্বের
মধ্যে এমনই ভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে যে,
এমন আর সে কোন দেশ বা দেশেরই নাই
যাহার মধ্যে সীরাব্দ থাকিতে পারে। এই
ই তাঁহার অব্যাহত বৃত্তি, বস্তু-বস্তুই এই

বস্তুই তিনি। ইহার এই বিশ্ব বিস্তৃতির
প্রথম কারণ, অপর্যায় করিলে অসম্ভব
যে, তাঁহার মূল বাহুরে অপর্যায় কথায় নিষিদ্ধ
আছে। ইহার দ্বিতীয় কারণটো, তাঁহার
অনন্ত শাখা-প্রশাখাতে নিরন্তর হইয়া এখন সে
ভক্তরের নিখিল প্রেরণাকে স্পর্শ করিতেছে,
এবং অনন্ত নিখিল অসন্ত বীজকে অকুরিত করি-
তেছে বলিয়াই মানুষের উপর তাঁহার এক
আধিপত্য। এই অনন্তব্যবী প্রবাহ কোন এক
অপূর্ণ বস্তীর জায় তাঁহার অনন্ত অঙ্গুলি বাঁধা
যেন বিশ্ববীশার সমস্ত তারগুলিকে স্পর্শ করিয়া
ফেলিয়াছে। এবং অনন্তের অনন্ত তরীতে
অসম্পদ তুলিয়া দিয়া মানুষকে একটামান রাগি-
ণীর আলাপ করিতে আহ্বান করিতেছে।
এই কর্তব্যের উদ্যোগে বসিতে পারিয়া অনেক
কেই ভগ্নমনোরথ হইয়া পড়িতেছেন। কিন্তু
যাঁহার অন্তরকে ইহা নিজের সানন্দে নাচাইয়া
তুলিয়াছে, তাঁহার পক্ষে নিশ্চিন্ত থাকা অস-
ম্ভব; তিনিই প্রকৃত দার্শনিক।

পূর্বে আমরা প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্বে যখন
মহানতি থেলিস () বাবহারি
জীবনের দাম্যদ শৃঙ্খল হইতে জানকে ছুঁই
করিতে প্রয়াস করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার
চিন্তাশ্রোত একটি মাত্র শাখা লইয়া প্রবাহিত
হইতেছিল। তখনই পরিবর্তনশীলতা দেখিয়া
তাঁহার মনে খটকা বাধিল, তিনি নিজেকে
এর করিলেন, এই নিরন্ত পরিবর্তনশীল লগ-
নের মধ্যে কোন বস্তুটা শাখত থাকে ?
পাশ্চাত্য দেশে এই প্রথম বহুর মধ্যে একের
অবকাশ, এবং নব্বয়ের মধ্যে তবিলম্বকে
জানিয়াই দার্শনিক প্রয়াস আরম্ভ হইল। এই
সকলই প্রবাহিত হইতে গিয়া এই দার্শ-

মিষ্ট বস্তু কষ্ট বলিলেন, এবং তাহার কারণ এই যে, এই প্রকারের মধ্য দিয়া আর একটি প্রশ্ন উত্থিত হইতে লাগিল এবং এই প্রশ্ন মানবজাতির অগ্রগতির উপস্থিতিতে প্রশ্নে অবিলম্বে উত্তর দিবার উচিত। প্রশ্নটি নিম্নে প্রদত্ত। তাহার স্বরূপ কি? এই প্রশ্নটি বস্তু হইতে অনিন্দিত বস্তু হইতে কিসের কিসের? এ প্রশ্নটি বস্তু মধ্য দিয়া প্রশ্ন করা আছে কি না? কোন পথ দিয়া এই প্রশ্নের সমীপে উপস্থিত হইতে পারা যায়? এই প্রশ্নের একটি দৃষ্টান্ত পাশ্চাত্য ভাষায় পড়িয়া প্রাচীন গ্রন্থনির্ভর বস্তুবর্ণকে প্রকাশ করিতে লাগিল। আর এই বস্তু নিশ্চয়ই মধ্য দিয়া মানবের আত্মজ্ঞানের অভিব্যক্তি হইতে লাগিল। এইটাই দর্শনশাস্ত্রের সমগ্রতা ও ব্যক্তিবাদের বিশিষ্টতা। যখন একটি সমগ্রতা হইতে অন্য একটিকে সৃষ্টি হয়, এবং তাহাদের সমাধান করিতে গিয়া দার্শনিক মত বিভক্ত হইয়া পড়ে, তখন এই বিভক্তির প্রকৃত কারণ-মানবের ধর্মগোষ্ঠালি, কিংবা শিক্ষা-বৈচিত্র্যের মধ্যে পাওয়া যায় না। এখানে প্রশ্নের মধ্য দিয়া মানব নিজেকে চিনিতে শেখে, এবং নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি তখনই হয় যখন তাহার অন্তরে বিভিন্ন দিক বিভিন্ন প্রকারের দাবী আনিতে উপস্থিত করে। এতদনন্তর কতকটা আত্মসমীক্ষার দ্বারা মত। তার দ্বারা সে আত্মসমীক্ষা উপাসনা করে, তার দ্বারা সে আত্মসমীক্ষা করে এবং বলিয়া বরণ করেন। জ্ঞান একের মধ্যে নিজের পার্থক্যতা বুঝিয়া তোলা, কিন্তু তবুই হই না হইলে চরিতার্থ হইতে পারে না। বস্তু দেখিয়া করে যে,

বস্তু তখনই সৃষ্টি হইতে পারে যখন সে "আপনার" বলিয়া কিছুই রাখে না। সে যখন তার আত্মসমীক্ষার মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিলীন করিয়া দিতে পারে, যখন তাই মধ্য কোমলই পারদান আর থাকে না— তখনই সাময়িক চরম উৎকর্ষ। কিন্তু তবুই বলে যে একের সমগ্র মনপ্রাণ আত্মসমীক্ষা মনে করিয়াও এই আত্মনিবেদনের আনন্দটুকুও অস্বস্তি করিবার জন্য হইবে মধ্য অন্তঃ একটি মনসপঙ্খের দাবী দান লাগিলে চলে না। এই ভাবে আত্মবৈব বিভিন্ন দিকের বিভিন্ন প্রশ্নোচ্চারণ যখন অন্তঃকরণ দিয়া হইয়া পড়ে তখনই দর্শনশাস্ত্র বিভক্ত হইয়া যায়। যখন প্রশ্ন ও রোম-দেশের দিক কেবল জ্ঞানের আদর্শকে সমুদ্রে রাখিয়া সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়া পড়িতে লাগিল, তখন তার প্রোতধ্বনিতে অস্বস্তির আব একটি প্রশ্নে মুগ্ধ হইয়া উঠিল। এই নতুন প্রশ্নের নতুন কাহিনীর অভিব্যক্তি হইল, খ্রীষ্টান ধর্মের দাবীকরণ মধ্য। এইবার অন্তরেব সঙ্গে অন্তরেব তুলন বস্তু দাবী হইল। কেহ বলিলেন যে কেবল জ্ঞান ও চিন্তাশক্তির দ্বারা সত্যকে দূর অসম্ভব, কারণ যে মনুষ্য নিজ হৃদয়ের ফলে অসীম হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহার বুদ্ধি ও চিন্তা সমীক্ষার স্পর্শে বিকারগ্রস্ত, সুতরাং সত্যের বাস্তব পৌছিতে হইলে তার পক্ষে চাই বিশ্বাস, চাই প্রমাণ। আবার কেহ বলিলেন যে জ্ঞানের আলো না থাকিলে অন্ধবিশ্বাসের ভয়াবহ হইতে পারে না, সুতরাং জ্ঞান ও চিন্তাকে দূর দূরে সত্যকে দূরিত করা একেবারেই

অসম্ভব। যখন পশ্চিম গগন এই যুদ্ধপ্রসূত
খুলিকায় ঢাইয়া আসিতে ছিল, যখন এক
অস্ত্রের বিরোধের ফলে বাহুজগতে জানক
জানে যুদ্ধপাত হইতে লাগিল, তখন কতক-
গুলি ধর্মযাজক প্রমান করিয়া দেখাইতে
লাগিলেন যে এই আত্মরক্ষিতিক যুদ্ধের যে
ভিত্তি তাহা আমাদের অপোলকল্পিত মায়।
যে যুদ্ধের বিখ্যাস ও শত্রুর দাব
পাইতে চেষ্টা করেন, জ্ঞানী সেই যুদ্ধকেই
চেষ্টা ও তর্কবিভর্কধাবা পরিবার চেষ্টা করেন।
সুতরাং যে সত্য যেটো, আরিষ্টটল প্রভৃতি
চিন্তাবিরগণে চিন্তাদর্শনে প্রতিবক্ষিত হইয়া-
ছিল গীষ্টানন্দমণ্ডলিক সেই চিন্তার উপরেই
দাঁড়িয়া আছে। ইউরোপের মধ্যযুগের
দার্শনিকগণ অস্ত্রের এই বিরোধ মিটাইতেই
বাস্তব পার্থক্য। তখনই আবার ইঞ্জিয় ও
অধ্যবসায় বিকল্প ফলে দর্শনশাস্ত্রের
সমস্তাগুলি জটিলতর হইয়া পড়ে। যে চিন্তা
আমর, স্পষ্টরূপে ইঞ্জিয় সমস্ত দাবা জানিতে
পারি, তাহাকে কামরা হস্তদ্বারা স্পর্শ করি,
নয়ন দ্বারা দর্শন করি তাহাকেই সাধারণতঃ
সত্য বস্তু বলিয়া থাকি। ইন্দ্রিয়গত জ্ঞান
ব্যতীত আর যে কোনপ্রকার নিশ্চিন্তাযুক্ত
জ্ঞান হইতে পারে, এবং ঐশ্বরিকরাজ্য ব্যতীত
অন্য কোথাও যে সংলগ্নতা হইতে পারে,
তাহা আমরা বিশ্বাস করিতেই পারি না।
সেই জন্য ইঞ্জিয়যোক্তা করে "আমার সীমানা
অতিক্রম করিলেই মাছের চিন্তা কেবল
আকাশকুসুম ও কবির কল্পনা মাত্র। অস্ত্রের
এই ইন্দ্রিয়মুখী মাঝের প্রতিনিধিকে পাশ্চাত্য
জগতে বৈজ্ঞানিক আখ্যা দেয়। বৈজ্ঞানিক
বলেন যে চিন্তাকে অপটুতা ও সন্দেহ

কোরামা হইতে মুক্ত করিতে পারে, একমাত্র
ইঞ্জিয়ের দ্বারা। তাহার নিকট ইন্দ্রিয়াতীত
বস্তু তাহাই বাহা ইঞ্জিয় এখনও প্রকাশ
করিতে পারে নাই, কিন্তু ভাই বলিয়া এমন
কোন সত্য তিনি স্বীকার করিতে পারেন
না—যাহা ইঞ্জিয়েব নিকট ধরা পড়ে না।
সেইজন্য যখন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের শক্তিতে
কত শত অজানা বস্তু ইঞ্জিয়ের কাছে প্রকাশ
হইয়া পড়িল, তখন বৈজ্ঞানিক এই নতুন
আবিষ্কারের উদ্গাদনার চাহকাব করিয়া বলিয়া
উঠিলেন—আমি সমস্ত আকাশ তবদীক্ষণ দিয়া
তম জ্ঞান করিয়া বলিয়া দেখিলাম, কিন্তু
কোথাও স্বর্গ নামে কোন বস্তুকে দেখিতে
পাইলাম না। অতএব স্বর্গ মাতৃবের কল্পনার
রাজ্য ব্যতীত অন্য কোনও পার্থক্য পাবে
না। কিন্তু যাহার জাহাজের প্রবেশ ও
অন্যের আদর্শকে ইঞ্জিয়ের উপর স্থান দেন,
তাহারা এই প্রতিনিধিক প্রত্য তাহা যাব
একটা ইন্দ্রিয়াতীত জগতের সহ্য মানিতে চাহা
হন। তাহারা বলেন যে, ইঞ্জিয় কোন বাহ্যিক
আচরণ মাত্র নহইয়া থাকে, ইঞ্জিয়েব বহুভাষাকে
অতিক্রম করিয়া সনাতন সত্যকে ধ্বংসে হইলে,
চাই আর একটা শক্তি। রূপ, রস, গন্ধ
প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গত জ্ঞানরূপ বস্তুর জ্ঞান যেমন
কারণ একগুলি বস্তু কিন্তু বস্তু এক। তেমন
আবার ইঞ্জিয় আমাদের যে জ্ঞান দেয়, তাহাকে
বিরোধের বিনাশ হইয়া, সেই জন্য এক বস্তু-
গত উদ্ভাপকে নানা ভাবে নানা ভাবে জন্ম-
দেব করে। সুতরাং বস্তুর প্রকৃত স্বরূপের
সম্বন্ধ পক্ষিত কেবলমাত্র ইঞ্জিয় দ্বারা হইতে
পারে না। যে সকল বস্তুকে আমরা সাধারণতঃ
ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মনে করি, তাহারিগণ এবং পরি-

উপস্থাপিত হইলও একটি ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু
সম্মানিত হয়; আর ঐ ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু
না মানিলে, বৈজ্ঞানিক যে আরম্ভকে এই
প্রাথমিক প্রকৃত অন্বেষণ করিতেছেন সে
আরম্ভ উদ্ভাৎ অস্বাভাবিকই করিতে পারিত
না। সুতরাং এই ইন্দ্রিয় প্রকৃত অগত ব্যতীত
আর একটি রাজ্য আছে, যেখানে চাইতে আইসে
বস্তুর প্রেরণা, নীতির কঠোর শাসন, ও কর্ত-
ব্যের আধার। মানুষের যে অমৃত পিপাসা,
আবিশের চরণে আবহলিদান, নিবাসের মাঝে
শান্তিহবার আশা, এগুলি ঐ ইন্দ্রিয়াতীত
অন্তরতম লগ্নের প্রেরণার ফল। এই অমৃত
পাশ্চাত্য চিন্তার বিজ্ঞানের সঙ্গে পর বিজ্ঞানের
একটা চিরকালের বিরোধ ঘোষণার।

এই সকল অস্তরের বিরুদ্ধ প্রেরণার সমস্ত
ও সমাধানের নৈচ্ছিক্য ক্রমে এতই বাড়িয়া
গেল যে, একজন মানুষের পক্ষে নিখিল সমস্তার
আলোচনা অসম্ভব হইয়া উঠিল। তখন জ্ঞানের
রাজ্যে একটা প্রধাম বিভাজন করিবার প্রয়োজন
হইল। একটা বিজ্ঞানের রাজ্য আর একটা
দর্শনের রাজ্য। ভাটি এখন আর প্রত্যেক
চিন্তার প্রবাহকে দার্শনিক চিন্তা বলা হয় আর
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকে বহু অংশে বিভক্ত করিয়া
তাহাকে বহুদিক দিয়া জানিতে চেষ্টা করেন।
এই এক একটা দৃষ্টিকে পরিষ্কারভাবে জানিতে
গিয়া এক একটা বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়। সুতরাং
একটা বিজ্ঞান বিচার সমস্ত দিকের একটা সার
দৃষ্টিকে জিজ্ঞাস করিতে চেষ্টা করে। এবং
এইভাবে কসমের শাস্ত্র, পরমাণুবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান
একটা সার বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়। এই
সার বিজ্ঞানের সৃষ্টি আর সমস্ত দার্শনিকের
কর্তব্য আর প্রকরণস্বরূপ এই বিজ্ঞানস্বরূপ

জিজ্ঞাসার একে বাহ্যকে একই দিকের প্রতিষ্ঠিত
বজ্রার থাকে তাহার সব দেখাইয়া দেওয়া।
দার্শনিক কেবল বৈজ্ঞানিককে মনে করাইয়া
দেন যে, এই সকল বিশ্বাসিত জিন জিন হইতের
বিশ্বটা কিন্তু এক, সুতরাং একটা বিজ্ঞানের
সত্যও অমৃত একটা বিজ্ঞানের সত্যের মধ্যে
কোন অসামঞ্জস্য বা বিরোধ থাকিলে বিশ্বের
প্রকৃতি কিছুতেই জানা নাহবে না। আবার
বৈজ্ঞানিক যে সকল সত্য আবিষ্কার করেন,
তাহারা কতকগুলি স্বীকৃত। সত্যের উপর নির্ভর
করিয়া থাকে; এইগুলিকে তাহার চরম সত্য
বলিয়া মানিয়া লইতে বাধ্য হন। সুতরাং
বৈজ্ঞানিকের বিশ্লেষণ জিন্মা বহন সকল চরম
সত্যে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন আর তাহার
বিশ্লেষণ করিবার দরকার বিবেচনা করেন না।
তখন বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টে চাইতে দার্শনিক ঐ
সত্যগুলিকে লইয়াই সত্য বলিয়া বুঝিতে চেষ্টা
করেন। সুতরাং বিজ্ঞানের কথা যেখানে শেষ
হয়, দর্শনের কাজ সেখানে আরম্ভ হয়। যেটা
হইতে একটা ফল খসিয়া পড়িল, অমনই মহা-
মতি নির্ভরনে নিজেই জিজ্ঞাসা করিলেন, কখন
হইতে কখন হুতু হুতু হইয়া মাটিতে পড়িয়া
আল কি? বুঝিতে বুঝিতে এদের উত্তর
আসিল এই যে, পৃথিবীর কয়কণ বসিয়া
একটা আকর্ষণ শক্তি আছে, তাহার প্রভাবে
অল্পসল্প সবুকে এ নিম্নের কেন্দ্রের প্রতি-
বৃৎ প্রাণিয়া গানে। তাহাজাহি বন আবার
এর বসিল, পৃথিবীর এ শক্তি আর কি?
বহু প্রবৃত্তি ও পরিবেশের ফলে হুতু হুতু
পড়িল সে। এই যে, সবকিছুই তাহার
একটা নিম্ন আকর্ষণ শক্তির ফল। তাহাজাহি
বহু প্রবৃত্তি ও পরিবেশের ফলে হুতু হুতু

একটা আকর্ষণী শক্তি আছে, এই শক্তির বলে
সকল বস্তুই পরস্পরকে সর্বদাই আকর্ষণ
করে। কিন্তু এই শক্তি যতদূর দূর ও পরি-
মিতের ভিতরে অবস্থানে কম বেশী হয় বলিয়া
সর্বদাই ইহা সমানভাবে প্রকাশ পায় না।
এই কারণেই বিশ্বনির্মিতের দ্বারা নিউটন গ্রহ
উপগ্রহের আকর্ষণে পরিভ্রমণ, তাহাদের নিজ নিজ
কক্ষ অবচলিত ভাবে পরিভ্রমণ প্রভৃতি অনেক
জটিল সমস্যার উদ্ভব মিলেন। ক্রমে আমরা
এই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ জিন্সটার একটু
মনোযোগ করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি যে
নিউটন কতকগুলি সত্যকে মানিয়া লইতে
পাঠাইয়াছেন। এবং তাহার বস্তুবিশ্লেষণ
সকল স্থানে আসিয়া সহসা ধাক্কা গিয়াছে।
তিনি মানিয়া লইয়াছেন যে জগতের প্রত্যেক
বস্তুই একটা কারণ আছে, ভাঙজগতের
সকল বস্তুই কতকগুলি সত্যের দ্বারা নিরঙ্কিত
এবং সেই সত্যগুলি আবহমান কাল হইতে
একই ভাবে জগতের কার্য করিয়া আসিতেছে
ত্যাগি। দার্শনিকের চিত্ত কিন্তু জগৎ
সম্বন্ধে এই দুই জানিয়াই সন্তুষ্ট হয় না। তিনি
প্রশ্ন করেন—কারণ বস্তুটি কি? এই কারণ
কার্যের অবিচ্ছিন্ন সন্ধি আসে কোথা হইতে?
জড়ের প্রকৃত স্বরূপ কি? তাহার সঙ্গে
চৈতন্তের কি সন্ধি? ইত্যাদি। যে সকল
চরম সত্যকে বিজ্ঞান বিজ্ঞের ভিত্তিক্রমে
ব্যবহার করে, বাহার উপরে বিজ্ঞানের সকল
সফলতা নির্ভর করে, সেইগুলিই দর্শনের
আয়োজ্য বিষয়। আর এই ভিত্তি যদি দুট না হয়,
তাহা হইলে বৈজ্ঞানিকের বহু শতাব্দীর সাধনা
একটা অঘাতে নিক্ষেপ হইয়া যায়। এই
নিম্নলিখিত একটা উদ্ভাস সাক্ষী আধুনিক

দর্শনশাস্ত্র। ঐজ্ঞানিক জীবনের সম্বন্ধে যে
সত্যকে মানিয়া লইয়া আসিয়াছিল, জ্যামিতিক
অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাকে জীবন প্রয়োজন
আইনস্টাইন নামক একজন জ্ঞানতাপন
ইউজিনের চরম সত্যকে আর সত্য বলিতে
চান না। ইহার বলে কিছু জ্যামিতিক
সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইতে চলিয়াছে।
ত্রিকোণের তিনকোণ ১৮০ ডিগ্রী বলিলে আর
চলিবে না দুইটা সমান্তরাল সরলরেখা কখনও
মিলিতে পারে না বলিলে এখন ভুল বলা
হইবে।

দার্শনিক এই সকল বৈজ্ঞানিক সত্যগুলি
কেবল মাত্র মানিয়া লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন
কেন তাহা আমরা মোটামুটি পূর্বেই দেখি-
য়াছি। তিনি সর্বদাই একটা আদর্শকে খুঁজিয়া
কেঁটেন। এই আদর্শটি আমাদের জীবনে সাধা-
রণ জানে, যে চুক অভিব্যক্ত হয়, বৈজ্ঞা-
নিকজ্ঞানে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী প্রকাশ
পায়। কিন্তু বিজ্ঞান ও জগতকে সম্পূর্ণ ভাবে
চিত্রে প্রতিকলিত করিতে পারেনা। এই আদর্শটি
জিজ্ঞাসু অস্ত্রঃকরণের চরমপরিচুতি। আর এই
পরিচুতি আসিতে পারে তখনই, যখন সেই
সত্যকে জানিতে পারা যায়, যাহা দেশ
কাল বা উপাসকভেদে বিভিন্ন হয় না, যাহা
সকল পরিবর্তনের মাঝে অবিনশ্বর ও বহু-
ভাবার মধ্যে এক থাকে। আমরা ব্যবহা-
রিকজীবনে যখন কোন একটা বস্তুকে
জানিতে বাত হই, বৈজ্ঞানিক যখন সেই
বস্তুকে আরও বিশিষ্টভাবে জানিতে চেষ্টা
করেন এবং দার্শনিক যখন এই বস্তুকে
বুঝিতে চেষ্টা বিজ্ঞানের পদ্ধতিতে অতিক্রম
করেন, তখন একই কারণে সর্বদাই এক

আমরা কেবল উহার অভিব্যক্তি করিতে করিতে বৈজ্ঞানিক এই মত্যাভিপ্রায় নীত বল
পরিবার অনুযায়ী সাধারণজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক যে সমস্ত জড়জগৎ কেবল কঠোরতম অসম্মতি
জ্ঞানের ও দার্শনিক জ্ঞানের পরস্পর হইতে পৃথক হয়। এই প্রবন্ধ পাঠের সময় যদি সহসা
একটা বন্ধুকের আওয়াজ শুনিয়া আমরা
দর হইতে বাহির হইয়া দেখি যে অসহযোগ-
নীতি দলন করিবার জন্য একদল গোড়া
সৈন্য আমাদের দিক নীচে একদল স্বেচ্ছা-
সেবকের উপর গুলি ঢালাইবার উত্তোষ
করিতেছে, তাহা হইলে আমরা অনেকই
আত্মনিঃসৃত রক্তে এই শাস্ত্রাংশসনকে
অকাটা সত্য ভাবিয়া এখান হইতে দূরে
নাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ি। ইহার
কারণ এই যে বন্ধুকের গুলি ও আমাদের
প্রাণ এই দুইটির মধ্যে কি সম্বন্ধ তাহা
আমরা জানি। এখানে বন্ধুক হইতে গুলি
নিষ্কাশনের আওয়াজ ও বেহাগ রাগিণীর
সুরের মধ্যে কি পার্থক্য, তাহা জীবন রক্ষার
জন্য জানা দরকার। বৈজ্ঞানিক কিন্তু শব্দ
সম্বন্ধে এইটুকু জানিয়া তৃপ্ত হন না। তিনি
দেখেন যে, যে বন্ধুকের শব্দ এখন শোনা
গেল সেই বন্ধুক আবার যে ঘর হইতে
বাহ্য নিষ্কাশিত করা হইয়াছে সে ঘরের ভিতর
আওয়াজ করিলে তাহা বাহির হইতে শোনা
যায় না। এই প্রকার শব্দ বিয়ক গড়-
মিল বা বিকৃত জ্ঞানকে অপ্রমাণিত করিতে
গিয়া তিনি বলিতে বাধ্য হন যে শব্দ বলিয়া
কোন বস্তু বহিষ্কৃত হয় না। গুলির এক-
বার স্থান অনেক মতো। বাহ্যজগৎ হইতে
বাহ্যতত্ত্বের কোন পর্যন্ত জ্ঞানতত্ত্ব করে,
সেই আত্মতত্ত্ব বলে মস্তিষ্কে পৌঁছিয়া শব্দ
জ্ঞান উৎপন্ন করে। এই ভাবে বস্তুবিবেচনা

যে সমস্ত জড়জগৎ কেবল কঠোরতম অসম্মতি
অবিনশ্বর, জড়গণমাণ্ড ও তাহাদের হইবার
নৃত্য জিহ্ন আর কিছুই নয়। ইহা বহিঃক
বেশ বুদ্ধিজে পারা যায় যে, আমাদের
দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ জ্ঞানের যে সকল
গড়মিল ও বিরোধ থাকে সেইগুলিকে মই
করিয়া জ্ঞানের রাজ্যে একতা স্থাপন করিতে
গিয়া বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। সুতরাং
সাধারণ জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান পার্থক্য
এই যে জ্ঞানের যেটুকু একতা ও সাম্যতা
ব্যবহারিক জীবনের জন্য প্রয়োজন, বিজ্ঞান
সেইটুকুতে সন্তুষ্ট হন না। সে জন্য বৈজ্ঞানিক-
জ্ঞানে ঐ আদর্শটি আরও পরিকারভাবে
ফুটিয়া উঠে। দার্শনিক কিন্তু এখানেও
আদর্শজ্ঞানের সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি দেখিতে
পান না। তিনি চান অস্ত্রের নিখিল ধারা-
য়ের আভ্যন্তরিক বিনাশ, ও জিজ্ঞাস্য অন্তঃ-
করণের পূর্ণ পরিতৃপ্তি। তাই পাশ্চাত্যের
দার্শনিক চিন্তার ইতিহাসে দেখা যায় যে,
বৈজ্ঞানিক যখনই মস্তিষ্কের অন্তঃকরণের
একটা প্রদেশে শান্তি স্থাপন করিতে গিয়া
অন্য একটা প্রদেশে অশান্তির সূচনা করি-
য়াছেন, দার্শনিক তখনই সকল বিজ্ঞানের
চরম শান্তি কেমন করিয়া হইতে পারে তাহা
নির্ণয় করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু
মানুষের অস্ত্রের দাবী অনন্ত, অসীম, সুতরাং
তাহার অসন্তোষের পূর্ণ পরিতৃপ্তির একটা
আদর্শ নাই। সুতরাং কোন কোন দার্শনিক
এখন বলেন যে ঐ আদর্শকে বলিষ্ঠ জ্ঞান
বস্তুতঃ ধরিবে না পারে, তবুও দার্শনিকের
আক্ষেপের কারণ নাই, কারণ দার্শনিক

চিন্তার মহত্ব এই আদর্শের মহত্ব ও পৌরুষের
মহত্ব, একই আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত
হইতে পারিলেই দার্শনিক জীবনের চরম
সার্থকতা হইল। তাহারাই এখন ভবিষ্যতের

সম্মানের ভাষায় বলেন—

আমি মুক্তি চাই না হরি,
কেবল আসিদ শাইব টরণ দেবিব এই
ভিক্ষা করি ॥

আমার চীন যাত্রা

(পূর্বাহ্নবৃত্তি)

[শ্রীকেশবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়]

সঙ্গীদের 'ভূগা' বলিয়া বিন্দায় দিয়া, একটু
ইতস্ততঃ এমন করিতে করিতে সমুদ্র কিনে
উপস্থিত হইবার ইচ্ছা করিয়া। সরকারী
আপস, বাস্ক, পুস, সর্বত্রই পাঞ্জাবী শব্দ
প্রবলী দেখিলাম। প্রত্যেক চেম্বারেও
শিখেরাই পাহারা দিচ্ছে। এত জনের সাক্ষত
কথা কাহারা জ্ঞানলান, পাহারা হংকং আদ-
কারের সঙ্গে সঙ্গে আসনে আসিয়াছে, এবং
ফনশঃ প্রী পুত্রও আসিয়াছে। এতাবৎ বিশদ
সম্মানের সহিত ইংরাজ গাছাছুর ২৫০০ টাকা
হইতে আরম্ভ করিয়া, পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে
২৫০০০০, এমন কি তাহা অপেক্ষা অধিক
বেতন দিয়াও তাহাদের রাখিয়াছেন। হংকং এর
শিখ সৈন্য, ইংরাজ সরকারের একটি স্পর্কার
সামগ্রী। এরূপ অনির্বাচিত অসীম সন্মদের
ও বলিষ্ঠ পুরুষদের সমাবেশে সম্পূর্ণ রেজিমেন্ট
ও পুলিশ গঠন করা সহজ সাধ্য নহে। ইহাদের
পরিচ্ছদাদিও অস্ফর ও সম্মানসূচক। রাজ-
পাথের স্থানে স্থানে, ইংরাজ বোন এক একটা

সজীব স্তম্ভ প্রত্যক্ষরূপে শোভা পাইতেছে।
জটিল শিখ সৈন্যদের সহিত আলাপ
হল; সৈন্যকটি বলিল—“আমাদের এতাবৎ
যা একটু কল ও সম্মানে ছিল, চীন অভিযান
কালে স্বরূপ হইয়া আসিয়া, তাহাকে আবার
দিল। ইতি পূর্বে যা অক্ষয় কোন ভারত-
দৈত্ব আসে নাই,—আমরাই সর্বত্রই আসি-
য়াছি, এবং এই রূপে কর, ও সরকার বাহা-
তের হকুম পালন বাধ্য।—সে সন্ত সন্মান
ও আদর পাইয়াছি। এখন দেখিতেছি হিন্দু-
স্থান নিরয় হইয়াছে; আজ কি না সন্ত সন্ত
ভারত সন্ত, হংকংকে অর্জপথে ফেলিয়া, স্তম্ভ
উত্তর চীনে ১০১২ টাকা বেতনে প্রাণ দিতে
চলিয়াছে। আর কি সত্যকার বাহাদুর আম-
দের এই উচ্চ বেতন, প্রতি দিন বৎসরে
৩৪ শত মুদ্রা ইন্দা, এবং দেশে বাইবার জু-
তিন মান্দ করিয়া প্রতি ও পাতক দিয়া। পৌর
কারকে ও পাতক দিয়া, ইংরাজ সৈন্য
সহিত প্রাণ দিতে পথ্যারে ও বাবদার রাখা

হুটরাছে। আর কি কানবা, তাহা আশা করিতে পারি। ই-নাদি মোকটির প্রত্যেক কথার ও শব্দ ও অভিমান প্রকাশপাইতেছিল। শেষ ক্রমশঃ মনস্তত্ত্ব হঠাৎ হইয়া দেহিকা, কথা সংকল্প করিবার ক্ষমতা বাক্যম-অন্যমনের উপর এতটা ভর পাইতেছে কেন? পরে - সন্ধ্যার আদান-প্রদান সন্ধ্যা শেষ করিয়া বসিয়া লইলাম।

দেখিলাম, হংকংয়ের ওহরে বিস্তার বোঝাই কক্ষের লোক, সিদ্ধেশ্বরাসী, ও পাঞ্জাবী, গৃহস্থা বাগিচা করিয়া থাকেন। কলিকাতাও বোম্বাইনগরীর বিভ্রম বিভ্রমণ বেন, মধ্যস্থে সমুদ্র ও গঙ্গাতে পর্য্যটকের চাপে জড়নের হইয়া এক ভগ্ন মন্দিরের মধ্যে আশ্রয় লওয়াছে। আজকের মুনিধানার দোকানও খুলিয়াছে; বাকি, বেসন, পাণ্ডুর, পাকোড়, বাগানত চানাকচুর - সবই বন্ধমান।

আমার উপর যেন শাসিতহেছে, বিকল্পে দীর্ঘদিনের আর অবসর নাই। কিন্তু একটা পার্থক্যের উল্লেখ করা যাক। কোন কসমেও একটা আগ্রহের হঠাৎ পড়িয়া পড়িয়া ন। পরের পর পরে ফলের বাজার দিম্বারা পুরিয়া পুরিয়া বড়ই লাগিয়া বোধ হইতেছিল, এবং অনেক হইয়া উঠিয়াছিল। এত কোনদিন কখনও দীর্ঘকালের শীতল বায়ু আসে নতুন চাপের বোধ করিলাম। বিবিধ কুখ্য ও মানা নেপথ্য স্বপ্নী পুষ্পের কদম্বী, মাগী, মেঘনা, হোতা, বেড়, কুমারীমন্ড, পাখা, অরুণ, জাম্বু, পদ্ম, কলকাতার রতন দেখিলে, সেই ক্ষণকালের মধ্যে, পূর্ণাঙ্গতা হইলেন। আর চিত্র করিয়া দিতে, এক দিনাদের বিলাসিতার আদর্শটা পূর্ণাঙ্গ হইল। ইহা না। শীতের জম্বু, বান্দি

পরিবাদের আনন্দময়ী করিয়া যথার আবেশ আনিয়া গতিভঙ্গ করিতেছে। বসন্তই - পথটি যেন বসন্তহাওয়া জাগিয়া উলিয়াছে। কিন্তু এক! একটি বিলাস পাখির সমস্ত সৌন্দর্য্যটাকে দান করিয়া দিয়াছে। বিক্রেতা-গুলি অন্ধ-বোরিও মন্তক - পাঞ্জামা পরা প্রকম মামুষ! হাঙ্গারের জ্বল ককণ চোখে এই প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের ভীরু পড়িয়া, কমলীর গায় বেন নিষ্ঠুর আঘাত করা চাইয়াছে। ও-পারে বঙ্গদেশে - এরূপ বেহুলা বাবু নাই; এত কি তবে চানাদের "বাসকাসী"। জাম্বু কোন দিনই কচিগ্রস্ত নাই, অতএব এই, দৃষ্টি আমায় পানও বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। কাবল বাগানগুলি হঠাৎ যে সব গল্প শোনা দিচ্ছে, তাহাতে প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক নাগিনীর হালকে গিয়া চৌকতন, এখনে চৌকলে মামদের হাতে পড়িতে হইত। "বিলাসিতা" ইহা মালিনী না থাকিলে রায় গুণাকরের "রাহ" কেঁতলা বান দিবে। "বকলী" কখন ছিল, কখনও হাতের ফুল ফুলিয়া, বাহ্য হইল। কখনও, ইহা মাগল, মুক্কা, স্বপ্নকে আশ্রয় করিয়াই শোভন কর।

তাহার পাছাচড়ির শীষ দেশে চাইয়া দেখি সবটাই গাঢ় কুয়াশাক্ষর। সেখানে বড় বড় সৌখীন স্নাতকেরা "নাংলো" পিঞ্জিরা বান করেন, ও শীতল বায়ু সেদান করেন। আমার আগ্রহের শোবক-পর্য্য সন্ধ্যার বড় ভাবনা হইল, পাঞ্জাটা পুষ্ট ভোগ করিতে হইবে। পাঞ্জার উচ্চস্থানে অধিকার, তাহাবা ১০দিনই উঠে থাকেন; আমি নীচ কাওয়ার সন্ধ্যা কচরা অধিকার করিতে করিতে এক

বারে সমুদ্র চারে জাতিগত হইলাম। তখন শুড়ি শুড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে, জাপানের জাহাজ হইতেছে, তরঙ্গেরও উদ্ভিগ্ন সুব;—বাটেও নৌকার ভিড় নাই। তুমিলান নৌকার মালি কেয়া, নৌকাগুলি নিরাপদ স্থানে লইয়া গিয়াছে। কেবল বাহাদের শুড়ি চড়াইবার শুড়ি এখনও সংগ্রহ হয় নাই, তাহারাই পাড়ি মাঝিয়া বেড়াইতেছে। এমন মাদারের অবজ্ঞাওয়ায় এক শ্রেণীর মাদ—আমাদের বিশদকে উপায় স্বরূপ ধারণা নিজেরা বাড়িয়া উঠিতে থাকে ও ক্ষুধি লাভ করে, সেটুকু ইহাদের মধ্যে প্রকল্পন এখনও আছে মাহারা এই জগৎপাণ্ডুলিকে প্রকল্পন উপাধি বলিয়াই গ্রহণ করে।

মাহা শুড়ি,—নৌকার প্রাচ্যায় দাঁড়াইয়া আছি, চাঁদ মধ্যে প্রাকটি, আনন্দের সজ্জারী মাজাজীসঙ্গী আসিয়া শুড়িলেন। তাহার প্রাপ্ত হইয়া, একখানি নৌকা মালিকের সহিত এর কসাকসি আরম্ভ করিয়া দিলেন। মাহা তা' প্রথমঃ নৌকা ডাউন হইয়া নারাজ,— পরে চতুর্থ পাহা চানচান। তাহাদের ডাউনগতিক লক্ষ্য কবিয়া এবং বড় আসন্ন বুঝিয়া আমি মাঝির কথায় সংকল্পঃ সংকল্প হইয়া, নৌকার উঠিল পড়িলাম, কারণ আন হস্তস্তঃ করিলে কাছাজে পৌঁছিতে উপায় থাকিবে না,—এদিকে বেশও অবসান। বুঝিলাম মাজাজীসঙ্গী আমার এই স্থায়ী প্রিয়া বিশেষ বিরক্ত হইলেন। আমি তাহাদের ডাকিয়া লইলাম,—নৌকা পুলক, এক অতিক্রান্ত তরঙ্গ ও তুফান অতিক্রম করিয়া আমাদের কাছাজে তুলিয়া দিল।

কাছাজের মাঝারা বলিল,—

আমরা তখন আসিয়া পৌঁছিতেছেন, বড়ই লক্ষ হইয়াছে। কাছাজে বেন টাইফুনঃ The phone আমারা পড়িয়া বাইতেছে। কিছুই বুঝিলাম না, সেটি "টাইফুন" কথাটার যেকোন ধীষ ও ছুঁচোলে উচ্চারণ কাকি টেকিল বা বিমিল, তাহাতেই যুব চুন হইয়া গেল। সাইক্লোন, টরনেডো প্রভৃতি ভয় ছিল, কিন্তু টাইফুন একটি বেন তাহাদের অপেক্ষা শুভানে মের ভাপ ও ভীতিপ্রদ বলিয়া কোথ হইল। তবে, বনরে বাধা জাহাজ, বহু বলিলেই হয়। মাদ আমাদের সঙ্গে আসিয়া প্রত্যয় টাইফুন দেখিবার সাগরী বড়ই আশঙ্ক। কিন্তু নিজে কলে থাকিলেও আন প্রাপ্তব সঙ্গীদের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিলাম, এবং উপরেও ডেকে গিয়া তাহাদের প্রাণ্যবর্তন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। বহু উল্লসিত বৃষ্টি, বায়ু, বিজ্ঞান, তরঙ্গ, একরে মিলিয়া প্রবল হইতে লাগিল, ততই আমাদেব এর তর্ক্য পালের স্বদেশী সঙ্গীদের জন্য চিন্তাও উদ্ভগ বাড়িতে লাগিল। ক্রমে লক্ষ, সিমবোট, নিরাপদ স্থানে আমাদের লাইল। বড় বড় জাহাজ ও সিনার পাল শুটাইয়া, মাহারা নামাইল, এবং উপরেও (Cannon) লিট তুলিয়া ফেলিল, চারিদিকে নঙ্গর পড়িল। রাজ্য নগরী ব্যক্তিরা গেল, হুয়ার্ড (Steward) আসিয়া বলিলেন—"আপনারা হুজতে যার্মিন কেন থাকেন না?" আমি তখন তাঁহাকে সকল কথা তুলিয়া বলিলাম। তিনি তিনি ভীত হইলেন, শুধিলেন "এক এই জগৎপাণ্ড তায় নূতন লোক, অপরিচিত হান।" আমি এই বিষয় চিন্তা নাহেবকে রিপোর্ট করা উচিত, তিনি শুধুকানে বোক পাড়াতে পারেন।

কিছু বড় আঁচ করকো।" এইবার আমি
বিশেষ চিন্তিত হইলাম; হ'এক নির্দিষ্ট পরা-
মর্শের মত চিন্তা সহস্রবকে রিপোর্ট করাই
কিছু করিলাম। কিন্তু এই সময় সেই বড় বড়ির
কথা সচি অফিসার ভেত্ন করিয়া একটি
আঙ্গোক আমাদের অভিক্ষেপে অঙ্গের হইতে
বেখিয়া উঠার্ত বলিলেন—“এটা কি আসে
কথা বাক্য।” দেখিতে দেখিতে একখানি
মুখ লক্ষ আমাদের আত্মজের পার্শ্বে আসিয়া
সুস্থিল, এবং তখনই হইতে আমার বহু
প্রতীক্ষিত সঙ্গীরা ভিজি বিড়ালগুলির মত
অভি কষ্টে সিঁড়ি ও নড়ির সাহায্যে আত্মজের
কোণেই হইলেন। আমি যেন বাঁচিলাম,
ইয়ার্ড বলিয়া উঠিলেন Thank God
(ঈশ্বরকে ধন্যবাদ)।

বোসজা বলিলেন—“কিছু আর বলবেন
না, আপনার কথা না শুনে—পঁয়াজ পরকার
হই হয়েছে। খাড়া ও৪ বঁটা এই বড় বড়িতে
কাজীনা ভিজি; সকল রকম চেষ্টা পেয়েও
একজন নোকো যোগাড় হ'ল না; শেষে
একজন সাহেবকে ধরে পেরু হইবী
খাইয়ে তারির স্থাপনিসে একখানা লক্ষ—
(হাঁড়ির বদলে দেয়)।—পাঁওরা গেল,
তাই রক্ষা। তারপর কককে হুটি গির্গি
অর্থাৎ কনুকে তিরিশটি টাকা, আফে-
লেনারী দিয়ে,—এই বসিমা হাত বৈতন্যটুক
পার হয়ে আসছি। মনে রাখবেন—পথ
পরতের আর নিকি পরমাটিও পকেটে নেই।
এখন লক্ষ্যের বসে—গরম গরম এক কাপ
ক'রে জা ভিজি আঁচ বাক্য।” ইয়ার্ড কাতের
কথাটা শুনি কুখিয়া বসিয়াছিলেন, তিনি
সহস্রবকে বলিলেন,—“আমি একটা নিকি হই

যে,—এই অবস্থায় এক কাপ ক'রে বলিয়া
ক'বু”—আমি সব সঙ্গী সরাসরি পার
ত'রেই হ'কটলি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি,—বার
বড়টা লক্ষ্যের চলে যাবেন। বলেন শু এই
সঙ্গে ডিনারও পাঠিয়ে দি।” “সেই ভাল”
বলিয়া তাঁহাকে বিদায় লিলাম,—কারণ তখন
১০টা বাজিয়া গিয়াছে।

সঙ্গীদের অবস্থা দেখিয়া বাস্তবিকই কষ্ট
হইতেছিল, যেন—দুবো-আসানী! সকলে
কাপড় ছাড়িলেন,—সঙ্গে সঙ্গে চাও আসিয়া
পৌছিল; জমে ডিনার,—আজকেবারে জামাই
যজ্ঞ। কখন বিকুট, কখন চপের সঙ্গে চা চশিতে
লাগিল; পাঁচুর উৎসাহে খাড়ু বো হুঁটারখান।
চপ পকেটে ফেলিল। আমি বলিলাম “বোসজা
মশাও এত কষ্ট আর ভর পাবার কারণ কি
ছিল? এ সব ত' হোটেল প্রধান দেখ,—
একটা হোটলে রাতটা কাটালেই হ'ও।”
মজুমদার ভায়া বলিলেন—“সে-পোবাকে
পাঁদাড়েও হান পেতাই না।” বুলিলাম—
পোবাকটার জন্ত পশাভাণ্ড ও লক্ষ্য সকলেরি
কথা সিদ্ধাছে। বোসজা বলিলেন—
সেটা ঠিক বটে কিন্তু প্রত্নাষেই আত্মজ
যে ছেড়ে বাবে “সেটাও ত' ভুলিনি;
—চাকরী বড় চিজ,—ওটা আমাদের
“প্যানামা”—পেট আর পাওনাদার, এ
দুয়েরই ভার বহন করে। দুই ওপর—এই
বীশান্তরে ছেড়ে গেলে, কি হাজারি হালই হ'ত।”
আমি বলিলাম—“রাজপুত্র রও ন'ক, হরোবল্লীর
গর্ভেও জন্মাবনি, আর এমন কোন পাপও
করেননি যাতে বীশান্তর হয়।” তিনি উত্তর
করিলেন—“ও কথা বলবেন না কিনে যে
পাপ হই তা ছেড়ে বসতে পারে না; এই এখন

গৃহীতকে তার নমের বত অম্বার নেওয়া হয়
নি। বকুনদার—“এই ধরন—কুলী হুটে অপর
১০৭০এর এক ইকি ওপরে—মুড়িরে কামানো
কর নি।”—ইত্যাদি হাত কোকুরে মজলিস
জমিয়া উঠিল। মকুনদার তার তখন—আবার
একাকী প্রত্যাবর্তনের পলাটা। জ্বনিতে চাহি-
লেন;—মতলবটা,—বাহাতে আরো কিছুকণ
এই আনন্দ মজলিসটা চলে। সকলে উৎ-
সাহের সঞ্চিত অনুমোদন করায় অগত্যা আমি
সম্মত হইয়া ব্রূক করিলাম। ক্রমে পুন্ন বিপনীর
বর্ণনা শেষ করিয়া, বখন তাহার বিলম্ব কর
অংশ সম্বন্ধে, অর্থাৎ বিক্রেতাদের সম্বন্ধে,
আমার অভিমত ব্যক্ত করিলাম, এক মকুনদার
ভায়া ভিন্ন তাহাতে আর কাহারো সহায়কুতি
পাইলাম না। সকলেই এক বাক্যে বলিলেন
—“তাতে, দোষ কি, এ আপনার অজ্ঞার
কথা,—এ সম্বন্ধে আবার মেয়ে পুরুষ কি ?—
কুল নিয়েই কথা। ধরুন—একটা মোহর,—
তা সেটা জ্বালোকের হাত থেকেই পান, আর
পুরুষের হাত হতেই পান,—মূল্য এক-ই।
বাজারে তার উত্তর বিশেষ আছে কি ?”
বলিলাম—“তাই ত’,—তোমরাও যে সে এক
ইউনিভারসিটির এম, এ, তা জানতুম না।
কিন্তু সর্ব-জন্মেও যে তোমাদের এই প্রত্যাক
সত্যটা বুঝতে পারে না—এই আশ্চর্য।”
গুলিয়া সকলে সাগ্রেহে—“সে আবার কি।”
বলিয়া কথাটা শুনিবার জন্য সজীয়া
কিৎ করিয়া বলিলেন।—হার একদিন

মাগা শুনিবার জন্য সজীয়া কতনা অগ্রেহ
কিন্তু একজন কামিয়ারসে—আর
তাহাই—“অবান্তর” ঘেরে আনয়িত হইতে
পারে তাহারা লিখিতে শকা যোগ্যকরিতা
সজীয়াসে কামিয়ার স্যামাটা এই—কোন
পুত্র-পুত্রপু পন্নিবৃত্ত সবকুল বাবুর ২২ বছর
বয়সে পত্নীবিয়োগ হয়। সেই দিন হ’তে তিনি
বহির্কামিতেই ভরস্বর করেন তিনি সে কালের
শিক্ষিত ও নৌমিল লোক ছিহেন। পিতার কষ্ট
না হয় বা সেবার কোনরূপ আতাব না হয়—
উপযুক্ত পুত্রের সাধামত তা ব্যবহার কন দিলে
আর বামপার অন্তরঙ্গ বন্ধদের পরামর্শ নিয়ে,—
কিনজন চাকর ও একটি সাজীয়া বাবন নিযুক্ত
ক’রে নিশ্চিত হ’ল। কারণ—উপযুক্ত ছেলেরা
থাকতে বাপের যে বিবাহের আর আবস্তকই
হ’তে পারে না, অবাচিত হ’লেও—সকলেই
ইসারা-কাজিতে সবজজ বাবকে এই সহজ কামটি
জানিয়ে দিলে। তিনিও সকলের সকল কথার
ছেটি একটি ‘হ’ ভিন্ন অন্য বিরুদ্ধি করলেন
না।

সমস্ত দিন পরে, সেই বিশেষ পরিচিত
শুটির ষাটিনি খেটে, সবজজবাবু বখন কোথা
গাড়ী ক’রে বাড়ীর কটকে ঢুকলেন,—তার
নকরে প’ড়ল—তিনিটি অপরিচিত শুভাগোছের
খোঁটা মুক্তি। সেখাই তার সুখে বিরুদ্ধি তার
অবস্থি হুটে উঠল। তিনি নাটকের পা-
বিত্তেই, সেই ভিন্ন মুক্তি—পিঠের শিরীষের
দেখিয়ে সেলাম করলে। তিনি সেদিনে

১০. “আমার চানবাড়ী”—এখন কাহিনী পর্বাণে পড়িলেও ইহাকে ‘বৈঠকী’ এবং ‘কলি’ সম্বন্ধে, কারণ
এ ‘বাইজার’ নিজের পতিশক্তি বরত আর—আমাদের motionlessই অংশ; অর্থাৎ—কি কালক কলিহুনে যে
আমাদের পীর হাছাঙ্গী দিমঙলা কামিয়ারসে—ইহাও সেই কামিয়ার আধিক্য দেখে—কামিয়ার বরত—কামিয়ার
অংশবস্তু।

সব সময় গিয়ে বৈঠকখানার চুকলেন।
সন্ধ্যার সৌর্য অস্তার ঘুরে ব'সল। গিরে দেখেন
তিন সূঁচি গিরে মাঝে থাকিবে। কিছু বলবার
আসার না দিবেই একসম ভুলে বসল
সে। — একসম বাতাস আরম্ভ করে গিরে,
ততীয়াটি প্রাণের মত সুস্বাদু ভাতায়ে কলকল
গড়গড়ার বসিরে গিরে ভাতায়ে বসে—
“গিরিগিরে গিরিগিরি।”

সন্ধ্যা এইটুকু মস্তিষ্ক আরম্ভে, ততিন
ঘেন নিজে বসে। — অসহায় অবস্থায় পড়ে
গেলেন; আসে সর্বদার জলে উঠল। জিজ্ঞাসা
করলেন—“তোমরা কে?”

সে বাতাস করছিল—সে প্রাণ হ'লি কথ্য,
বার্বার চুল, গালপাটা লাড়ি—ইয়া বোহু, বর্ণ মসর
হাতের জলের উপর রূপার কবজ, কোমরে
গোটি, আঙুলে আঙ্গুরি পাথর বসান রূপার
আঘটি; গলায় একছড়া প্রবালের মালা।
সে রাজবাড়ি আঙুরে বলল—“তজ বাতাস
কাজের নামটি আছে “সুচকুলা” হাম সব কাম
করিয়াছে—পাঁও দাবানা, তেল লাগানা,
কাপড় কুচানা। সবজজ বাবু—আচ্ছা, বাস।
(তামাকবারের প্রতি)—তোমার কিছু শুনি।

সে ব্যক্তি—সেই তোয়ান, খাতো খোঁচা
খোঁচা চুল, ছাঁটা গোল, গোল চকু, কিটু
কিটু কাপড়, এক কানে মাকড়ি, পদাঙ্ক
তামার তামা কড়ি, ঘুশি মুতার ইকি তিনেক
কাম একটা গোল মলক গলায় কলচে। সে
বলল—“একসম—একটি গুলচরণ ডাঁকদারকে
কিছু শিখিয়ে, বিজ্ঞান করিয়েছে, শান
লগিয়েছে, ইককিয়েছে—

সে কাম—একটি গুলচরণ ডাঁকদারকে
কিছু শিখিয়ে, বিজ্ঞান করিয়েছে, শান
লগিয়েছে, ইককিয়েছে—

সবজজ বাবু—(ততীর প্রতি)—তুমিও কিছু
গোনাও—

এইর ছ'চোলা ছাঁচের গড়ন, কম। রা
কটা চকু, দাকি লোক বজি, মুখে বসন্তের
দাগ, পরিধানে হলুদে ছোবান কাপড়, একহাতে
রূপার বালা, অপর হাতে সাদা গাথা রূপার
মাহলী।

ইনি হেসে বলেন—“হামরা নামটি
চমোকালা জাজ। লামি পারিলা সাজেবের
সৌন্দর্য—।

সবজজ বাবু সব্বর বলেন—আচ্ছা বাস;
তোমের কে এখানে কাম করতে বলেছে?”

সকলেই বলে—“বড় বাবু বাহাল
করিয়াছে; রক্তের কাম দেখে খুশী হবেন,—
কুছড়া কোটো থাকবে না।”

সবজজ বাবু প্রথমে ভাল কথা, পরে
সন্ধ্যাে তাদের বিদের হতে বলেন; কিন্তু তারা
বাড়ী ছাড়লে না; বলে—“খুশী না করকে
যাবে না।”

কিছুক্ষণ পরে এক উড়ে বামন জনাবাবর
নিরে উপস্থিত হ'ল। সবজজ বাবু একলাসের
পড়া চুড়া বালা intact অবস্থাতেই সেহ
আরাম চৌকিতে অসাড় হয়ে পড়েছিলেন।
বরে লোক ঢুকতেই, তাঁর হ'স হ'ল,
বলেন—“কে?”

বামন ঠাকুর—“প্রভু মিটার লউটি,—অধিন
পকাইছে।”

সবজজ বাবু—তোমার নাম কি?
বামন ঠাকুর উত্তর;

সবজজ বাবু—বোম, সেগা, আঙ্গুরি
খাব না।

নূতনের দাবী

“সৌটানা” ও “শুজা”

[অধ্যাপক শ্রীমুরেদুনাথ ভট্টাচার্য—এম এ]

গত পৌষ মাসের “অর্চনা”য় প্রফেঃ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হাবিবুর রাহী মহাশয় “কথাসাহিত্যে নবযুগ” নামক একটি ছটি উপদেশ প্রবন্ধ লিপিব্যাজেন। বঙ্গমচন্দ্র, ববীন্দ্রনাথ ও মাক্স জায়েল প্রভেদ দেখা হইতে উদ্ধৃতি করিয়া দেখাইয়াছেন যে বঙ্গমাস সাহিত্যে “নবযুগ” বা উপন্যাসের উপাদান বড় বেশী। উপন্যাস যে সাহিত্যের প্রয়োজনীয় একথা তিনি স্বীকার করেন তবে কোন উপদেশ দেয়া তাহাদের মধ্যে স্থানান্তরিত হইতে পারে না। উপন্যাসের বর্ণনামূলক কাহিনী ও বর্ণনা, যাবন সাধারণ পাঠক উপন্যাস পড়িয়া অনেক পান, কবিতা বা প্রবন্ধ নাতিশ্রীতিহীনতার প্রত্যেক ছাড়া লাগে না। সেইজন্য শাস্ত্রী মহাশয়ের অন্তিমোক্ষ যে “এক কামিনার হৃদয় দেখায় হারা পাশ কবিতা হইবে। মাক্সের চিত্র বর্ণনামূলক বক্তব্যের মধ্যে এক বাক্য কাটান উচিত নহে। উপন্যাস সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া মানুষের মনকে নিবৃত্ত করিতে হইলে, “কল্যাণ চিত্রা” দ্বারা জীবনকে উন্নত করিতে হইবে। সাহিত্য দেখা নহে। উপন্যাসিকের প্রত্যেক জর দায়িত্ব এই কথাটি তিনি বেন মনে রাখেন। (সাহিত্য ইংরেজি)। তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে অনেকগুলি সারি কথা বসিয়াছেন। তিনি একটা বড় কথা বসিয়া

ছেন, “এই সকল লোকদিগের মধ্যে অনেকেরই শক্তি আছে স্বীকার করি। কিন্তু সেই শক্তিই কাল হইয়াছে।” “অর্চনা”-“মুরেশ” “কিরণময়ী” ও পঞ্চাঙ্গকের “আলা”র চিত্র দেখিয়া কুণ্ড হইবে হতাশা পাইতাবান সাহিত্যিকের হাতে আসি। এই সব চিত্রই নিন্দনীয় কাব্য-এগুলি রমণীয়। মানুষের মনকে যে চিত্র পাশে পাশে টানিয়া লয়, পাঠকে পুণ্যকণ্ঠে দেখাইয়া দেয় সে চিত্র প্রেম হইলেও ক্ষেপণ নহে।

তাহ বলিয়া উপন্যাস যে নাতিশাস্ত্রের নিয়ম মানিয়া চলিলে এবং সর্বত্রই পাপীর রূপিত এবং মানুষের উন্নতি দেখাইবে ইহা সন্দেহ নহে। এই “কল্যাণ চিত্রা”, “কল্যাণ চিত্রা” দ্বারা মনকে দৃষ্টির জর হয় না এ কথা সকলেই জানেন তবে কথাসাহিত্যে বড় প্রাণে লাগে। মাক্সের চিত্র আবার “বর্ণনামূলক বক্তব্য” ইত্যাদি ঘটনার দ্বারা মানুষের জীবন বর্ণনা এবং যখন এক জন চিত্র চিত্র হইয়া যায় তখন সাধারণ পাঠক হৃদয়ে যদি মানুষের সর্বত্র জর হয়ে যায় পুণ্য বীণে তত অবচার কেন?

Maxwell Gray ৩য়: কল্যাণ চিত্র
Emile Zola ৩য়: কল্যাণ চিত্র
দেখা যায়। মাক্সের ও মাক্সের চিত্র
পাশে বসিয়াছেন এবং এখন Puritana

(উচিতবিশেষ) লেখক তাঁহার নামে নাসিকা কুঞ্চিত করেন। তাঁহাদের বিশ্বাস Zola কেবল gutter মুখ্যই কারবার করেন। কিন্তু যিনি তাঁহার লেখা পড়িয়াছেন তিনি কখনই স্বীকার করিবেন না যে Zola হীনতার প্রচারক। তাঁর চিত্রে কেবল দেখিতে পাই ইউরোপীয় সমাজ কি ভীষণ আয়ের-গিরির যুদ্ধের উপর গিয়া দাড়াইয়াছে। শক্তিমান লেখক নীনের হৃদয়ে কাথিত হইয়া প্যারী মগরীর পুতি গন্ধনর নরকে নানিরা জনসাধারণের চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তিনি কঠোর বস্তৃতান্ত্রিক (Realist) হিউগোর জায় ভাবতান্ত্রিক (Idealist) নহেন। সেইজন্য Jean Valjean আঁকিবার চেষ্টাও কখনও করেন নাই।

আমরা এই প্রসঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ ইটালিয়ন সমালোচক Signor Edmonds de Amicis এর কথা উদ্ধৃত করিব।

Zola is one of the most moral novelists of France, and it is really astonishing how any one can doubt it. He makes us note the stench, not the perfume of Vice; his rude figures are those of the anatomical table, which inspire no immoral thought whatever; there is not one of his books, not even the crudest in the language that does not rouse in the Soul—pure, firm and immutable either repugnance or scorn for the base passion which he treats. He never says to hideous women 'Infamous creatures' and 'Dear one'. Brutally, pitilessly, and without hypocrisy he exposes

vice and holds it up to ridicule, standing so far away from it himself that he does not grze a with his garments. Forced by his hand it is vice itself that shouts the injunction "Detest me and pass by." Zola কখনও পাপকে attractive (বরণীয়) করিয়া দেখান নাই। কাজেই শিক্ষিত, মাজ্জিতকৃতি পাঠক পাঠিকাও তাঁহাকে আদর করেন। কিন্তু Reynolds কখনও আদর পাইতে পারেন না কারণ তিনি কেবল মানবের কামনায়া ইচ্ছানই বোঝাইয়াছেন এবং মানব সমাজের বেকিছুই ভাব নহ, কেবল কালো ইচ্ছাই প্রতিপন্ন করিতে গিয়া নিজের উপরই কালি ঢালিয়াছেন। আশা করি চিনিম্নই তাঁর পুস্তকখানি একটা Standing nuisance বা আবর্জনা বলিয়াই পরিগণিত হইবে। যদিও তিনি aristocrat বা বড় দলের লীলাই চিত্রিত করিয়াছেন কিন্তু তাহা সভ্য সমাজে স্থান পাইবে না।

Zola ও Reynolds-এর প্রসঙ্গ তুলান এই জন্য যে দুর্নীতি কথাটা প্রয়োগ করিবার সময় যেন মনে রাখি কথাটার অর্থ কি? স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন "পাপকে ঘৃণা কর, কিন্তু পাপী কক্ষণের পাত্র।" কিন্তু পাপীকে (concrete) পাপ (abstract) হইতে আলাদা করিয়া সেপা বড় কঠিন। সেইজন্য আমরা অনেক সময় ভুল করি।

শাস্ত্রী মহাশয় উদাহরণ স্বরূপ 'দোঁটানা' ও 'ভডাক' উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, "একজন সামান্য পটুয়ার সঙ্গে বিধবা ক্রীড়লীর প্রেম বা পুঙ্খান পুঙ্খের বৃদ্ধের প্রতি ক্রোধী পরকীরার আসক্তি, রসের স্রুতি না করিয়া রসাতাকেরই পরিপূতি করে।"

বহুদিন। কামিনী সে “নিরুত্তর মহাকলা”
 নামে অঙ্গসংরক্ষণ করে রাখে, হিন্দু সমাজ তাকে
 সম্মান করিতে পারে না। তার ছই পথ—
 প্রেমের চরম মার্গ বা নিরুত্তর পথ। বেচারী
 মৃত্যুই বরণ করিল। এমন সময় তাহার
 বাড়ীর প্রতিমা গড়িবার পট্টা রামুনের ছেলে
 গোবর্দ্ধন তাহাকে বাজাইল। সে কিছু বটে,
 কিন্তু বোধ হয় মৃতি পড়ে নাই। তাবিল,
 “নিরুত্তর এই লজ্জা ঢাকিবার একমাত্র আবরণ
 কি কালো অন্ধকার মৃত্যুর ঘবনিকা?
 তু তু’টা প্রাণী একসঙ্গে পৃথিবীর শোভা সশ্রী
 আনন্দে ব্যক্তি হইয়া মৃত্যুর পথে চলিয়া
 যাইবে?” গোবর্দ্ধন হৈমবতীকে লজ্জা হইতে
 বাঁচাইবার জন্য তাহাকে বিবাহ করিল।
 এখানে শিক্ষিত হিন্দু বলিবেন ‘ছি, ছি, কাজটা
 ভাল হয় নাই, কোন Woman’s Refuge
 Home এ পাঠাইয়া দিলেই হইত। গোবর্দ্ধন
 বোধ হয় এ সংবাদ পায় নাই। এবং শাস্ত্রী
 মহাশয় বোধ হয় স্বীকার করিবেন না যে উপ-
 জ্ঞানসিদ্ধি গল্প করমাবসী হয়। এ ত আর ভীম-
 নাগের সন্দেহ নয়। এ বিষয়ে শ্রদ্ধার প্রথম
 স্তম্ভের লিখিত ‘করমাবসী গল্প’ পড়িলে ‘জান-
 জন শলাকরা’ আমাদের চক্ষু উন্মীলিত হইতে
 পারে। হৈমবতীকে লইয়া সে সংসার পাতিল।
 এ বড় মজার সংসার। হৈমবতী তরলকে
 পূজা করে, তাহার হৈলচিত্র সাননে রাখিয়া
 ধ্যান করে, তরলের শিশু তার কুকুর ধন।
 গোবর্দ্ধন কাছের পিজ্জা মুখে, পাশের মাত্র, হৈম-
 বতীর দ্বারী নড়ে, ককব্বা বাজ। একপয় সুরতা
 আর কোন উপভোগ্য কোন নাই এবং এমন
 কখনো সমাধানও দেখি নাই। বড় বড় দণ্ডি
 তরল সুরতা ইহার কাছে বড়।

গোবর্দ্ধনের অঙ্কুরে বীরে বীরে প্রজা ও
 জরুণা প্রেমে পরিণত হইল। কিন্তু এই
 ক্ষণতে Platonic Love চলিত কথা। মাতীর
 মাতুল হাওয়া হইলে আর মাতুল থাকে না,
 বোধ হয় ভূত হয়। গোবর্দ্ধন ‘দোটার’
 পড়িল—দেবীর সামনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে
 হৈমবতীকে বিবাহ করিলেও তাহার সঙ্গে
 কোন দৈহিক সম্বন্ধ রাখিবে না। অর্থাৎ, প্রাণ
 তার কতবিকৃত, প্ররুতি প্রবলা। কেবল সংযম
 তাহাকে প্রবৃত্তি মার্গ হইতে রক্ষা করিতে
 লাগিল। চতুর্থ তরলের আবির্ভাব। এবার
 তরল প্রকৃত তরলরূপেই দেখা দিল। হৈম-
 বতীর একমুখী প্রেমে আঘাত লাগিল, কল্প-
 লোকের দেবতা আজ পশুরূপে দেখা দিল—এত
 বড়ের প্রেম ধূলিসাৎ হইল। হৈমবতী বৃষ্টি
 তরলের সহিত তুলনার গোবর্দ্ধন দেবতা; এই
 খানে হৈমবতী দোটার পড়িল—এ যে সত্যই
 ‘দোলাচল চিত্তবৃত্তি,’ হৈমবতী আশ্রয়কার এক-
 মাত্র উপায় আশ্রয়তার দ্বারা এ সমস্যার সমা-
 ধান করিল।

চাকবাবু Robert Browning-এর একটা
 লাইন উদ্ধৃত করিয়াছেন, “How mad, how
 sad, how bad it was”—গোবর্দ্ধন mad
 হৈমবতী sad আর তরল bad; সমাজের চোখে
 গোবর্দ্ধন যে পাগল তাহাতে আর সন্দেহ আছে?
 দ্বীচিও এমনি পাগল ছিলেন, নহিলে পরো-
 পকারে জীবন দেন, Christ ও পাগল, নহিলে
 ক্রুশে তাঁর অপমৃত্যু ঘটত না।

বংশলোচন তাত্ত্বিক, তবে সমাজের
 ব্যক্তি। মা তাঁকে সব ছাড়েই দিয়াছেন,
 কিন্তু মাতের বেতন দ্রুতকে তিনি মরা
 বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। এ একবারে

মামলায় দায়ী। তারপর যখন বিদ্বান কল্যাণ হৈম-
বতীর সহিত বিবাহ বন্ধন করিল, তিনি
তাহাকে গানি দিয়া তাড়হিয়া গিলেন, কারণ
তিনি সামাজিক জীব, সংস্কারের দাস। কিন্তু
কল্যাণ যখন গোবর্দ্ধনের সঙ্গে গৃহত্যাগ করিল,
সমাজ তাঁহাকে বেদনা দিল, তিনি নিজেকে
নিজের মধ্যে সংহত করিলেন, তাঁর সব দুঃখ
বেদনা যাকে নিবেদন করিলেন। কিন্তু যে
দিন শুনিলেন হৈমবতীকে গোবর্দ্ধন বিবাহ
করিতেছে.....তিনি বিবাহের খোতুক
ও জগদম্বার আশীর্বাদী পাঠাইয়া দিলেন।
ইহা দ্বারা “যিনি সব পাপ সহেন ও সব
অপরাধ ক্ষমা করেন সেই দেবতার নামে এই
বিবাহে সম্মতি জানাইলেন।” এখানেও সেই
Law of Nature সম্বন্ধে বাৎসল্য
Law of Divinity বা সমাজ শাসনকে
পর্যবেক্ষণ করিল। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় বংশ-
লোচনকে এই জন্ত পাগল বলিয়াছেন। তবে
কথাটা ঠিক—‘বামাক্ষেপা’ ও পাগল, রাম-
প্রসাদ ও পাগল। হৃৎখের বিষয় এমন পাগল
বড় বেশী দেখিতে পাই না।

সমাজবিদ্রোহ যখন শাস্ত্র আলোচনায়
ব্যাপ্ত—“স্বতকুন্ত সমা নারী, তপ্তাঙ্গারো
সমঃ পূমান্”—প্রভৃতি শাস্ত্র বচন উদ্ধৃত
করিতেছেন তখন বংশলোচন তাঁর সর্বনাশী
মাকে সব নিবেদন করিয়া দিয়া ডাকিতেছেন—

“ন ত্যক্তো, ন মাতা, ন বন্ধুর্ন দাতা,
ন পুত্রো, ন পুত্রী, ন ভৃত্যো ন ভর্তা,
ন জায়া, ন বিভা, ন বৃত্তিমম্বৈর,
গতিভুং, গতিভুং, যমেকা ভবানী”

বংশলোচনের জ্ঞান ক্ষয়বান্ ভক যিনি অন্ধিত
করেন, তিনি হিন্দু সমাজের প্রকার পাণ্ডা।

গোবর্দ্ধন অস্বাভাবিক পাত্র, বিপরীত, কল্যাণ
মরুপুত্রই তাহার একমাত্র লক্ষ্য। সে
আসিরাছিল বংশলোচনের বাড়ী প্রতিদে,
শ্রমস্বামী করিতে। হৈমবতীকে রেহ ও প্রদায়
চোখেই দেখিত, এবং আদর করিয়া দি
বলিয়া ডাকিত। গোবর্দ্ধনকে আড়ালে
রাখিয়া হৈমবতী ও তরলের প্রেম লজ্জার
পৌছিল। বেচারী তরলের খেতুর রস খাওয়ায়
অর্থ বৃথিতে পারে নাই। এক শুক্লচন্দ্রশীপ
রাজে হৈমবতী যখন জলে ডুবিল গোবর্দ্ধন
তাহার গাণরক্ষা করিল। হৈমবতীব লজ্জার
কাহিনী শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল এবং হৈমবতীকে
সমাজে বাঁচাইতে গিয়া সমাজের খড়্গে আঘা-
বলিদান দিল। “হৈমবতীকে নামে মাত্র দ্রী-
বলিয়া স্বীকার করিয়া, সমাজকে পিতৃনাশে
অধিকারী করিবার জন্ত অস্বাভাবিক করিতে”
হৈমবতী এই দীন পটুয়াকে বিবাহ করিতে
স্বীকার করিল। সে তখন বুঝিল না এই দীন
পটুয়া কতটা ত্যাগ স্বীকার করিয়া তাহাকে
রক্ষা করিল। হৈমবতী ‘বিধবা বৌ’ বলিয়া
পরিচিত হইল। গোবর্দ্ধন পলে পলে নিজের
জীবনকে বর্জিত করিয়া হৈমবতীর সমস্ত লজ্জা,
বেদনা ও গ্লানি বহন করিতে লাগিল। আশায়
মানব বাঁচে কিন্তু গোবর্দ্ধনের আশা পর্যন্ত
ছিল না।

যেদিন হৈমবতী তরলকে পাইল গোবর্দ্ধন
বুঝিল তাহার আত্ম কোন প্রয়োজন নাই, কিন্তু
তরল যে তাহাকে ব্যবশানে রাখিয়া তাহার
ধর্মপত্নীর সহিত অবাধে মিশিবে ইহা তাহার
পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব হইল। সেদিন তাহার
আত্মসমর্পণের আশাও লাগিল। সে তাহার
সঙ্গে ‘স্বরতি’ খেলিয়া ঠিক করিয়া গাইল যে

চাকরকে মরিচের ফল। কেন না সে বাড়ির
কাজের সময়ই শুধু হাত ধরিয়ে না।
একদিন সে হৈমবতীকে বলিল “আমি
হৈমবতীর বন্ধন তোমাদের মস্তিষ্কে এসে পড়ে
ছিল। আমার আশা আমি ম’রে যেতে
না। হৈমবতী ব্যাকুল হইয়া গোবর্দ্ধনের
মুখের দিকে মুখ তুলিয়া বলিল “আমি যে
তোমার ভাল বাসি”, গোবর্দ্ধন পরম স্নেহে হৈম-
বতীর ললাট চুম্বন করিয়া বলিল “আমি
জানি। আজ তোমার মুখ থেকে এই কথা
শুনলাম—এই আমার জীবনের পরম পুরস্কার,
চরম লাভ। আমার জীবন ত সার্থক হয়ে
গেল। তুমি আমার যখন ভালবাসো, তখন
আমাকে মিথ্যাবাদী করে নিজের ক্ষতি গোপন
রাখতে আর চাইবে না।” এইরূপে হৈমবতী
গোবর্দ্ধনের মরণ সম্বন্ধ নিবারণ করিতে দিগ্ভা
পন্ন হইয়া আসিল। গোবর্দ্ধন প্রেম নদীতে
স্নান করিল, কিন্তু নীর ছুইল না। তাই বলি,
গোবর্দ্ধন অপূর্ণ নৃপতি। ইহার মধ্যে একটা
কথা বলিয়া রাখি। চাকর গোবর্দ্ধনে যে
সমস্ত গুণ আবেশ করিয়াছেন তাহা একজন
অশিক্ষিত পটুয়ার পাওয়া যায় না। গোবর্দ্ধন
চির true to life ব্যক্তি হইয়াছে। আট
দিনের মধ্যে অশ্রুগিনি হইয়াছে। ইহাকেই
কল কঠোরতার আদর্শ। গোবর্দ্ধনের back
ground একটু মানানসই হইলে এই মোটুক
ফাটিয়া উঠত।

হৈমবতী সমস্ত শাস্ত্রী বংশের লিখিয়াছেন
“হৈমবতী হৈমবতীর সময় যখন সকলে ঘেঁষা
দলবদ্ধ হইয়াছিল, সেই সময় নিষ্ঠাবান
হইয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। প্রতি বছর
বিবাহের দিনে, এ চিত্রাঙ্কন লেখকের

চিত্তবৃত্তির পরিচয়

হৈমবতী ত হইল। তিনি ত হইল
চৈতন্য। হৈমবতীর মানসই প্রতিমার আশ
প্রতিম। কিন্তু হৈমবতীর প্রেমের গুণ আছে,
কেহ কদম প্রেম, কেহ স্বামী প্রেম, কেহ বিশ্ব
প্রেমে বিভোর এবং কেহ বা ভগবৎ প্রেমে
পাণ্ডল। প্রেম বহুভাষের উচ্চারণ করে।
তুলসীদাস বলিয়াছেন “বিনা প্রেম সে না মিলে
নন্দলাল।” Hugo বলিয়াছেন “Love is the
salutation of the angles to the
stars.” এই প্রেম বস্তুভেদে রূপান্তরিত হয়।
আমরা আশা করিতে পারি না পৃথিবীর সকলেই
ভগবৎ প্রেমে ধুলার গড়াগড়ি দিবে; কারণ
তাহা হইলে এ বিষটা হয় ত একটা Lunatic
asylum এ (পাগলা গারদে) পরিণত হইবে।
প্রতিমার আঁটির সময় হৈমবতী প্রতিমার
তন্ময় হইতে পারে নাই। কারণ তা’র প্রাণের
দেহতা ছিল সামনে। খ্রীঃখ্রীঃ আশ্রমপূজার
মন বসাইতে পারেন নাই—(যদিও আশ্রম ঘোষ
“জটিল কুটিল ভাষাতে সুখী হইত”) তিনি
জ্ঞানের প্রেমে তন্ময় ছিলেন। তিনিও একদিন
কাদিয়াছিলেন—“সখি ধরম করম সকলই গেল
জ্ঞানপূজা মোর হোল না।” অতএব হৈম-
বতীকে দোষ দেওয়া চলে না। প্রকৃত প্রেমের
ধর্মই হইতেছে—চিন্তার সমগ্র বৃত্তিকে এক-
মুখী করা। এই প্রেমের মোহেই বিশ্বব্রহ্মের
সর্গে রজ্জু ভ্রম হয়, শতশতাব্দীর দ্বার হইতে
অতিথি কিরিয়া যায়।

হৈমবতীকে গৃহভাঙ্গ করিতে হইল নিজের
লজা ঢাকিবার জন্য। কিন্তু অসত্য পিতাকে
ফেলিয়া শলাইতে হৈমবতী কি মনঃক্লম বোধনাই
পাইল। বিবাহের সময় নিজের মৌতুকও

কপালবাহু, অশ্বিনী, কৈকায়ী, বেনারীতে
পিতার কন্যা, অশ্বিনী, কৈকায়ী, বেনারী সকল
লক্ষ্যের রাশি, যেমন "কল্পিতা দিল—সেইদিল সে
শায়িনা পাইল।"

হৈমবতী গোবর্দ্ধনকে বিবাহ করিতে বাধ্য
পাইয়াছিল কিন্তু গোবর্দ্ধন যখন প্রতিমার
সামনে শপথ করিল যে বিবাহের পর তাহাদের
মধ্যে কোন দৈহিক সম্বন্ধ থাকিবে না তখন
হৈমবতী বিবাহে সম্মত হইল।

হৈমবতী সতাই তরলকে ভালবাসিয়াছিল।
সে প্রেম শুধু চোখের নদে, দেহজ হইতে পারে
কিন্তু তরলের অন্তর্দ্বারের পর তথ্য দেখা গীত।
নতুবা হৈমবতী তরলের ধ্যান মাত্র অবলম্বন
করিয়া ব্রহ্মচারিণী হইত না।

কিন্তু রক্ত মাংসের তরল যখন Gay
Lotharia রূপে দেখা দিল, হৈমবতী শিহরিয়া
উঠিল। ভগ্নে (Ideal) আদর্শে (Real)
বাস্তবে এতই তফাৎ! তরল বলিল "ঐ
চাষা পোটা ছোট্ট ইলাকটা সমস্তকণ বাড়ী
আগলে বসে থাকবে, এতে আঁধার লাভ।—
যেন কথামালার গল্পের গোড়ার দানার বাজের
কুকুর (dog in the Manger)—নিজেও
ভোগ কোরবে না, পরকেও ভোগ কোতে
দেবে না। বাজের ধন আগলে বসে থাকবে।
এখন চোরের উপব বাট পাড়ী করা ছাড়া আর
আমাদের উপায় কি?" হৈমবতী বলিল
"তুমি চলে যাও, তুমি আমায় কখনও
আমার কাছে ফুলো না।"

হৈমবতী যখন দেখিল গোবর্দ্ধন আত্ম-
বলিদানে কৃতসম্বন্ধ, কিছুতেই তাহাকে মঙ্গল
কোলা হইতে ফেরান যায় নী, তখন সে নিঃশব্দ
হইয়া গোবর্দ্ধনকে বাচাইতে ছিন্ন করিল।

কল্পিতা পক্ষের দ্বারা কৈকায়ী গোবর্দ্ধনের
পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে উচ্ছ্বসিত কান্না
কটে চাপিয়া বলিল "তোমার পায়ে হাত
বুলাই, আমি তোমার জীবন মর্যাদা কলঙ্কিত
করিনি, তোমার মহাবীর কপালবাহু আমি হাতে
দিইনি।" গোবর্দ্ধন সাধুরা সিবির দ্বারে বলিল
"আবার ও কথা কেন? আমি তো আমি ছুনি
আমার ভালবাস।"

মরণকে শিররে করিয়া মাতৃবৎ এমন হাসিতে
পারে ও সহজ ব্যবহার করিতে পারে ইহা
ভাবিয়া হৈমবতী বত আশ্চর্য হইতেছিল, তখন
তার ভক্তিও উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল,
ভালবাসাও আবেগময় হইয়া গোবর্দ্ধনের দিকে
ছুটিয়াছিল।

হৈমবতী গোবর্দ্ধনের পায়ে হাত বুলাইতে
প্রাণিল। গোবর্দ্ধন সুমাইয়াছে দেখিয়া হৈমবতী
উঠিয়া দাঁড়াইয়া গোবর্দ্ধনের পায়ে মাথা
ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। তারপর তরলের দৃষ্টি
সামনে হাঁটু গাড়িয়া ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিল।
অঙ্গসিক্তমুখে ছেলেকে চুম্বন পর কুমু
খাটরা আলো নিবাতিয়া দিল। তখন শ্রাবণ
বজ্রনী। বাদল রাগিনীসব সঙ্গে কুটিলারা ভাল
দিতেছিল—"কম কম কম"। তারপর সব শেষ।
হৈমবতী প্রাণ দড়ি দিয়া পৃথিবীর নিকট
বিদায় লইল। কবি বলিতেছেন "দোটারায়
বেগ মধ্যপথে চলাই প্রকৃতির নিয়ম। গোবর্দ্ধন
ও তরলের ভালবাসার দোটারায় গাড়িয়া
মাঝখানে হইতে মরিয়া হৈমবতী"। জানিরা বাল,
এ নরক সার্থক। শাস্ত্রী মহাশয়ের কবিতা "সেই
কবিতা যখন হে"। ১০. আলো... কবে
বেত। Corleia অন্তর্গত পটভূমি না হইয়া
একটি সৌন্দর্যময় করিয়া পিতার কন্যাকে করিলে

Concelliar কোন কতি হইত না। তবে King Lear নাটক খানার বোধ হয় অপমৃত্যু হইত, এই যা কতি।

এইবার আশুন একবার "শুভা"র খবর লই। লেখকের নাম অনেকই জানেন—ডাঃ নরেশ সেন—Dacca Law College-এর Principal এবং বাঙ্গলা দেশের একজন খ্যাতিমান ব্যাবসায়ী মনীষি। তিনি যে সূক্ষ্ম আইনজ্ঞ তাহা সত্যেনের দায়রার বিচারেই এবং "ইউর আইনের" ব্যাখ্যায় অনুমান করা যায়। কথার বলে 'টেকি অর্গে গেলোও ধান ভানে।' একজন মনীষি যখন সাহিত্যের আসরে নামেন তখন বুঝিতে হইবে যে কিছু নূতন জীবের আয়ত্ত্বানী হইবে, সাহিত্যে নূতন আবাহন আসিবে। তাঁহার 'অগ্নিসংস্কার' ও 'দ্বিতীয়-পদ' পড়িয়া হতাশ হইরাছিলাম কিন্তু 'শুভা' হার স্বরূপের পরিচয় পাইলাম।

পণ্ডিতলোকের পক্ষে নভেল লেখা বড় কঠিন, যদি সেই সঙ্গে সহজ প্রতিভা না থাকে। কলমচন্দ্র, শব্দচন্দ্র ও নিকপনার মতারা সেই সহজ প্রতিভা পাই, সেই জন্য তাঁহাদের উপজ্ঞানের মধ্যে কোথাও ত্রুটি নাই। স্বচ্ছন্দ পণ্ডিত নুতন করিতে করিতে ভাবের লতরী ছুটিয়া চলিয়াছে, ভাষা ক্রীড়নাসের দ্বারা ভাবের বোধ্য মাধ্যম করিয়া ছুটিয়াছে। নরেশ বাবু তাহা সে সহজ প্রতিভা নাই, এই জন্য নভেল লিখিতে 'শুভা' বইখানিকে প্রশংসা করা যায় না।

কিন্তু শুভার মিনি যে আবঙ্গলা দেশের সমাজে অনিবার্য হইয়াছে সে জন্য প্রত্যেক লোকের সাহিত্যিক তাঁর নিকট হইয়া আসিয়াছেন। পণ্ডিত Social Rebels বা

সমাজদ্রোহী—যথা Ibsen, Max Nordan, Edward Carpenter, Strindberg এবং Bernard Shawর বাণী তিনি বাঙ্গলা সাহিত্যে বহন করিয়াছেন। 'শুভা'র উৎসর্গে দেখি Dostrivskyর Reskobnicopp, Soniar পদতলে জাহ্নু পাতিয়া বলিতেছে— "I bow down to suffering humanity"—তাঁর উপোদ্যোতে দেখি Bernard Shawর Preface—তবে সৌভাগ্য সেটা সংক্ষিপ্ত।

নিবারণ চক্রের পত্নী শুভা স্বামীর পাশব ব্যবহার সহ্য করিতে না পারিয়া গৃহত্যাগ করিল। কাষটা প্রকৃতই অজ্ঞান, ইংরাজী সাহিত্যে East Lynneএ এমনকি Oscar wildeও Lady windermere's fanএ এই হঠকারিতার শোচনীয় পরিণাম দেখিতে পাই। গৃহত্যাগের ফল যে সব সমাজেই নিন্দনীয় ইহা আমরা জানি এবং ইহার বৃত্ত যে শুভ নহে তাহা 'শুভা' য়োঁকের মাধ্যম না মানিলেও আমরা মানি। কিন্তু "বা"র মাথা সেও জানে, জানে কি পরে?" কি বেদনার এই হতভাগিনী নারী গৃহত্যাগ করে তাহাও আমরা জানি। Provocation বা কারণ ছিল যথেষ্ট।

নিবারণ একবারে পণ্ড ছিল না। মাঝে মাঝে স্বীকৃতি আদর করিত এবং যদিও শুভার গর্ভের স্থান হুই হুইবার পদাঘাতে নষ্ট করিয়াছিল কিন্তু শুভাকে কাম কেই গালি দিলে শুভার হইয়া বগড়া করিত। তবে হুইথের বিধ শুভার মধ্যে আত্মসম্মান জ্ঞান লজ্জা এবং উত্তরাছিল, পিতৃপদের শিক্ষার দ্বারাও দৃষ্টি সজ্জিত ও বিবেক উজ্জ্বল হইয়াছিল।

উপযুক্ত স্বামীর হাতে পড়িল। শুভা যে আদর্শ পত্নী, আদর্শ জননী হইয়া সমাজের কল্যাণ সাধন করিতে পারিত সে বিষয়ে অতুল্য সন্দেহ নাই। শুভা সাধারণ নারী হইলে নিবারণচক্রকে লইয়া দিন গুজরান করিয়া দিত। কত শত হিন্দু নারী এমনভাবে জীবন বহন করিতেছে তাহা বইয়া নাই। কিন্তু শুভা নিবারণকে সহ্য করিতে পারিল না। দেবী-চৌধুরাণিব উপদেশ স্মরণ করিল। “মানুষের জীবন ভোগের জন্ত নহে, কর্তব্য সাধনের জন্ত—জীবনের প্রকৃত আদর্শ নিরন্তর সকলের জন্ত আত্ম বিসর্জনে” কিন্তু এ উপদেশ মনে লাগিল না। ভাবিল সংসারে একটা ছোট্ট শিশু থাকিলেও তাহার জীবনের একটি লক্ষ্য থাকিবে কিন্তু দেখিল সব শূন্য। কেবল লাখি ঝাটা তিসকার সেই শূন্য জড়িয়া আছে। মনে পড়িল সেত সঙ্গে ডোবাব জীবনী, Florence Nightingaleএর জীবন, Mrs. Besantএর বৃহত্তর জীবন।

শেষে স্থির করিল “যদি থাকিলে শরীর বেচিয়া বাচিয়া থাকিতে হইবে, বাহিরেও না হয় প্রগতি হইবে। কিন্তু স্বাধীনতা চাই, মুক্তি চাই, জীবনটা সার্থক করিবার একটা অবসর চাই।”

শুভা গৃহত্যাগ করিয়া পিরোটারে গেল। সেখান হইতে টাঙ্গা গ্রামকে নিজের আশ্রয়ে লইয়া গেল। টাঙ্গার হাতে পড়িয়া শুভা নিজেকে গাড়িয়া তুলিতে লাগিল। এমন সময় এলবাট থিয়েটারের ম্যানেজার স্বরেশ বাবু দেখা দিলেন। শুভার সন্দেহ হইল টাঙ্গা তাহাকে বেচিয়া টাকা উপায় করিতে চায়। সেইজন্য সে মুক্তি কামনা করিল।

নগেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার সে বেন মুক্তি পাইল। নগেন শুভাকে লইয়া যাহেব পাড়ায় বাড়ী ভাড়া করিল। তিনটি দিন সুখস্বপ্নের ভিতর কাটিয়া গেল। শুভার জীবনে এই তিনটি দিনই পরম দিন—ওত প্রোতভাবে প্রেমে মগ্ন, কারণ সে আত্মবিশ্বস্ত হইয়া নগেনের প্রেমে সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। বর্ণনাটা পড়িয়া মনে পড়ে Anatole Franceএর Red Lily Thorese ও Dechartreএর মিলন কাহিনী। আত্মবিশ্বস্ত ও স্বপ্নই ত জীবনের পরম স্তম্ভ ও তৃপ্তি এবং সেইখানেই বোধহয়, জীবন জীবন-রূপে সার্থক। হতাশাগিনী শুভার এই তিনটি দিন স্মরণীয় ও বরণীয়। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারেন নাই। তিনি সরোবে লিখিতে গেলেন, “যখন চক্রে আবার যখন ‘পূর্বা পরিচিত উপপার্শ্ব’ সহিত দেখা হইল সাহেব পাড়ার সাজান গুজান বাড়ীতে যখন ‘শুভা’ বিলাসের উপকরণ রূপে প্রস্থান করিল তখন তাহার যে বিকট প্রেমের তাণ্ডব লীলার উল্লস চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা বীভৎস রসের উদ্দীপক”। শাস্ত্রী মহাশয় কাব্যাদর্শ, কাব্য পোশাক সাহিত্য দর্শন পড়িয়া রস নিশ্চয়ই আয়ত্ত করিয়াছেন। কিন্তু ভুলিয়া গিয়াছেন বোধ হইতেছে রোদ রস, তাহা দিয়া আদি রসের বিচার চলে না। তিনি কি “জয়দেব” “বিজ্ঞাপতি” “ভারত চন্দ” কুমার সম্ভবের “অষ্টম সর্গকে” অজ্ঞান দিয়া কাব্য জগৎ হইতে বিদায় করিয়া দিতে চান?

কিন্তু এত আনন্দেও শুভার মন সজাগ ছিল। “সে এমন একটা তুচ্ছ বৈরিনী হই আর কি! নই এ কথা ভাবিলে তাহার হৃদয় কেন

[illegible]

বাক্সের উদ্ভিৎ অনেক বেশী কিছু এদেশের সমাজ অপেক্ষাকৃত শাস্ত্রপ্রিয়। অন্ততঃ আজ পাঁচ হাজার বৎসরে ও এই ব্যবস্থায় ত সমাধি বিশেষ কোন ক্ষতি নাই।

কিন্তু এমন ব্যবস্থার মতো ও মাঝে মাঝে এমন দুই এক জন নারীর উদয় চর্যবীচাদের জন্ত এই বিবাহিত্ত জীবনের বখেটে মছে এবং বাহ্যিক বিবাহিত্ত জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বক্ষা করিতে পারেন না। সেই জন্ত তাহাদের মত সাধারণ নিয়ম খাটে না। নারীর মনস্তাত্ত্বিক মনস্তাত্ত্বিক দোষ সন্ধান জগৎরিত মনস্তাত্ত্বিক মনস্তাত্ত্বিক সংসারজীবনে ইহা নিম্নলিখিত পথে পারেন না।

মেবাবের রাণী 'মারা বাক' একদিন কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী হইবে লজ্জা মান বিসর্জন দিয়ে দ্বারে দ্বারে ভিখারিনী বেষে বেড়িয়া গিয়েন। কহ মেবাবে মনস্তাত্ত্বিক রোগেতে পারেন নাই। এ ঘটনা অসম্ভব। কিন্তু পুরুষের প্রেমও পাগলিনী হইয়া নারী গাথ বাহির হয় এবং বেইমিন সেই প্রেমের স্বপ্ন—নাশ অনেক সময় ভোগালপার নামান্তর মাত্র—টুটিয়া যায় যেদিন সেই হতভাগিনীর দেহ বিক্রয় ভিন্ন অসংস্থানের আর কোন উপায় থাকে না। শুভাও সেই হতভাগিনী। সে কুল ভাগিনী, সমাজকে সে বড়ই উপকার করুক, তাহাকে চরম শাস্তি বহন করিতে হইয়াছে। অপমান, বেত্রাঘাত, প্রকাশ্য আদালতের লজ্জা ভোগ করিতে হইয়াছে। অজ্ঞায় করিলে মাথা পাখিয়া অজ্ঞায়ের শাস্তি বহন করিতে হইবে ইহাই মনাজের সাধারণ নিয়ম। অল্প অল্প সময় হইয়া বাহিরের দোষ দোষ দায়। কিন্তু নৈতিক ভগ্নে বা Moral

worldএ শুভা কি দোষী? এই পোনে উদ্ভব দিতে চেষ্টা করিয়া এই প্রবন্ধের শেষ করিব। তবে সামাজিক জীব—সংস্কারের দর্শন আমার মত গ্রহণ করিবেন কি না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।

শুভার স্বামী অসংস্থানী এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। সকলে অসংস্থানী মত করিতে পারে না, শুভাও পারে নাই। সকলের সহগুণ সমান হয় না। পুরুষ 'আপনার দিন' ভাগ্য ভাগ্য কবির পাশের সেই দিন বাকী পদ পদ স্বামী ভাগ্য করেন, নীতিকে নোহ বাকিতে গরি না। অসংস্থানী মনাজে গরি বাহিরে বাকীর স্থান বাকীর বা নীতালয় প্রাপ্ত বড় দোষী নয়—বাকীর দোষী between Teedleum and Too Padee—শুভা সেই সনাতন পুরা অবস্থায় বাকী। সে জীবনে কটকট কটকট অসংস্থান, কবির পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি। অসংস্থানী মনাজে নারী পুরুষের সহজ 'ভিকার' ভিকারো'। বাহ্যিক দেশের পুরুষ টেড, টেড, এবং নারীর সহজ 'ভিকার' বাকীর মনাজে তাহা প্রাপ্ত অসংস্থানী ভোগে পড়ে। ভদ্রমত মনাজে মনাজে শুভা দোষী বাকীর কবিরে বাকীর অসংস্থানী ভোগে পড়ে। শুভা টেড ও বাকীর বাকীর চিনিতে পারি না বাকীর নীতালয়ে বাকীর করি। কিন্তু 'পুরুষের ভাগ্য' এবং 'নারীর ভাগ্য' অসংস্থানী পুরুষের ভাগ্য। এতদিন 'নারী' বাকীর ভাগ্য নয় একটা মনাজে বাকীর।

I slept a dream that life was beauty,

I ~~discovered~~ and found that life was duty.

তখন মাদার কীশানের গুপের উপদেশ শু চাপার সেবা ব্রত ত্যাগের জীবনকে নতুন পথে চালিত করিল। শুভা মিলিল অর্থ, মর্যাদা, চশের মূল্য বড় কম যদি জীবনে প্রেম না থাকে। এমন সময় আবার নতুন আশ্রয় উপস্থিত। কিন্তু চাপার অর্থের জন্ত, মৈলীর অর্থের জন্ত, শুভা আজ বলিদান দিল। বধ, মান, অর্গকে তুচ্ছ করিয়া সেবা ব্রত গহন করিল। Florence Nightingale-এর আদর্শকেই জীবনে বরণ করিল।

পাক্ষী মহাশয়ের লিখিতেছেন—“পঞ্চাশ বৎসরের বড়ের প্রতি তরুণী পরকীরার আশঙ্কিত বসাবাবেরই পবিত্রটি করে।” Zola-র বা Pascal-পড়লে বুঝতে পারি পাঁচশ বৎসরের বড়ই কেন নাট বৎসরের বড়ের পোনে ভয় হইয়াছে—এ প্রেমের কথা শুকায়, সংগত-ভূমিতে আমাদের দেশেও দেখিতে পাউ তরুণী পাক্ষী বৃদ্ধ স্বামীর প্রেমে তরুণ। ইচ্ছা অনৈসর্গিক নচেৎ এত বসাবাবেরও সৃষ্টি করে না। কিন্তু পাক্ষী মহাশয় বইখানা পুনরায় পাড়তে যদি এ কথা শুনে যে কোন দিনও ‘তরুণী পরকীরার কথা’ সুবেশ বাবুর প্রতি আশঙ্কিত হয় না, তবে বাবুর প্রেমকে শুভা প্রমাণমানই করিয়াছিল।

আগামের millennium-এ যে দিন সুবেশ বাবু পৃথিবীর নিকট বিদায় লইতে গেলেন তখন সেটা হইল শুভার সঙ্গে। এ মিলন বড় চমৎকার! নিকটবর্তী ‘শ্যামলী’ মনে পড়ে—অবশিষ্ট-ও প্রেমের মিলন হইয়াছিল ত্রিমাল্লের শিরের ওর কেশ বৃদ্ধ বৃদ্ধার। সুবেশ বাবুও

শুভার মিলন কামানের উপহাস্য—একজন বৃদ্ধ আর একজন প্রৌঢ়। এ প্রেম মনে চণ্ডীদেবের ‘কামগন্ধ’ নাতি তার। এ জামাবাসা একবারে Platonic Laura-এর প্রতি Petrarcha-র মত। সুবেশ বাবু বলিলেন ‘শুভা, মনে আছে তোমার সেই এক দিনের কথা, যখন আমি তোমায় আমার ভালবাসার কথা জানিয়ে ছিলাম। তুমি হেসে উড়িয়ে দিয়ে ছিল, বলে ছিল, পুরুষ মানুষ ভালবাসে না, কেবল অধিকার চায়। আমি সেই থেকে বরং তোমায় ভাল বেছেছি। আজ তোমার বড় থেকে একটাবাব শুনে যেতে চাচ্ছি যে তুমি বিশ্বাস কর যে, আমার ভালবাসা সত্য ও নিঃস্বার্থ। বিশ্বাস কর কি শুভা?’

শুভা কানিয়া বহিল—“আজকে কানি সুবেশ বাবু, হামনি যে অপারে নাচনা না দিল এত দিন তখন পেয়েছেন তার জন্ত আমার যে নিঃস্বার্থ উপর কি রূপা আছে তা বলতে পারি না।” কই পরকীরার আশঙ্কিত দেখান পাইলাম না।

মৈলী ও চাপার চারও বেশ সুটিয়াছে। সমাজ বন্ধনের বাহিরে পারি-দেব সে বস্তুমাত্র ও চণ্ডীদেবের পূজার বিকাশ। ইচ্ছা-পারে মৈলী ও চাপাও লেখক তাড়াতী দেখাত্যা-ছেন। এখানেও এক স্পষ্টত দেখাত্যাছেন বোঝাবাহিত জীবনই নারীর আদর্শ। চাপার সেবারও গার্ভেরা জীবনের তুণীর কাঁচি মার। কাজেই সে ভুবনচক্রকে পাইয়া পুর বড় পরিবর্ত হইয়া নারী জীবন সার্থক করিল। শুভাকেও কঠোর আর্থ পরীক্ষার পর স্বীকার করিতে হইল—যে নারীর স্বপ্ন স্বামী প্রেমে

হানী রেবার, প্রকৃতি লক্ষ্যমণী হওয়ার সে গাট হিসাবে এমনটি আর একখানি চিত্র-
 নিজেই নিজের মিল বে মৈলীর তার চেটা গীতায় বরণীর।
 করিলে সেও অনীকে মাহুয় করিয়া নইতে কিন্তু সমাজে ত্যাক হইলেও মানব সমাজে
 পাবিত। গ্রাহ হইবে—এক বাহ্যিক দর্শন সমাজ
 পরিণামে আরার বক্তব্য বে “দোটাণা” ও এই উপস্থাপন হইখানিকে ধরণ করিয়া
 “Perfume of vice” নাই, একখানি নইবেন।

মহাপ্রস্থান *

[দরবেশ]

প্রভুর আস্থানে ঐ চলিয়াছে ভূতা,
 উর্কে ছ'বাহ তুলি আকুলিত নৃত্য;
 দোদুল চরণ তার, মুখময় হাস্ত,
 সিক সাধনা আজি, সার্থক দাস্ত।

শাসে শাসে নামাভাসে নামী আশে—সত্য,
 নিদানে বিধান নাম ঔষধ-পথ্য;
 নামে মতি নামে রক্তি নামে অশুরস্ত;
 নাম-গানে নেচে নেচে ঐ যায় ভক্ত।

নাম-নামী-নামদাতা নহে তিন ভিন্ন,
 সঞ্চিত-প্রারক সব আজি ছিন্ন;
 সংশয় নাহি আর—নাহি তিল মাত্র,
 মরণ উপচি' উঠে জীবনের শাত্র।

বাজে ঘন করতাল মধুর মৃদঙ্গ,
 মস্তুর ধুলে একি ত্রিদিবের রঙ্গ;
 তক্ত নাচিয়া চলে ইফের সঙ্গে,
 ডেকেছেন প্রভু তারে নয়ন-ভ্রমে।

সত্য সাধু-স্বাধিকা নাম তার সারস্বত-সত্য মহাপ্রস্থান, জীবন-সত্য
 করিলে নৃত্যকরিত করিতে নৃত্য দর্শনে লিখিত। বারানসী ১২ই, মার্চ,
 ১৯২১।

বারাণসীধাম এই চির অবিমুক্ত,
রটন্তী-কোমল-নিশি তাহে যুক্ত ;
মঙ্গল হরিণাম শ্রীতারক ত্রুণ,
মঙ্গল নর্তন—মৃত্যুর বর্ষ ।

মহান প্রয়াণ হেন মরণের হল্ল,
হেরি মিটে জীবনের মত বিধা ধল্ল ;
জীবন মরিয়া রয় মরণের রাজ্যে,
মরণ ঝাঁটিয়া যায় জীবনের কার্যে ।

সার্থক নর্তন কীর্তনানন্দে,
সার্থক ও-জীবন মরণের স্পন্দে ;
জন্ম সফল আজি হেরি চারু দৃশ্য,
ধন্য শ্রীগুরুদেব ধন্য রে শিষ্য ।

সাহিত্য পরিচয়

নির্বাসিতের আত্মকথা—১, সিনকিন—১/০ বর্তমান সমস্যা ১০

[লেখক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

পাওয়া যায়—বিজলী কৰ্ম্যালয়, ২৩১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

বাঙ্গালা সাহিত্য মাসিক পত্রিকার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এখন প্রবল বেগে বাড়িয়া উঠিতেছে যেখানে বহু বুরি অসম্ভবীয় পর জলপ্রাবন হয় । অনেকজন মাসিকী লেখক লেখিকার কথা বার দিলে প্রায়ই অপারিত্ব ভ্রমিত হয় । অনেক লোকের কথায় বই শেষ করিয়া শেষ করার হুঁসি প্রায়ই শেষ বড় কিছু পাওয়া যায় না । কিন্তু অনেকের মধ্যেই শক্তির অভাব, করার দলে সাধ আছে সাধনা নাই । অনেকেই জামিনা দেখেন না যে নতুন কোন idea বা চিন্তার

দ্বারা সাহিত্যের পরিপূষ্টি করিবার শক্তি যখন নাই তখন লিখিয়া লাভ কি । জানি এ উপদেশ অনেকেরই ভাল লাগিবে না । কাবণ হয়ত বা এ উপদেশের মধ্যে অনেকটা ফাঁকি আছে, এবং অনেকে বলিবেন বাঙ্গালী জীবনের এমন কি বৈচিত্র্য আছে যাহাতে নতুন নতুন চিন্তা যোজ গড়িয়া উঠিবে । কিন্তু যাকে যাকে হঠাৎ প্রতিভার বিদ্বাৎ ক্ষুদ্র দেখিয়া চমকিত হইতে হয় । একবার পাহাড়ের উপর গম্বিতে দাঁড়িতে একটি হ্রদের তীরে পৌছিয়া যখন হ্রদের

মুখের উপর দিয়ে বসে পড়তে পারতাম। কিন্তু সেখানে
দাঁড়াইলেই মনে হতো যে আমি একজন অসহায়।
কিন্তু আমি জানি না। একটা দিন আমি শুনেছি
যে "Truth is stronger than lies"।
Stepniak কে।
এই উপর বিশ্বাস এ...
একজন ব্যক্তির মধ্যে...
"সবজপত্র" শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী
চৌধুরাণীর সমালোচনা হইতে কিছু উদ্ধৃত করি-
বার প্রয়োজন বোধিত পারিলাম না। তিনি
এই একবার ধরলেন কোথাও
নভেলের তুলনায় কিছু কম হয় না।
দৈনিক জীবনের "up, and
down" went to bed...
এই গল্প, এই কথা...
অমান্য করার ভাবে কখনো...
১২১৩...
নিষ্ঠারূপে অপমান...
মাছুষ পাগল না হয়, উন্টে ছাড় হাত থেকে এ
প্রকম বই বেয়ে যাওয়া তাতে পছন্দে যেমন
আছে সেমন আমাদের ননস্ত যাহা আগুনে
পোড়ে না, জলে গোবে না, আশা
হুড়ে না ও লক্ষ্য ভোগে না। সকল
অমরে *লেখকের সংগ্রহ ও একটি
বাঙালী গল্প বলে মনে হয়। কোথাও হাজ
প্রাণ, মর্শোটিকা...
অহমিকার... "নির্বাসিতের আত্ম-
কথা... আমাদের অধীনতা-
অধীনতার অঙ্গকার সুসংবাদ
এই... আজকাল

কামারের দাব বই পাই তাল
কামারের তবু তবুকে বাঁধাই, বন্ধন মন
কামার ও ছাপা এবং বস্ত্রের ছবি ।
কির আনন্দ সময়েই ছোঁবড়া ও আঁটছে
কামার ছড়িয়া থাক, শাঁস বড় পাই না । এই
কামারের দাব বই পাই তাল ।

বর্তমান ছোট মাং ১১০ পৃষ্ঠা, দেড় বস্তার
খোলায় কিন্তু ইহার তুলনার count of Monte
Oristo ও আর্মীদের সাহিত্যের 'রাজকুমারী' বা
'প্রাথমিক' কীর্তি নাই। সেদিন ৯৯ পৃষ্ঠার
একজন ইংরেজী কবি (কর্মীদের অজ্ঞান)
খোদারাজের Political Islam পড়িয়া
ঐতিহাসিকের মত মন্তব্য করেন—
'অধিকন্তু ইংরেজী কবি'—
ভাব্য। 'কর্মীদের অজ্ঞান'—
মাথায় নত 'ইংরেজী পড়িয়া'—
আমাদের দেশে এমন মাথায়ও জন্ম
সে আজ ১৭ বছর কথা।
কিন্তু 'লক্ষীছাড়া ছেলে' দেশের কার্যকে
বলিয়া মানিকতলার বোমা তৈরী
সেদিন তাদের—

“শুদ্ধ পরাণে শক্য না মানেন, না রাখে কাহারোও,
জীবন মৃত্যু পারের ভূত্যা চিন্তা ভাবনা হীন।”
অরবিন্দ, কীর্ত্ত, অবিদ্য, উল্লাসকর, উ
প্রচুর এই গুণের ধুরোহিত ছিলেন। সে সব
কথা শুনে ছাত্রদের কথার প্রয়োজন নাহ।
উপস্থিত কেমন করিয়া আশ্বাসন পুষ্ট
বেড়াইয়া আসিলেন সেই কথা শুনে মন
সহজ ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। বৈদ্যনাথ
একটা অভাবনীয় বৈচিত্র্য যে গীতারের দ্বারা
এত নিয়ন্তন ও অপমান করে কারো
কোথাও তাঁর দের উপর সন্তোষ না থাকে

নাই। শুধু চোরে চোখে পড়ে একটা সজর
কোড়কের মিশ্র। এ স্বকর্ম (amour)
বাকলা দাঁটা নতুন জিনিস, বেন মুখে
হাসি, চোখে জল। শোনা গার লোলা বেলী
গরম হইলে হাতকে white hot বলে, সেই-
রূপ তাঁর হৃৎপত্র এত তাঁর যে তালি চোখের ওলে
প্রকাশ করা যায় না বলিয়া হাসিতে ফুটিয়া
উঠিয়াছে। লেখক কানাইলাল সম্বন্ধে বলি-
তেছেন 'কানায়ের মত এমন প্রসন্ন মুখজবি
আর বড় একটা দেখি নাই। সে মুখে চিকার
রেখা নাই, বিষাদের ছায়া নাই, চাকল্যের লেশ-
মাত্র নাই, প্রসন্ন কমলার মত তাহা বেন
আপনার কানাইলাল হুটিয়া বহিয়াছে।
ওনিয়াহিদাম জীবিত হইয়া বাহার কাছে তুল্য
করা হইয়া থাকিত সেই পরমহংস। কানাইকে
কানাইলাল বলে কখনও পড়িয়া গেল। স্বরিত্ত
করিয়া শুধু এত কথাই মনে হইতে লাগিল
কি চিত্তবৃত্তি নির্গমের এমন পথও আছে
যাহা পাইয়াছি। বাহির করিয়া বেন নাই।'
কানাইলাল মনে এই লেখকের মত হইতে এ কথা
কহিল। কানাইলাল এ কথার মত মনে
কি হইতে পারে। লেখক তাহা না জানিয়া
মুগ্ধতা জানিয়া এ কথা কহিয়াছেন।
কানাইলাল সম্বন্ধে মনে হইতে পারে উদাহরণ
যে কর্তব্য দিন বাক্য আছে যে কর্তব্য দিন
মেন চা খাইয়াই কটীয়া বিতে গার
কানাইলাল।

সাবুর দলে জুটিয়া 'কড়া প্রসন্ন' পাই
ভক্তিভী উল্লেখ্য অনিগ্র্য মন্যের এই
ভঙ্গবৎ প্রসাদই যে সার বড় তাহা থাকে
না হইতে যাইতে পারে বার, আর তাঁর
করম সমস্ত ভিজিয়া দাস হইয়া আসে।

কানাইলাল এটা জ্ঞানের মত মনে
সম্বন্ধ। 'খুনি সাংঘ্য সিদ্ধি' মনে
গাছে কান কলাইরা দিয়াছিল। কানাইলাল
লেখকের মনে হইয়াছিল—গাছের মত কি
সোজা কথা।' আমরাস বলি হইতে।

যখন ছেলেদের কানাইলাল মনে
বস্তু হইতেছে তখন উল্লাসকর মন্য করা
ঠিক। কানাইলাল ঈশ্বরের সাহেবের
তিনমণ কি নাচে তিন মণ এবং জ্ঞান
মোহ হইলে পাইয়াছে কি আরেকবার
বাইয়াছে। কানাইলাল গরম কানাইলাল মস্তিষ্ক
নিশ্বাস ছাড়িয়া উল্লাসকর বলি 'বাক্য, দার
থেকে বাঁচা গেল।' Birley সাহেব যখন
জিজ্ঞাসা করেন 'শেষমহা কি মনে কর যে
তোমরা ভারতবর্ষ শাসন করিতে পারি?'
লেখক উত্তর দিয়াছিলেন 'মহাশয়, কেবল
বাসের পক্ষে কি তোমরা ভারত শাসন
করিতে পারি, তোমাদের দেশ হইতে আমরা
শাসন, কড়া দার কহিয়া পানতাম'।
সাহেবের উত্তরটা পড়িলে মনে

উপেক্ষা হইবে। দার বাক্যের ঠিক মত
কহিয়া আসিলে। দার বাক্যের বিচারে শু
কানাইলাল আর প্রসাদ মনে কানাইলাল
বাইয়াছে। কানাইলাল সম্বন্ধে মনে পড়িতে
যে ভারত, একমুখে উদ্যে সাধুগণ
কানাইলাল, কানাইলাল করিয়াছে। আর
নিশ্বাস করিতে গিয়া একমুখে উদ্যে পুলি-
সে কানাইলাল পড়িলে। কানাইলালে যে
ভঙ্গবৎ একমুখে কানাইলাল কানাইলাল বাক্য
কানাইলাল হইতে তাহা তখন কানাইলাল না
এখন কানাইলাল শাসনটুকু কানাইলাল হইলে
বাক্যের সব লক্ষণই মেলে।

জেলের মধ্যে চব্বিশ টি মনোবৈতিক আকোলন। 'লপলী'র মত কয়েক উচ্চর শাইবার আশায় অধ্যবেশ ভাগ কাবেই হইত। কামিখাগুলোর আচারের জন্ত। সকলর আঠদীল ডাক্তার জরীকেশের চকু মাচান বাখাম শুনিয়া জামিয়া হাসপাতালে পাঠাইয়া দিলেন। রোগাশুও কিছুদূর পকরীদেব কামেনব ছিভ এক কাশিয়া দিও সে পদবৎ লেয়াছেন। জেলার বাবু জর্জিওরও পাত্তি মনকরপ করা গর না। 'কিন না গামিফার গামিয়ার (চতুর্দশ) পক্ষ পক্ষ, ও মনকের পদ্যেবের মক্ষ - জেলের গামের উপদেব আশিয়া জুটিয়ে শাহার আর এক তৎসর পাকিয়া জেলার জামিয়া কামিয়ার সুবিধা মিলিয়া না। জেলার বাবু মূখে 'জলগাছেক আড়াল চাইতে'ন দিনমতি; বড়ই 'উপদেব'।

জামিয়ার জামিয়ার জেলের মন করিত হইত। জামিয়ার জেলের মন করিত হইত। জামিয়ার জেলের মন করিত হইত।

জামিয়ার জামিয়ার জেলের মন করিত হইত।

জামিয়ার জামিয়ার জেলের মন করিত হইত।

জামিয়ার জামিয়ার জেলের মন করিত হইত।

জামিয়ার জামিয়ার জেলের মন করিত হইত।

জামিয়ার জামিয়ার জেলের মন করিত হইত।

জামিয়ার জামিয়ার জেলের মন করিত হইত।

জামিয়ার জামিয়ার জেলের মন করিত হইত।

জামিয়ার জামিয়ার জেলের মন করিত হইত।

জামিয়ার জামিয়ার জেলের মন করিত হইত।

জামিয়ার জামিয়ার জেলের মন করিত হইত।

এ বই ট্রান্সলারের (স্বঃ) এ বহুসংখ্যক সমালোচনা ভরসা। তবে আমাদের কাজ পরিচয় করিয়ে দেওয়া। আশা করি এটি একটি বিশালমূল্য অঙ্কিত বিচিত্র দেশী ও বাদশী ভাষায় অনুলিপি হইতে অসংখ্য পুঁজির মতো বাংলায় কি প্রসিদ্ধি। এমন কোনো কোনোটা যদি কাগজে কাপিয়া দাও, টুটকা বা লুক্কর বন্ধ জমাই বাঁসিয়া যে ইচ্ছার মতী হয়।

১০. লরকের সিন্ধুফিন (সংস্কৃত) প্রকাশিত। উৎপাদিত, পদদান ও আঁকির কাজে কল্যাণের পুঞ্জীভূত অত্যাচারে সিন্ধুফিন ক্রমে দেশী দিখায় এটা লেখকের সমবেদনা পূর্ণ লেখক বেশ টুটকা উঠিয়াছে।

ইংরাজী-না জানা বাংলায় অবশ্য পাঠ্য এক পুঁজিকা।

১১. তাঁহার 'বসন্তমান সমস্তা'তেও অনেক নতুন কথা আছে। ইংরাজ শাসিত ভারতের ইতিহাস এত অল্প কথায় এমন গুড়া ইয়া কেহ বলিয়াছেন কিনা জানি না।

১২. পুণ্ডর লেখকের চিত্তাশীলতার প্রাচুর্য পড়ে। তাঁর মনোমত ভাবে সংগঠিত হয় তাঁর 'thought provoking' মতের নাম দেয়। তাঁহার ভাষায় ভাবের প্রাচুর্য - বলিয়াইবে দাবের মত - এক আদর্শ। আদর্শ শব্দক তার ঢাকা মাটিয়া দিয়া মরাতার দৃষ্টি প্রকাশ করা।

— প্রবন্ধ —

কলিকাতা

বেঙ্গল পিণ্টিং স্টুডিস, ১০ নং কামাপুর লেনে
শ্রীমজীবচন্দ্র লাহিড়ী দ্বারা মুদ্রিত।

কালীধাম

"অলংকা" কার্যালয় হইতে চারুশর্মা বন্দ্যোপাধ্যায়
কর্তৃক প্রকাশিত।

8

SECRET

সচী।

(বিশাখ ১৩০৯)

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। নবীনের বাবা		১১৩
২। বৈরাগী (কবিতা) দরবেশ		১১৫
৩। উত্তরোত্তর সাহিত্যে বিচারের মাপকাঠি		১১৬
অধ্যাপক—শ্রীমতেন্দ্র নাথ বসুচরণ ও সঙ্গী		
৪। মরণ পুষ্টি মর্জিন	শ্রীমানিক ভট্টাচার্য	১২০
৫। কুরে (কবিতা)	শ্রীগিরিজা কুমার	১২৪
৬। প্রেমালম্বন	শ্রীমানিক ভট্টাচার্য	১২৭
৭। আমাব চন্দ্রিকা	শ্রীকান্ত নাথ বসুচরণ	১৩৫
৮। অশ্রু রাধা কবিতা	শ্রীমতেন্দ্র নাথ	১৪৭
৯। আশ্রয়দেবে	শ্রীমতেন্দ্র নাথ	১৪৮
১০। কবির কৈকবৎ (কাব্য)	শ্রীমোহিত নাথ	১৪৫
১১। অন্নবৎ সমস্ত	আচাৰ্য্য শ্রীমতেন্দ্র নাথ	১৪৭
১২। মায়ের অধিকার	শ্রীচন্দ্রনাথ বসুচরণ	১৪৯
১৩। কান্দ পো	শ্রীমানিক ভট্টাচার্য	১৫২
১৪। বৈরাগী	শ্রীস্বামী চন্দ্র চক্ৰবর্তী	১৫৭

অদ্বিতীয় “আমাশয়াস্তক বাটিকা” মহোৎসব

যে কোন পকারের জলিশয চক্ষু নঃ ২৪ ঘণ্টায়, গারোগ্য হইবে, তাহা মূল্য ফেরৎ দিবে। মূল্য প্রতি সপ্তাহ ১০ আনা মাত্র। ডাক মাণ্ডুল বন্দ।

অদ্বিতীয় “জরাস্তক চূর্ণ” মহোৎসব

আমাদেরিয়া জ্বর, কুইনটিন আটকান জ্বর, আসামের জ্বর, বিশম জ্বর এক অজাত সর্বত্র প্রকারের জ্বর ৪৮ ঘণ্টায় তাহা ৩৫.৫° ফারেনহাইট মূল্য ফেরৎ দিবে। মূল্য এক সপ্তাহের ঔষধ ১০ আনা।

ডাক মাণ্ডুল বন্দ। একডো বেশী পরিমাণে ঔষধ লইলে কমিশন দিবে।

প্রাপ্তিস্থান—এ. কে. এক সর্বত্র ১২২ চাকি পাস্টোরেজ ফিল্ড।

প্রাক্তন প্রকাশিত

নতুন প্রকাশিত

সংস্কৃত প্রাচীন ভাষা সাহিত্যিক

বিখ্যাত কবিতা-প্রসঙ্গ দশগুণ্ত এম. এ. প্রণীত

[মূল্যঃ অসংখ্য] চুস্তির দাবী - মূল্য ১৫০

যদি কোনের ভবিষ্যৎ বাক্য এত দিনে সম্পূর্ণ হইল।

ঐক্যধরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত

[কাব্য] ভ্রমরভঞ্জন ২

কাব্য ৫০

পূর্বিকা ৫০

ভ্রমর ৫০

মর্যাদাসূত্র ১

আমাদের অতীত প্রকাশিত পুস্তকের তালিকার ভিত্তি আপনি আজই খর দেখুন এবং
আমাদের আট-আনা কলকণের গ্রাহক প্রেরী হুত হউন।

এখানে স্বাধীন বঙ্গালী পুস্তক পাওয়া যায়।

মহাদাবক কল, পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা, ২২০ কণ্ডলালিস ট্রাট,
কলিকাতা।

সন্ন্যাসী জরাস্তক সুখা প্রদত্ত

ইহা জরুর সন্ন্যাস সেবন করিতে কোন প্রকার ভয়ের কারণ নাই। ইহা সেবন
নতুন ও পুরাতন জর, প্রীতি, ক্ষত ও তদামুসলীক জর, ম্যালেরিয়া, কম্প ও জীর্ণজ্বর,
শালাজ্বর, কুইনাইনে-অটিকান জর, পিত্তরোগাদি ও আসামের কালাজ্বর, এস
ক-সকলবিধ জর আরোগ্যে হইবে।

সর্বদা সাধারণকে অস্ত্রের সহিত জানাইতেছি যে, যদি এই ঔষধ সেবনে বেলা
আট-আনা নই তবে মঙ্গল ফেরত মিলে।

মূল্য—১ শি ১

প্রাপ্তিস্থান—কলিকাতা শান্তিচৌকি জরাস্তক সুখা কাছালয়, ৩৪নং অগস্ত্য রোড।
যদি কোনের ভবিষ্যৎ বাক্য এত দিনে সম্পূর্ণ হইল। ইহা সেবন
নতুন ও পুরাতন জর, প্রীতি, ক্ষত ও তদামুসলীক জর, ম্যালেরিয়া, কম্প ও জীর্ণজ্বর,
শালাজ্বর, কুইনাইনে-অটিকান জর, পিত্তরোগাদি ও আসামের কালাজ্বর, এস
ক-সকলবিধ জর আরোগ্যে হইবে।

মহাদাবক কল, পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা, ২২০ কণ্ডলালিস ট্রাট,
কলিকাতা।

100

1991

উক্ত সভাসমিতি প্রকৃতির কর্তৃপক্ষগণ
মেসিনীপুরে বঙ্গীয়-সাহিত্য সমিতির কার্যালয়ে
স্বা. সম্মত এই সন্বাদ প্রেরণ করিলে প্রথম
অনুগতীত হইবে।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

—

শাহীজা সন্মিলন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বক্তব্য রাখেন ইকবাল
 সওয়ালী। তিনি বলেন, মুক্তার বাদশাহ
 সন্মিলনের বিশেষ বক্তব্য হল 'জিহাদ'। তিনি বলেন
 ইসলাম প্রবর্তক 'মুহাম্মদ' আলি নিম্নলিখিত
 বক্তব্য প্রদান করেন।

1950年12月1日

লক্ষ্য পরীক্ষার্থীকে শিখা, দাওয়া, ক্রান্ত, শ্রী, ও
 অসীম জীবনের সত্যিকার পরিচয় দান করে
 টিকিট পাঠাইলে যে কোন ১টা প্রশ্নের উত্তর
 পাইবেন। কৃষ্ণ কবিতা সংগ্রহ হল (মুদ্রণ
 ১০০ সংস্করণ) ৫/-। ডাক্তার সাকসার সংশোধন
 ও সংশ্লিষ্ট অংশের উদ্ধৃতি ২/-। কবিতা সংগ্রহ
 (কবি শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) ২/-। বিজ্ঞান অঙ্ক
 দান ৫/-। জরাজীর্ণ বস্তু প্রকারের প্রোডাক্টের
 কাজ করা হয়। অসীম জীবন ৫/-। কবিতা
 সংগ্রহে সাকসার, ডাক্তার সাকসার, ২/-
 ও ৫/- টিকিট।
 প্রিয়দর্শিনী বসন, টিকিট বসন, ৫/-। কবিতা সংগ্রহ
 ২/-। কবিতা সংগ্রহ, ৫/-। কবিতা সংগ্রহ, ৫/-।

সচিব, বাণিক পত্রিকা ও সমালোচনা

[illegible][illegible]

গ্রাহক-প্রাধিকার, রক্ষার ব্যয়, উৎসাহ, দেওয়া হয়। বিজ্ঞাপনের, কার্য-
সম্পন্ন, প্রতি-সংখ্যার, বহু-ছবি থাকে।

বায় এও বায় চৌধুরী

२४५ (पेडावा) काजव. शेट भा. ३६ कनिकाठ।

একটি ভুলে

অকাশিত ইহতেছে

সদীত বিদ্যায় : উপায় রূপে তার মহাশয়ের কবিত্ববাহু ও শিল্প প্রতিভা
সদীত রূপ : গ্রীষ্মক বোধোদয় তার মহাশয়ের—

সর্বভাষা

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

100

10-10-68

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

SECRET

CONCLUSIONS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

অলকা

“স্বাভাৱতঃ কামৰূপৰাঃ পানপা নিতাপুণা”

কংসপ্ৰেৰী ব্ৰহ্মচৰ্য্যলীলা নিৰূপণাঃ মলিতঃ ।

কেকোৎকল্পা ভবনশিখিনো নিত্যভাষ্যকলাপা

নিত্যজ্যোৎস্নাঃ প্ৰতিকৃতভমো বৃত্তিৰম্যাঃ প্ৰদোষাঃ ॥

প্ৰথম বৰ্ষ]

বৈশাখ, ১৩২৯

[৭ম সংখ্যা]

নবীনের বাৰ্ত্তা

“অলকা” সম্পাদক

মাণ্ডবৰেখ

আজকেৰে জনকে আপনাৰ পৰেষ্ঠান
শেলুম লেখা দিতে হ'বে, যাতে আমাৰ আত্ম-
প্ৰসাৰেৰে চক্ৰে ভয়টাই বৈশী হৈয়েছে;
সাহিত্যক্ষেত্ৰে এত বৰী মৰ্য্যবৰী থাকতে
আমাকে নিয়ে টানটানি কৰা ত শোলন
সৰ ॥ তবে আমাৰ সৌভাগ্য এই যে বাধা
হাবি একটো জুকুৰ জাৰি কৰে বচন নি,
তাহলে আমাকে গাঢ়াকা দিতে হ'ত, তাৰ
জানক কৰুণ আমি যুবক, বৌদ্ধৰ চকলতা
আমাৰ শিৱাৰ শিৱাৰ বৰে ব্যক্তি, বৌদ্ধৰ
আমাৰ আমাৰ একমাত্ৰ কৈফিয়ৎ এই যে
আমাৰ আমাৰ বৰ নয়া জুকুৰ আমাৰ

আপনাৰে বাধা-ধৰা জুকুৰ মানতুম না ।

আপনাৰে “অলকা” বহুনাতিই পোহৰিত
বঙ্গদেশৰ ম্যালেৰিৱাৰ পৰা । যদিও বা
বিধে জুকুৰিত হ'ব “অলকা” বেচি থাকে,
মুঠি হ'বে তাৰ পেট ডাঙৰ এবং হাত পা
সৰু পাড়াগৈয়ে ছেপেটৰ মত, আৰু আশ্চৰ্য্য
ভেজিলা কোটি দেবতাৰ চমাইৰ চমাইৰ বৰণ
দিয়ে মাজলীৰ ৰাশ যাজ্ঞা কৰে এনে ভাৱে বৰণ
বুলেৱেৰে, ভৱসা এই মাজলীৰণ নোহোৱে
জোৱে বিন ভাৱে কিনাৰায় ধৰে বাধা বৰ
যোৱা আমাৰ দেবতা, আমি বৌদ্ধৰ
জুকুৰা, কাকোই আপনাৰে এই জুকুৰ

যদিও পূর্বযুগের পুরুষ এই ভীরুর আশ্রয়
 খুঁজছিল, তবুও পারিত। আশনারা বা
 বড়ি কামড়ান, যাকে গোপনের শপথ দিয়েছেন,
 তবুও তার আশনার শপথ থেকে মুক্তি
 নিয়ে আসে, কাভাল, বর্বরের কাছে ছেড়ে
 দে। সে মুক্তির নিখিল কেনে বাচুক, উদ্ধার
 আশনার নীচে বহিত হলে আশনের
 শক্তির হৃত হবে সে। ভীরুত্বের আশনার
 সহ বাহ্য, তার জন্মগত, এই যৌবনের কত
 নিখিল কোমলতায় তাদের স্থান নেই,
 তারা জানে শুধু আশনার কলমে
 পুরুষের পানের ছুর উঠলে তারা পারে
 শুধু তার গলা চিৎ করে।

জাতপঙ্ক শৃঙ্খলিত মিল। তার গড়বার
 সাহস নেই সে জাতভেদে পারে না, তার
 কল শুধু বীণ, জাত প্রাচীরের সহস্র
 কাটল তারই ফেঁচলা দিয়ে বোঝান। নৃতন
 পুরাতনের অলস হৃদ চলেছে, বাত প্রাতি-
 যাতেরও অলস নেই; নবীন বারা তারা কি
 এই যুগের ভরে, তাদের জন্মগত অধিকার
 যৌবনকে ভাগ করবে? দেশে আজ দিকে
 দিকে আহ্বান ছেগেছে; উদ্ধৃত, উদার
 প্রায়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যৌবন দেবতা
 ডাকে প্রাচীন গ্রীক অলিম্পিয়ান বীরের
 মাথার পাতার বিজয়মুহূর্ত-পরামর্শ-মত নবীনের
 লম্বাটে "রাত টুক" একে দিতে; মল্লিন,
 মল্লিন হোয়া, আরোনের সঙ্গে জড়ান কাগ-
 রানের লম্বার দাঁড়িয়ে বাঁচুক ডাকে
 তার সফল জ্ঞান যৌবন মিলে গিয়ে গিয়ে
 দিতে। নলে হলে বাত লোক—হুটেছে,
 বার অবিদ্যাত নেই, তার নেই যে মুক্ত,
 সে পারে ললাটে শুধু একই উপনতি—

তার তার জন্মগত পুরুষের
 নেচে বরণ শিরে নিয়ে পুরুষের
 বোধ করে।

তার সে বীরের প্রাচীরের
 সমতার বা ভীরে বাহ্যে, বরা সেবার কত
 যে উদ্ধৃত জন্মগত, তাকে নিখিল জন্ম
 আশনার সেই জন্মগত অধিকার। "অলকা"
 যদি এই জন্ম, এই অলকাগতের পতাকা
 হয়ে জন্মগত করে থাকে, হুচনা তার
 উপস্থিতি হয়েছে, চিত্তের ভিতর বার জন্ম,
 তার ললাটের চিত্তের অধিকার, তার
 অকালবাচ্যকে কেউ খোঁজতে পারবে না।

আর 'অলকা' যদি যৌবনের বাহ্য,
 প্রায়ের পরশ বুকে নিয়ে করে, বীরের
 হলে সিক্ত হবে সে আপনই বীচের। তার
 গতিতে নিখিলিত করতে হবে না, তার জন্ম
 তার অধিকার প্রায়ের জন্ম নেই। যৌবন
 আপনই তার অধিকার জন্ম হয়ে উঠবে।

দেশপুঞ্জ কত যে নৃতন প্রায়ের
 পক্ষে উঠছে, বৈদ্য ও অধুনীনের তাদের
 বিজ্ঞাপনীত, মুক্তির বাণী তাদের দেবতা
 পুঞ্জের নৈবেদ্য, প্রথম সূর্যের আলো তাদের
 জন্ম, যৌবন তাদের প্রাণ। দেশের মন্দিরে
 মন্দিরে তাদের পূজারতির ফটা বাজছে,
 তাদের শুকনানে খুঁজছে আকাশ; স্বপ্ন হয়ে
 আসছে। "অলকা" কি নিজের বুকে এই
 নৃতন পূজারীর আসন গোতে দিতে পারবে?
 নৃতন প্রায়ের এই সেবার "অলকা" যদি
 নিজেকে জালি দিতে পারে, বীরের এই
 জাপনকে যদি নিখিল করে মুক্তের জন্ম
 অধিকার বহুতে পারে, তবেই "অলকা" বিজয়,
 তবেই তার জন্ম সার্বক জন্ম।

ইতি

অলকার জন্ম

বৈয়ী

[দরবেশ]

ওরে মন, কহ শুনি সত্য পরিচয়,—
জীবনের গতি হেরি পেয়েছ কি ভয় ?

রোগ শোক দুঃখ ছালা,
অভাব অশান্তি ঢালা,
পদে পদে অপমান দৈন্য পরাজয় ;
সুখ—তা'ও দুঃখময়.
উদ্বেগ ব্যর্থতা ক্ষয়,

সত্যতার মূল্য নাই সদা মনে হয় ;
জীবনে ঝঞ্ঝাট হেরি পেয়েছ কি ভয় ?

//
ওরে মন, কহ শুনি সত্য পরিচয়,—
সবারে বাসিতে ভাল পেয়েছ কি ভয় ?

যারে নিবি বুকে ওরে,
সে ফিরে ফংশিবে তোরে,
করিবে না বিন্দু স্নেহ কেহ অপচয় ;
যা' কিছু মনের গতি,
মিটিবে না এক রতি,

হয়তো চোখের জলে বাড়িবে সংশয় ;
তাই ভালবাসা দিতে পেয়েছ কি ভয় ?

ওরে মন, কহ শুনি সত্য পরিচয়,—
মরণ আসন্ন হেরি পেয়েছ কি ভয় ?

নীতল নিধর দেহ,
সঙ্গী স্বামী নাই কেহ,
আগুনে যাজিতে মিশি হয়ে যাবে লয় ;
কেবা জানে পরপার,—
জালো কিবা অন্ধকার

কে জানে শক্তিভ ভাগো কি আছে মরুয়!

ভাই কি মরণ ভাবি পাইয়াছ ভয়?

ভয় নাই—ভয় নাই—হও নিঃশেষয়,

জন্ম—প্রেম—মৃত্যু—এই তিনে নাই ভয়।

জন্ম যে প্রেমের লাগি,

বিশ্বের চকিতে ভাগী,

প্রেম মরণের মাঝে লোভে চিরজয়;

মরণ সোহাগ ভবে,

জীবন বরণ করে,

এ তিনের যে নিশ্চয়—সে মঙ্গলময়;

জন্ম—প্রেম—মৃত্যু—এই তিনে পবিত্রয়।

ইউরোপীয় সাহিত্যে বিচারের মাপকাঠি।

[অধ্যাপক বিহারেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এম. এ]

আর্ট বা শিল্পের জগৎ সংস্কৃত হ্রস্পতা, ভাস্কর্য, চিত্রাঙ্কন, মঞ্চাভিনয় ইত্যাদি বলা যায়। নাট্য কলা, বাগ্ম্য ও নৃত্যের মধ্যকার আর্ট হিসাবে ধরা যায়। কামরূপ ক্রমোন্নয়ন, তীর্থা, সাক্ষর্য ও চিত্রকলায় একই ধরনের আর্ট আছে। আমরা ইতালির আর্টের কারি কার-এগুলি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কাছে লাগে। Hegel বলেন সাহিত্যের আশ্রয় মনের উপরে। কবিগণ কবিতা, উপমা ইত্যাদি শিল্প আমাদের মনে বর্ণের আনন্দ নিয়ে মনকে দোলা দেয় মাত্র, কিন্তু সাহিত্য আমাদের মানস রাজ্যে এমন একটি আনন্দ লোকের সৃষ্টি করে যাতে ভাষার প্রকাশ করা যায় না। মনে হয় এই কাজই মনীষী

Hegel সাহিত্যের আশ্রয় অন্তর্ভুক্ত আর্টের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

গ্রীক পণ্ডিত Simonides বলেন "Painting is silent poetry and poetry is painting that speaks"—চিত্র নীরব কাব্য, এবং কাব্য এমন চিত্র যাতে নিজেকে ভাষার প্রকাশ করে। হ্রস্পতা Parthenon, St. Peters বা মন্দিরগুলি ভাস্কর্যে Athene Parthenon, Venus of Milo, Laocoon বা ধার্মিক চিত্রে Raphael এর Madonna বা অজ্ঞান চিত্র, বর্ষাভে Beethoven বা বানসেনে যে আনন্দলোকের সৃষ্টি হয় নি, এ কথা বলিলে সত্যের অবমাননা করা হয়।

সৌন্দর্য্য এই শিল্পকলায় বিকশিত হয়ে উঠছে, এক চিরদিনই জগলি ভাষা দেয় করে কল্পিত দেবে। কিন্তু এ কথা কি সত্য নয় যে এই সব আটের উপাদান বরষিক মূল্যবান মাত্র। এই হিসাবে সাহিত্য মানসে স্থায়ী। সত্যের কাণ্ডের ভিতর দ্বিষ্ট মরনে পশিদ্ধা আচার আনন্দ দেয়, সত্যের দ্বিষ্ট ইচ্ছারের দ্বার দিয়া ভাষাকে পৌছিতে হয়। কিন্তু সাহিত্যের রস একবারে মনকে ডুবিয়ে দেয়। এই খানেই সাহিত্যের বৈচিত্র্য ও বিশেষত্ব। আর সব প্রণেয় এত একই সাহিত্য আনন্দের অল্প লোকের সাহিত্য পবিচয় করাইয়া দেয়। আর যবে পাই সীমার আনন্দ, সাহিত্য দেয় অনীমের আনন্দ।

কবি কালের গন্তী মানেন না, দেশের সীমার সব বন্দ না। তাঁর মোক্ষ তুলিকায় বৃদ্ধ, (মন্টো), Montaigne সজীব হইয়া উঠেন, Babylon, Athens, Alexandria ইত্যাদি আনন্দের ভাষার মাঝে ভাসিত উঠে। বিশ্বমানের দৃষ্টান্ত চিত্রা ধারণে যে সাহিত্যের কষ্টি ও পুষ্টি।

Goethe বলেন "a traveller does not take anything out of Rome which he has not brought with him" তিনি রোমে যাবেন তাঁকে সেই বস্তুর কীরে নিয়ে যেতে হবে যা তিনি সঙ্গে এনেছিলেন। ঠিকই ও আমরা যা ভেবে যাই, তাই তা পাই। মনে পড়ে পুরীতে একবার রান গাত্রাব সময় গুণ্ডে পেলুম আমায় পাশের দুটি বুধক বলাবলি

কাজে "পা পুজা" ঠাকুর ক'টাকে যদি দেখে
একটা পাখোয়াজ ও একটা তবলা বৈঠা
কবি। থায়া জিনিষ মনে। আবার কালের
চাষি পাশে নয়নারীর মুখের দিকে ভাবিতে
দেখি সেই কপলীন নিম্নাকাঠের ঠাকুর
দেখিরাতি ভাষারের নরনে ফলপারা। আবার
সামনেও ঠাকুরটি ও মন্টো টেলি, আসল
ঠাকুরটির আসন যে আমার মনে।

কাব্যের রস অনন্তর করা যায়, কিন্তু
যদি কেমন কোবে দেখান যায় না। তাব কে
কপ দেওয়া বসন্ত নয়। কাব্যের সৌন্দর্য্য
মনকে আঁকড়ে করে, এখন একটি কপ
সৃষ্ট করে যাতে আর কোন উপাদানের
প্রয়োজন হয় না। বলাবলিই পরম
আনন্দ।

এখন জেবা বাড়িক সাহিত্য বিচারের
রীতি। Plato বলেন সাহিত্যের সঙ্গে
ভুক্তি ও জ্ঞানের যোগ থাকা চাই।
সাহিত্য আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে কি
ভাবে সৃষ্ট করে ও সংকে কি রূপে প্রকাশ
করবে তার দ্বারা সেই জগৎ বিচার
কাব্যে হয়। তিনি গ্রীক সাহিত্যকে
আদর করিতে পারেন নাই কারণ Attic
নাট্যকারেরা অদৃষ্টের জর বোষণ কোর্বেছিলেন,
জন্মের জর নয়। মনে হয়, Plato একটু
ভুল কোরেছেন। প্রথমতঃ জগতে সর্বত্র
দৃষ্টের জর হয় না। আমাদের Intuition
ও সেই দৃষ্ট জরী বহু। দ্বিতীয়তঃ ইঞ্জিয়
(Senses) দিয়া সত্য অবধারণ এক বহু
এবং চিন্তার (Ideas) দ্বারা সত্য প্রকাশ
আর এক। অর্থাৎ Logic ও আটের
যদি কেমন তিনি তাহা দেখেন নাই।

তার মত সাহিত্য আমাদের ভাবুকতাকে
 করে দেয়। Intellect বা বুদ্ধিবৃত্তিকে
 প্রকাশ করে। এক কথার সহ্যকে প্রকাশ
 করেই সাহিত্যের উদ্দেশ্য এবং এই সাহিত্যটি
 দ্বারা সাহিত্যের দোষত্রুটি বিচার করা উচিত।
 Aristotle এর Poetics বহুখানা সম্প্রদায়
 সাহিত্যে "কাব্য প্রকাশের" মত—সাহিত্য
 সমালোচনার মূল স্বতন্ত্রতা উহাতে পাওয়া
 যায়। তার মতে সাহিত্য অনুকরণ বা
 পুনরাবৃত্তি মাত্র। ইহাতে বস্তু (Plot) চরিত্র
 (Character) ভাষা (Diction) এবং ভাব
 (Sentiment) থাকে এবং নাটক ইত্যাদি
 সম্বন্ধে ও নাট্যকলায়ও বিচার কোড়ে হয়।
 তিনি বলেন আটবে উদ্দেশ্য আনন্দদান
 বিজ্ঞানের চুলচেরা সত্য ও আটবে সত্য
 অনেক প্রভেদ। আটবে ঘটনা অপেক্ষা বস্তু
 নীর যোজনা ও প্রকাশের প্রয়োজন বেশী।
 এখানেই ইতিহাস ও কবিতার পার্থক্য মনে
 পড়ে। ইতিহাসিক সাহিত্যে যে "সত্য"
 কাব্যে যে "কল্পিত" বস্তু ও "কল্পিত" চরিত্র
 সত্য সাহিত্যিক মত ও সত্য (particular),
 কাব্যের সত্য বিশ্বজনীন (Universal)।
 তিনি Tragedy বা বিদ্রোহ নটক
 সহজে বলেন যে কোন Tragedy এর আভাস
 নয় দেখিলে আমাদের এক কথার সাফল্য
 (Excess of emotion) হতে বস্তু
 পড়ে। যখন তাই, "অতি" ও "অল্প" ও
 "বীৰ" নহে" এবং "কষ্ট" ও "অসুখ" হয়।
 সাহিত্যের এর "অল্প" ও "অসুখ" পক্ষে
 দেয়।
 যোশেফ ও ক্রিস্ট (বিশ্ববিদ্যালয়)
 উল্লেখিত। Cicero Quintilian Hor-
 race ও Longinus এর "On Sub-
 lime" এর ইহার পক্ষে ও "কিন্তু"
 Aristotle এর উপর কোন কথা সত্যকার
 সাহস এখন ছিল না। ইউরোপেরও মত
 যুগে Aristotle ছিলেন প্রাণবাক্য। Ren-

aissance বা নব্যযুগের দিন—
 বেদীতে বসেছিলেন Plato
 আধুনিক যুগে অষ্টাদশ শতাব্দীর
 Addison Milton এর Paradise Lost
 বিচার করিবার কালে একটা কথা
 বলেন যে আটবে প্রাচীন কালের
 কল্পনা প্রকৃতিক জগৎ হইবে। এই কল্পনার
 বলেই কল্পনা কারাগারে পড়ে ও এই কল্পনা
 আঁকাজ পারের বাহা ছিল।
 তিনি ইচ্ছা করেন যে কোন কল্পনা
 প্রকৃতিকে সাজতে পারেন, কারণ সে কল্পনা
 তাঁর নিজের হাতে। বেবল একটি কথা মনে
 রাখা ছাড়া যে খুব রাজদায়িত্ব কোয়ে হস্তা-
 স্পদ হইতে হয়। কল্পনা কাঁচা কোড়ার
 মত লাগ হইতে উঠিলে—বা "পায়ে চাপে
 মারি" ছাড়াই খুব কষ্টসাধ্য হইতে চাপটা
 হইতে গেলে হইবে। পক্ষমূল original মনে
 নাই, কিন্তু কালিদাসের সঙ্গে মোটেই মেলে
 না। কল্পনাকে জাগ্রত কোষের শক্তিই কাব্যের
 প্রাণ এবং প্রাণেই সাহিত্যের অনন্ত জীবনের
 প্রাণজন্ম হয়।
 অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে (১৭৩৬)
 লেভন জর্জান পণ্ডিত L'engle
 "than the Wise" এর সঙ্গে লোকেরই
 "যে আটবে" L'engle এর দ্বারা সাহিত্য বিচার
 এর পক্ষমূল স্থাপন করেন। একটা গল্পের পাণ্ডিত্য-
 পূর্ণ পুস্তকের সংখ্যা খুব কম। L'engle
 নামে প্রসিদ্ধ ভাবধারার উপর কাঁচা কোয়ে
 বিচার কোয়েছেন। Virgil এর Aeneid
 এর দ্বিতীয় সর্গে L'engle এর চিত্র দেখান
 হয়েছে, যেখানে দোঁড় পুত্র L'engle
 জর্জার নিষ্ঠুর পীড়নে জাহাঙ্গীর জাহান।

ভাস্কর এই রূপটি আমাদের চোখের সামনে ধরেছেন। কিন্তু মূর্তিতে চীৎকার দেখান যায় না। কয়েকই ভাস্কর Laocoon এর মুখে তীব্র বেদনা ও নিরাশার মাঝে একটা হৈহা প্রকাশ পাচ্ছে। Laocoon এর সর্বনাশ হয়েছে, চোখের সামনে সপা যাচ্ছে ছই পুরে মরণের কোল চলে পড়েছে। সর্প Laocoon এর সর্বনাশ জড়টির তাহাকে পিষিয়ে মারিতে বাইতেছে, কিন্তু Laocoon হার মানলে না, শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত নিষ্ঠুর অদৃষ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল। 'মনসার ভাসানে চাঁদসদাগরকে মনে পড়ে, Lessing বলেন ভাস্কর Virgil হইতে ঘটনাক্রমে নিয়েছেন, কিন্তু আটটি তা'কে নূতনরূপ নিয়েছেন। জনতে পণ্ডিত Shakespeare তাঁর আখ্যান বস্তু নিয়েছিলেন Holinshed's Chronicles ও Plutarch এর জীবনী সংগ্রহ হইতে। রবীন্দ্রনাথের 'প্রাঙ্গণ' 'অদিস' প্রভৃতি উপনিষদ বা অবদান করলেন তা' নিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা অতীতের কালক্রমে এমন রূপ দিয়াছেন—এই কঠিনীর মধ্যে আর্ট এমন সূত্রে উঠেছে—যা মূলে নাহ। Quarry (পাথরের খনি) ও finished statue বা মূর্তিতে তফাৎ—এমন এও তেমনি। আর্ট বস্তুটি কি এইখানেও ধরা যায়।

Lessing এর সঙ্গে তুলনা হয় Aristotle এর বেদন Platonr সঙ্গে মেলে Victor Cousin ভিক্টর কুসে ১৮১৮ সালে Du Vrai, du Beau, et du bien (সত্য, সুন্দর ও শিব) নাম দিয়া কয়েকটি বক্তৃতা দেন, ১৮৩৩ সালে ইহা পুস্তকাকারে বাহির হয়। তিনি বলেন আর্টই বা শিল্পীর

পূর্ণ প্রত্যবেশ (Ideality) মধ্যে যে ভাব বা Idea আছে তাহাকে প্রকাশ করা অনেক ছাটিয়া অনেক বাছিয়া তবে এই ভাবটাকে প্রকাশ কোত্তে হয়। কারণ এই ছাটি ও বাছার (Omission ও Selection) শক্তির নামই আর্ট। আর্টের উদ্দেশ্য বৌদ্ধিক সৌন্দর্যের সাহায্যে নৈতিক সৌন্দর্যকে ফুটাইয়া দেওয়া। এক হিসাবে আর্টের শক্তি প্রকাশের ক্ষেত্রে বলা, কেন না আর্ট Pathos বা একাগ্রতা বিচিহ্নরূপে প্রকাশিত হইবে এবং এই Pathos এর দিক দিরাই বিচার হইতে হয় শ্রেষ্ঠ আর্টের কলাই। এখানে এক কঠিপাথরেরই সৌন্দর্য নিচির কোত্তে হয়।

Wordworth বলেন কবি এর বড় কবি বা সাহিত্যিককে একটা অগণিত ভোগ কোত্তে হয়—সেটা সৌন্দর্য বোঝান। সাধা প্রকার মাকে যে মন ধোবে তাহা নতুনকে নিজে চায় না। সেইজন্য প্রথমে একদল পাঠক প্রেরী—কাজে হয়, সেদের মনে (suggestion) জাগরিত হয়, তবে এখন আদর মান্ হইতে আনন্দ পান্। কিন্তু সঙ্গী সমাজেও কোন কখনোকে প্রাণেরে দুঃখেরে হবে না, সাধারণ পাঠক ধরিতেও মনে আনন্দ দিতে হবে।

Mathew Arnold এর মতে কবির সাহিত্য সেই যগের সমস্তটা যিনি কোত্তে হয় অর্থাৎ কবির প্রকাশের মতে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গত নির্ণয় করা গাই। উদাহরণ স্বরূপ তিনি Grayর কথা উল্লেখ কোরেছেন—Grayর মতিত যে যুগের কোন সম্বন্ধ ছিল না কাজেই তাঁকে একলাটি

কবিতা কেবল কবির নিজের জীবনকে বর্ণনা করে না, বরং তাঁর জীবনের প্রতিচ্ছবি। তিনি আর একটি কথা বলেন—Poetry is the criticism of life—কবিতা জীবনের সমালোচনা মাত্র। কবির ধর্ম আমাদের মতো দুঃখের জীবনটাকে বুঝিয়ে দেওয়া এবং বিনিময়ে পরিমাণ এই কথাগুলো বুঝিয়ে দেন তাঁকে সেই ভাবেই আমরা বিচার করি ও তাঁর কবিতা শক্তির পরিচয় পাই। Wordsworth যাকে বলতে চান “The breath and finer spirit of all Knowledge.”

Ruskin ও William Morris এর মধ্যে দেখি Platonের আদর্শ নীতিবজ্জিত আর্ট মিথ্যা এই—কথাটা Ruskin বার বার বলেছেন। তাঁর মতে জ্ঞানের জন্য মানুষের প্রবৃত্তি (Passion) ও আশার মধ্যে। সেই আটই সব চেয়ে বড় বাহ্যতে বেশী ভার আছে (which contains the greatest number of greatest ideas)

আমরা আর একটি কথা প্রায়ই শুনে পাই Art for Art's sake. বোধ হয় Theophile Gautier এই তত্ত্বের জন্মদাতা এবং Swinburne ইহার প্রচারক। Swinburne বলেন, ‘কোন একটা কবিতা বৃথা হোলে ইহার উদ্দেশ্য বা নৈতিক অর্থ দেখিবার প্রয়োজন নাই। সব বড় কবির ভিতরে একটা সুন্দর সামঞ্জস্য (Harmony) ও আধ্যাতিক জীবনের আভাস আছে,—তাঁহার মানুষকে কী বলতে চান না এবং কখনই তাঁহার শক্তি বাহ্যিক উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। কবির প্রতি

অবিচার করা হয়। কেবল কোন কবির মতের মধ্যে কোন সমালোচকের মত যেহেতু না বা জনসাধারণের মতের সহিত বিরোধ হয় বলিয়াই যদি কোন কবিতা বা অল্প কোন সাহিত্যটিকে প্রাসঙ্গিকি মিত্র ভাষাতে প্রাসঙ্গিকবর্ণের মতটাই প্রকাশ পায়। ‘জীবন পত্র’ ‘চিরায়ত’ ‘যদি রাইরে’ এমন কি ‘শিকার মিলন’কে বুঝতে না পেয়ে আমাদের সাহিত্যে কত আবক্ষনা আছে! আমরা ‘ভাল লাগে না’ অতএব ‘সকলের ভাল লাগা উচিত নয়’—এটা বোধ হয় Neo-Platonism। এই কারণে Christalul, Ode on immortality বা ‘সোনার তরী’কে অপসৃত মনে হয়। এবং আমরা দেখতে যদি ভুলি, তবে তাই কবিতার। এই জন্য Shelley তাঁর কবিতার একটা Glossary of words তৈরী কোতে বলেন। তবু হয়, একদিন প্রবীক্ষনাথকে ও হরত পাদটীকা দিতে হবে। এককালে Southey, Wordsworth ও Kingsley সমালোচক সমালোচকের ভরের কারণে হয়ে উঠেছিলেন।

Mrs. Browning তাঁর Aurora Leigh এর এক প্রস্তাবে বলেছেন “The poets are the only truth teller left to God”—অর্থাৎ ‘চলমানের রাজ্যে কবিতা সত্যপ্রদ। সেইজন্যই তাঁকে প্রকাশ কোরবার ভার তাঁর উপর। আমাদের কবিতার অল্প নাম কবি—তারা ছিলেন সত্যপ্রদ, নব্বের মধ্যে সত্যের প্রকাশ প্রকাশ কোরেছেন।

Meredith এর Diana of the

Commonwealth এর অনেকটা কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেন সাহিত্য সেই মানব সার্বিক যখন তাহা আলোচনের ক্ষিত্রের সাম্প্রতিক জাগরণ দিতে পারে। তা তুমি দিয়ে গুব কই করনা কোরে কোন ছবি আঁকিলেই হয় না। কারণ চোখের দৃষ্টিতে ত মাহবের অন্তরের স্থা ঘেটে না। কোন স্থলী বর্ণনা পাড়তে আমাদের সারা চকল মন বন হাঁপিয়ে উঠে। সেইজন্য বিনি প্রকৃত ববি যেমন Shakespear, Dante বা রবীন্দ্রনাথ একটি কি ছটি লাইনে চিত্রটি আমাদের চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলেন।

এই প্রসঙ্গে Schlegel, Sainte Beuve, Dowden, Raleigh, ও Bradleyর উল্লেখ প্রয়োজনীয়। কিন্তু বাহুল্যভয়ে চাপা দিলাম। তবে আমাদের মনে হয় সকলের মত একত্র করিলে এই সত্যটিকে সার্বজনীন মনে করা যেতে পারে—
The supreme test of merit is agreement with the general sense of mankind অর্থাৎ যখন কোন সাহিত্য বিশ্বমানবের চিত্তজন সত্যটির সঙ্গে মিলে তখনই বুঝিব সেই সাহিত্যের গুণ। কারণ তাহা বহুলোকের আনন্দের উপদান।

বর্তমান সাহিত্যের দিকে তাকাইলে আমরা দেখি যে ইহা আমাদের বৈদ্যনিক জীবনের সহিত কিরূপ ওগোড়াভাবে জড়িত। এখন দেখা যাউক যে সাহিত্যের কোন কল্পিত পাত্রের মাজিয়া সাহিত্যের দোষ-গুণ বিচার কোন্ডে হয়।

প্রথমতঃ দেখিতে হয় সাহিত্যের নূতন সৃষ্টিটি

বিচারককে পাত্রের বস্তুটি দিয়া এবং ইহা আমাদের জগৎজীবন দর্শনকে তাড়াতাড়ি হ্রাস কিংবা বৃদ্ধি সাহিত্যে আমাদের বাস্তব জীবনের সহিত কোন সম্পর্ক নাই এবং যদি সার্বজনীন ও বাস্তবিক কোন দৃষ্টান্তে পল্লবিত করে তাহাতে বড়ই অষ্ট। কারণ না কেন তাহা ভ্রান্ত—কতকটা বাস্তবীয় সত্য। এই হিসাবে ‘পদ্ধতিক’ ও ‘গৃহদাহ’ সার্বজনীন।

দ্বিতীয়তঃ আর্টের দৃষ্টান্ত অথবা ভাব (idea) প্রকাশ কোন্ডে হয়। লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সহিত তাহার সমাজ ও জাতির সঙ্গে একটি অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ আছে কিনা দেখতে হয়। এক কথায় ব্যক্তিগত (particular) অভিজ্ঞতার সহিত বিশ্বজনীন (Universal) অভিজ্ঞতার যোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। রমেশ চন্দ্রের ‘সমাজে’ বা প্রভাতবাবুর ‘সিন্দুর কোটার’ প্রাচ্য নাই।

তৃতীয়তঃ সমাজের বা জাতীয় সমাজের গুণসম্বিত অভিজ্ঞতার মূল। সেইজন্য সাহিত্যিকের হাতে বুদ্ধি ব্যক্তিকের লাঞ্ছনা দেয়া ও পাত্রের জর দেয়া আগে বড় আপাত লাগে এবং এ দ্বারা সমাজের মঙ্গল হয় নয়, সেইজন্য তাহা বের। জাতীয় জীবন ও সাহিত্যের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন জীবিত বদান। বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করি।

চতুর্থতঃ সাহিত্যের কাটামো বা Symmetry বিচার কোন্ডে হয়, কথার মলে মনি কল্পনের যোগ, noble words set to perfect music। শুধু ছবিখানা ভাল হলেই চলবে না, তাব d'rame খানাকেও ভাল কোন্ডে হবে, তবেই ছবির সৌন্দর্য্য

খুলবে। সাধারণ সৌন্দর্য্য এক একটা
সত্য বীজের দ্বারা সমুৎপন্ন থাকে—কখন
সৌন্দর্য্যের ‘কণিকা’ রজনী সেনের ‘অমৃত’
সংগ্রহে দেখি কায়ামের জলে হাসিলী উপ-
দেশকালি কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।
সেখানেই শিল্পীর বাহ্যচরী যখন তিনি কোন
কথা না বলে কেবল ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দেন। এই
‘না বলা’র (Suggested বা Implied)
সৌন্দর্য্য যে আমাদের কাছে সব চেয়ে বড়।

ভাবা ভাল হওয়া চাই। হাবার দোহে
Robert Browning—বিশেষতঃ তাঁর
Sordello—অনেক সময় অবোধ। ভাবার
দোহে Tennyson কত মনোহর বর্ণিত
আমরা স্বীকার করে চম্পলিতায় Brown-
ing এর স্থান অনেক উচ্চ।

পদ্ধতিঃ—সাহিত্যে আদর্শ ও জীব (Idea-
lisation) বিশেষ কোরে বিচার করা
সবকার। সাহিত্যের কাজ সৌন্দর্য্য সৃষ্টি
করা (objective) কিন্তু তার চেয়ে ও
বড় কাজ আমাদের আনন্দ দেওয়া (sub-
jective). Bacon বলেন ন্যাক নৈতিক
উদ্দেশ্যে সাহায্য করে এবং মনোহর সঙ্গী
তার প ও হ’তে সৃষ্টি দেয়।

এখন মোটের উপর দেখা গেলে যে
সাহিত্যে যখন সত্য উপলব্ধি করি তখন
কিছু তথ্যের বস্তুভাগ (matter) সুলভ,
কাঠামো বা ভাবের বীজনি যখন ভাল লাগে
তখন বস্তুতে হইবে রূপটি (manner)
কেন মনোহর হয়কে এবং যখন সামান্য
মুগ্ধ হই তখন বৃষ্টি সাহিত্যিকের মনে জাবের
রূপটি (Idealisation) কেমন সহজ
হয়। ছন্দ (Rhyme) ও রচনার
রীতি (Style) সবচেয়ে দুটো কথা বলে
এ প্রবন্ধ শেষ কোরে চাই।

ছন্দ আমাদের কীভাবে সর্বদা সোলা
দিয়ে। ধুমপাঞ্জরির গান শুনে শিক্ত হালের
কোলে ঘুমিয়ে পড়ে, রাজনার তালে তালে পা
কেল সৈনিক ময়মের বুক কাপিতে পড়ে।
আমাদের বাড়ীতে আমাদের বন্ধপদনে
সেই ছন্দের শোণ। প্রতি নিখাস প্রাঙ্গণে
সেই মনস্ব জনের লীলা আবহমান কাল
চলে আসছে। কারি তার ছন্দ দিয়ে আশা
দর অন্তরে বীজের অঙ্কার জোড়েন বলিষ্ঠ
তিনি আমাদের এত প্রিয়।

উপজ্ঞান, নাটক ও প্রবন্ধের মধ্যেও
একটা গতি আছে—আমরা বেশ আমাদের
মনকে জুলিয়ে দিয়ে যায় এই প্রতিবেশ
মান হয় ইহার নামই Style. কিন্তু এই
Style জিনিসটা কি অমূল্য করা যায়,
বোঝান যায় না। Raleigh এর জার
কল্পিত সাহিত্যেররী Style প্রধান। এমন
অপূর্ণ হয়ে যে Arnold Bennett মুগ্ধ
হয়ে বলেছেন যে বস্তুমান ছাপাতে না দিতে
যদি চাওঁতে দিতেন ও ছাপাতেন একটা
উপকার হোত এবং তার প্লেমও অকল্প
পাওঁতে। এই Style জিনিসটা পরিষ্কার
কোরে বুঝান বড় কঠিন। যেমন সঙ্গ
দেখে কোন লোককে চিনতে পারি, কোন
জাতির শির বা স্থাপত্য দেখে সেই জাতির
Culture এর পরিচয় পাই সেইরূপ The
style is the man. অর্থাৎ যে যেসে
লেখক পাতকের কাছে ধরা দেন সেইটাই
তাঁর Style.

উদাহঃ—Temple Classics এর
একখানা খুব ছোট কিন্তু বেশ ভাল বই—
Worsfold's judgement in Liter-
ature এই প্রবন্ধের মূল উপদ্রষ্ট।

ময়ূরপুচ্ছের মহিমা

[ঐশাণিক উদ্ভাটন্য বি এ, বি টি]

ই আই রেগারের একটা মাঝারি গোর্ডের ষ্টেশনে একখানি ডার্টন প্যাসেঞ্জার ট্রেন থামিবার জন্য এক ভদ্রলোক খুব ব্যস্তভাবে গাড়ীর মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণীর কামরাগুলি খুঁজিতে লাগিলেন। সে দিন পূজার ছুটির শেষ দিন; ট্রেনে অসংখ্য ভীড়। তিনি আরও একটু দৌড়াদৌড়ি করবেন, এমন সময় ট্রেনের সিটি পড়িয়া গেল। অন্য দেরী করা চলে না। লম্বুখেই ইংরাজীতে কেবল হুয়ুরোপীয়ানদের জন্য থা একটি ছোট কামরা একেবারে খালি দেখিয়া ‘হুগা’ বলিয়া ভদ্রলোক তাহাতেই উঠিয়া পড়িলেন। ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

ভদ্রলোকটির বয়স বৎসর দ্বিশ কি বত্রিশ হইবে। ‘পরে’ নামাধীন। দেশীয় পরিচ্ছদ। এক হাতে মাঝারি গোর্ডের একটা বাগ, অন্য হাতে একগাছি মজবুত পড়ি—হাতাকে ছোটখাটো লাঠিও বলা যাক্তে পারে। ইয়ুরোপীয়ানদের কামরায় উঠিয়া বোধ হয় মনটা তাহার একটু খুঁত খুঁত করিতেছিল, তাই ট্রেন ছাড়িয়া দিলেও তাহা ব্যস্ত এখার পথায় বায়কথক প্রকাটয়া ভাবে দ্বিগুণ হইয়া বসিলেন।

কতকগুলি ষ্টেশন আসিল ও পার হইয়া গেল। বর্ধমান ষ্টেশনে গাড়ী অনেকক্ষণ থামিয়া যখন ছাড়িয়া দিয়াছে এমন সময় অপর একজন আরোহী সেই কামরার উঠিয়া পড়িলেন। “Shall be back to-morrow”

(কাল ফিরিব)—কথা কয়টা জাহাজে বলিয়া ছয়ার বন্ধ করিয়া লোকটি ইংরেজী পড়িলেন। আরোহীট দেবীর ফিরিঙ্গি টীকা কয়েকের জাতীয়, বোধ হয় “ব্রাহ্মী ছুটি” লইয়া কাঁধী দ্বিগুণে কলিকাতা বাইতে ছিলেন।

‘হির হইয়া’ বসিতেই কামরারটির এককোণে উপস্থিতি বাঙালী ভদ্রলোকের প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল। ফিরিঙ্গি যুবকটির একটু হুস-মোহ ছিল। ভদ্রলোকটির বাঙালী পরিচ্ছদে প্রতি লক্ষ্য করিয়া তিনি ইংরাজীতে কিছুকি কহিলেন, “কুমি কি ইয়ুরোপীয়ান?”

বাঙালী ভদ্রলোকটি বিনীতভাবে উত্তর দিলেন—“জাঙ্কে না, আমি ভারতবাসী।”

“তবে এ কামরার উঠিয়াছ কেন? জাননা কি ইহাতে শুধু হুয়ুরোপীয়ানদের ইতিবাচক অধিকার?”

“জানিতাম, কিন্তু অল্পজ কোথাও উঠিবার স্থান পাই নাই এবং জানার এই টোপেই যাত্রার বিশেষ প্রয়োজন সে কল ইহাতেই উঠিতে বাধ্য হইয়াছি। তাহাড়া ইহা এক বাবে খালিও ছিল।”

“যখন খালি ছিল, ইহাকে খালি রাখা উচিত ছিল—অন্ততঃ যতদূর আমরা পারা উঠিবার। তোমাদের জন্য সমস্ত গাড়ী খানা ছাড়িয়া দিয়া হইয়াছে। এক দ্বিগুণে তোমাদের সন্তত কিছুতেই আমাদের মিল হইতেছে না।”

“এইকি! কতকাল মিল হইবেও না, কারণ

একজন পানপানিভোগ্য মিলনের পান টিউবেরই
কম করিয়া দাখিল।

সাহেব এখার চুটিয়া গেছেন। মেয়ে
পড়িত জিজ্ঞাসা করিলেন—এই কল্যাণের জন্য
কি করিয়া লাভ করিলেন ?

ভারতীয় বাদী ও ইউরোপীয়ান বাদী
দুইজনের জট বিড়ির একতরফে ব্যবস্থা দেখিয়া।
করিয়া দেখুন কত লোক স্থানান্তরে টিপনে
পাড়িয়া গিয়াছে, আর এই ইউরোপীয়
কখন কোন ইউরোপীয়ান, আরেকজন এই
একজন পান পানি পড়িয়া থাকিবে। আর
কি আশা উচিত মনে করেন ?

“নিশ্চয় কবি।” তেমনি বক্তৃতা দাখিল
শোনা গিয়াছে। এখন তো বলিবার লোক
হইরাছে, এখন তুমি নাসির বাইতে পার।

তত্ত্বলোকটি কখন হাসিয়া উত্তর দিলেন
—“মাপ করিবেন, এখন তো নাথিবার
অধিকার নাই।

কখন হইরা সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—
কখন তোমার অধিকার হইবে ?

“যতদূর পৌছিবা মাত্র।”

এবার সাহেব কোণে জলিয়া উঠিয়া
বলিলেন—“একটা মাঝারি ট্রেনে থামিবা
মাত্র যদি জেদ্দাকে জোর করিয়া নামাইয়া
দিয়া।”

তত্ত্বলোকটি বিনীতভাবে উত্তর দিলেন—
“আমার ক্ষমতা নাই।”

তত্ত্বলোকের বিনীত কিন্তু কিঞ্চিৎ
পরিচয় পূর্ণ উত্তর জানিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ
হইলেন সাহেব জেদ্দাকে আর কোন কঠিন
কর্তব্য বলিতে পারেন করিলেন না। মনে
মনে হির করিলেন, যে ট্রেনটির গাড়ী অত্যন্ত
একটি থামিবে সেখানে নাসির গার্ড
হইবে। সাহেব জেদ্দাকে নামাইয়া দিয়া

নাসির জেদ্দার জন্য করিলেন।

কখন কখন একটি পানি। একজন কল্যাণ
গে। সাহেব পানি জেদ্দার জন্য করিলেন।

জিজ্ঞাসিত পানি আশিরা আশিলা সেখানে
জিনিব পানি জেদ্দার ও আশিলা জেদ্দার
জিনিব পানি জেদ্দার জেদ্দার জেদ্দার
জিনিব পানি জেদ্দার জেদ্দার জেদ্দার
জিনিব পানি জেদ্দার জেদ্দার জেদ্দার
জিনিব পানি জেদ্দার জেদ্দার জেদ্দার
জিনিব পানি জেদ্দার জেদ্দার জেদ্দার
জিনিব পানি জেদ্দার জেদ্দার জেদ্দার

তত্ত্বলোকটি জেদ্দার দিকে একটু
সরিয়া আসিয়া সাহেবের কিংগপটি লক্ষ্য
করিয়া বৃদ্ধ হইলেন। একটু পরেই দেখা গেল
সাহেবের দিকে জেদ্দার জেদ্দার জেদ্দার
জিনিব পানি জেদ্দার জেদ্দার জেদ্দার

তত্ত্বলোক নিশ্চিত মনেই বলিয়াছিলেন।
গার্ডকে লইয়া সাহেব জেদ্দার কামরাটির
কাছাকাছি পৌছিতে তিনি ব্যাপ হইতে
একটি জল পাতলুন বাহির করিয়া দ্বারে
দ্বারে গারে আরম্ভ করিলেন।

একটু পরেই মশকে হুয়ার খুলিয়া দিয়া
সাহেব বলিলেন—Here is that ob-
stinate fellow (এই দেখুন সেই এক-
গুণে লোকটা।)

একগুণে লোকটার পাতলুন তখন হইয়া
পর্বত উঠিয়াছে।

গার্ডসাহেব চক্ কপালে তুলিয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন—what are you doing ? (একি করিতেছ বাবু ?)

বাবু বৃদ্ধ হইয়া উত্তর দিলেন—
just becoming a European (এই সাহেব ইংলান্দ আর কি।)

গরজন করিয়া আরোহী সাহেব বলিলেন

—What the devil do you mean by that? (কি মানে এ কথা বলবার ও কি?)

কোনও কথা থাকুক—তুমিই নাহি।
করোনা?—নাহি। যখন বলিবে—“আমি
এ আমি চিনিই জানিহেন।” যেটুকু তখন
হি—নাহি। পরিচয়—তাহা এখন বুঝা
গিয়াছে। এখন আরও কি আমার সল
আমার অগ্রিম হইবে না। আমার ভিতর

কোনও কথা থাকুক—তুমিই নাহি।
করোনা?—নাহি। যখন বলিবে—“আমি
এ আমি চিনিই জানিহেন।” যেটুকু তখন
হি—নাহি। পরিচয়—তাহা এখন বুঝা
গিয়াছে। এখন আরও কি আমার সল
আমার অগ্রিম হইবে না। আমার ভিতর

সামনে পার্থক্যের দ্বারা উপস্থিত
হইতে চাহিলে পার্থক্যের দ্বারা উপস্থিত
হইতে চাহিলে পার্থক্যের দ্বারা উপস্থিত
হইতে চাহিলে পার্থক্যের দ্বারা উপস্থিত

Now, there is no help for
Smith-1

দূরে

[শ্রীগিরিজা কুমার বসু]

চুপ-চুপ—কহিও না কথা ;
এ নাম এনোনা মুখে কারো যদি বাজে বুকে
থাকে কেহ অধোমুখে
শুনে পায় বাধা।

কার তাতে কিবা আসে যায়
আমি যদি চিরদিন থাকি দূরে দীনহীন
বেদনায় বিমলিন
নির্লীন ধূলার।

তা'রা আজ হ'য়েছে তো সুখী
জৌখো জৌখো হ'লে পরে পলাইত তারা স'রে
রহিত বিরাগভরে
হ'লে মুখোমুখী

যায় যায়! মাথা খুঁড়ে ব'লে
তু'টো কথা কহি পাছে অসিত না তাই করে
তা'রা ত ভালই আছে
আমি নাই ব'লে।

ভাষার অর্থ জানাই
আজ ত' কেহই নাহি— ব'ল' অর্থ জানপুর
ভাষার অর্থ জানপুর
অর্থ জানাই।

ভাষার অর্থ জানাই
আজ ত' কেহই নাহি— ব'ল' অর্থ জানপুর
চরণে মাগে না ঠাই
কোন অভ্যাস!

অভ্যাস ত' আজ আর কেহ
একটা চন্দন মাত্র বাচেনাক' দিবারাত্র
কহে না—“এ প্রাণ পাত্র
ভরি, দাও মোহ”!

শতভলে ভাষার ত' আজ
বার না পলায়ে আর ডাকিলে ত' বার বার
গৃহস্থের লুকাবার
নাহি কোন কাজ!

কি শেল যে বেজেছে এ প্রাণে
চন্দন-চন্দন-কড় ভুলে ভাষার বোলো না খুলে
ভাষার অর্থ জানপুর
কীট কোন্‌খানে!

অর্থ জানাই ভাষার প্রাণে প্রাণে
আজ ত' কেহই নাহি— ব'ল' অর্থ জানপুর
চরণে মাগে না ঠাই
কোন অভ্যাস!

প্রত্যাহার

[অধ্যাপক শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ এম.এ.]

(১)

এই দুঃখবহুল সংসারে বাস করিয়া দুঃখ কি, তাহার তাপ কত তীব্র তাহা কাহাকে বলিয়া দিতে হয় না। শব্দী, নির্বন, বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ—সকলেই আপন সংসার অহুলাহে, আপন আপন কর্মনির্দিষ্ট কন্ধার কেহ সন্তান গতিতে কেহ বক্রগতিতে এই দুঃখেরই আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্য ধাবমান হইয়াছে। সংসার কর্মভূমি, মলা চকল—এখানে সকলই অপূর্ণ, অভাবগত। তাই আপন অভাবমোচনের জন্য ঈলিতভ্রমকে লাভ করিবার উদ্দেশে সর্বত্রই একটা উন্মাদময় স্রোত প্রবাহিত রহিয়াছে যেখানে পাওয়া যায়। অতি ক্ষুদ্র পরবাসীর কল্পন হইতে অতি বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের আলোড়ন পর্য্যন্ত এই একই প্রেরণার অধীন। তাই জ্ঞান সকলেরই অতি পরিচিত জিনিষ।

কিন্তু দুঃখের অবসান কি হয় না? শান্তি কি একেবারেই হ্রাস? জগতের নিকে দৃষ্টান্ত করিয়া এই প্রশ্নের উত্তর চিত্রা করিলে অবশ্যই বলিতে হয় যে দুঃখের বিরাম আছে, শান্তিও একেবারে অদৃষ্টচর নহে, কিন্তু একথা সত্য যে এ শান্তি পূর্ণ নহে, আংশিক মাত্র। ইহা দুঃখের আত্যন্তিক ও ঐকান্তিক বিরাম নহে। যের অহঙ্কার নীলীখে, মেঘাচ্ছাদিত গগনমণ্ডল হইতে কলকাতার কলিক প্রকাশে যেমন বিসর্গোৎসব আনন্দ লাভ হয় না, বরং

তাহাতে দৃষ্টির লব্ধিও অসংসার আনন্দ বলা যায়, সংসারের পলকায়ী অসংসারিত শান্তির আনন্দও তেমনি। বক্রতা ইহাতে কামনার ভ্রুণ নাই, এসাদেই ঈশ্বরভক্তি নাই, চিরানন্দের অবতান নাই—মহাত্মা সাময়িক এবং আংশিক দুঃখ নিরোধ মাত্র আছে। ইহা চাপা অবস্থা, উন্মুক্ত অবস্থা নহে। রোগের ব্যাধিভাবে অকথিত আর উপশমে যে প্রভেদ সংসারদৃষ্ট শান্তি ও ব্রহ্ম উপশমের মধ্যেও সেই প্রভেদ।

এই দুঃখনিরুক্তি কি প্রকারে সম্ভবপরিত ভাবে হইতে পারে তাহার উপায়াদির বিচারিতরূপে আলোচনা করা মর্শন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। মর্শন শাস্ত্র যুক্তিপ্রধান। অপরোক্ষ ভাষায় যখন সত্যের অহুত্ব হইতে তখন তাহাতে সন্দেহের উদয় হইতে পারে না। তাহার এইভাবে তত্ত্বসাক্ষাৎকার করিয়াছেন তাহারাই ঋষি বা যোগী নামে অভিহিত। তাহাদের উপলব্ধি তাহার সহায়্যে প্রকটিত হইলেই উহাকে আলম বলা বাইতে পারে। কিন্তু এই প্রকৃষ্ট কথা আশ্রমকে জ্ঞান সাধারণের পক্ষে কিয়ৎংশে বোধগম্য করিতে হইলে উহাকে যুক্তির দ্বারা সজত করিয়া দেবান আবশ্যক। কিন্তু চিত্তবৃত্তির স্রোত অহুলাহে কচি সকলেরই পৃথক পৃথক। তাই যুক্তির কোন প্রতিষ্ঠানই পূর্ণ বোধন্য পরিষ্কার সম্বোধিত ও সম্ভবপর

শক্তির স্বরূপ বিচারে যথেষ্ট জরাজ শক্তি।
আরও ইহারই নামকরণ। এই আনন্দই
জীব জায়। ইহা জীবাত্মক সংকৃত পদার্থ,
সত্যবাহন নহে। তাই জানিয়া হটুক, না
জানিয়া হটুক, যখন যে নামে হটুক, জীব
আনন্দেই আধি—এই আনন্দই তাহার প্রেরণ
ও বটে, প্রেরণও বটে।

ভোগ ও মোক্ষভেদে এই আনন্দ অজ্ঞান
দৃষ্টিতে বিবিধ বলিয়া প্রকৃতিতে হয়, তাই
পূরুষার্থও দুই প্রকার। ভোগ ঐচ্ছিক ও
পারজিক দুইপ্রকার—ঐচ্ছিকভোগ আবার
কামিনী (কাম) ও কাম্বন (অর্ণ) এই
দুই ভায়ে বিভক্ত। পারজিক ভোগ এক
প্রকার (ধর্ম্য)। এইভাবে সাকল্যপূরুষার্থ চতু
বিধ—ত্রিবিধ ভোগ অপর পূরুষার্থ, আর মোক্ষ
পরমপূরুষার্থ। ইহাই প্রসিদ্ধ চতুর্বর্গ কল।
ইহার মধ্যে লোগাশ্বক আনন্দ বিনম্বর, মোক্ষ
নিভা। একটি হেয়, অপরটি উপাস্যে।
যেখানে ভোগ্য সেখানে মোক্ষ নাই, যেখানে
মোক্ষ সেখানে ভোগ নাই। বুদ্ধতা ও দুঃখা
পরম্পর বিরুদ্ধ—ভোগ ও মোক্ষও বিরুদ্ধ।
একাধারে যুগপৎ উভয়ের সমাবেশ সম্ভবপর
নহে। বিশেষতঃ ভোগ অজ্ঞানমূলক। মোক্ষ
জ্ঞানমূলক—সুতরাং উভয়ে সামঞ্জস্য নাই।
যোগশাস্ত্রে এই জনাই বিভূতিকে কেবলোর
অস্তরায় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

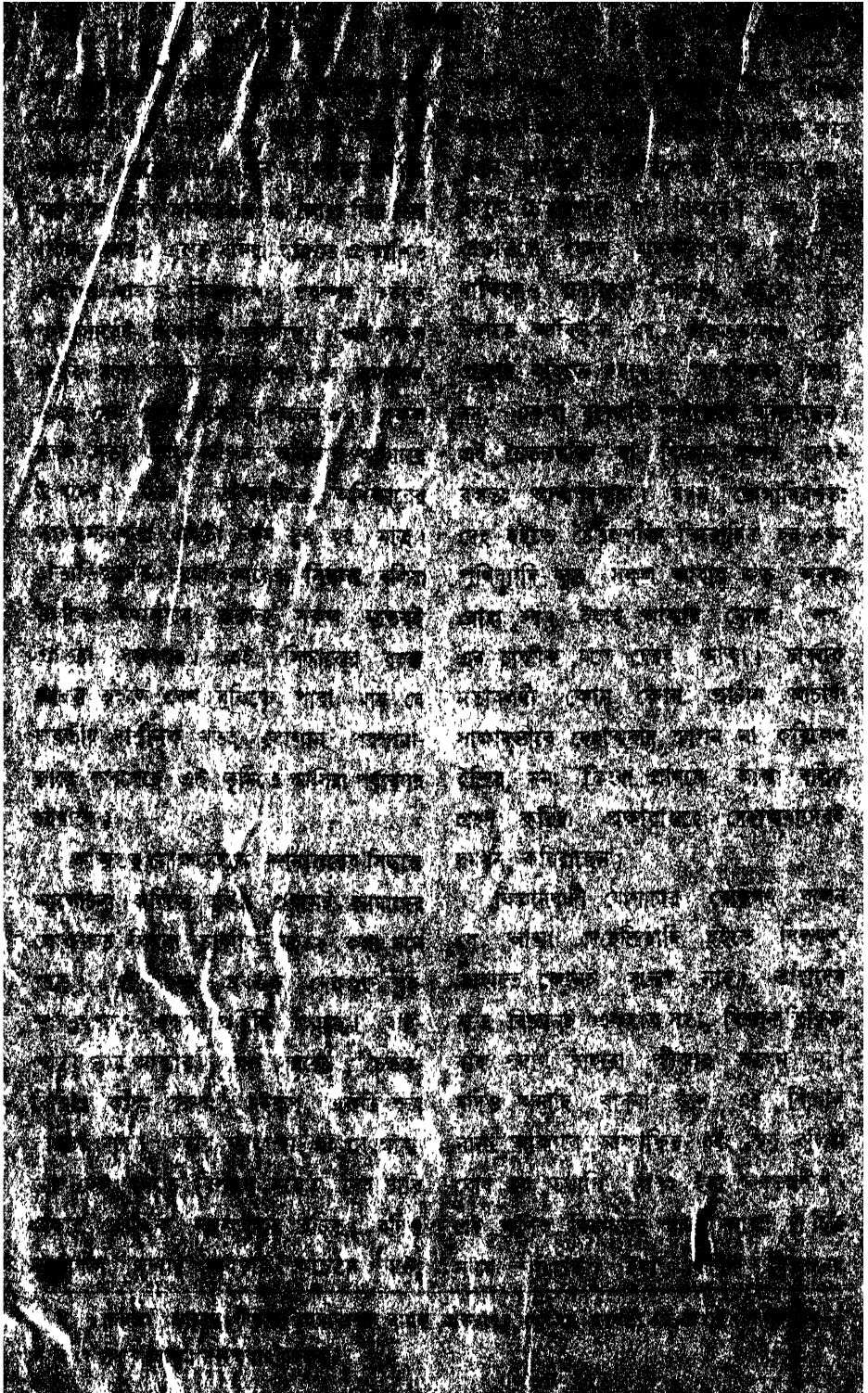
সত্য কথা। কিন্তু আগম বলেন ইহা
চলন সত্য নহে। ভোগ ও মোক্ষ একই
কালের চিরসঙ্গত দুইটি সিক্রমাত্র। যে মুক্ত

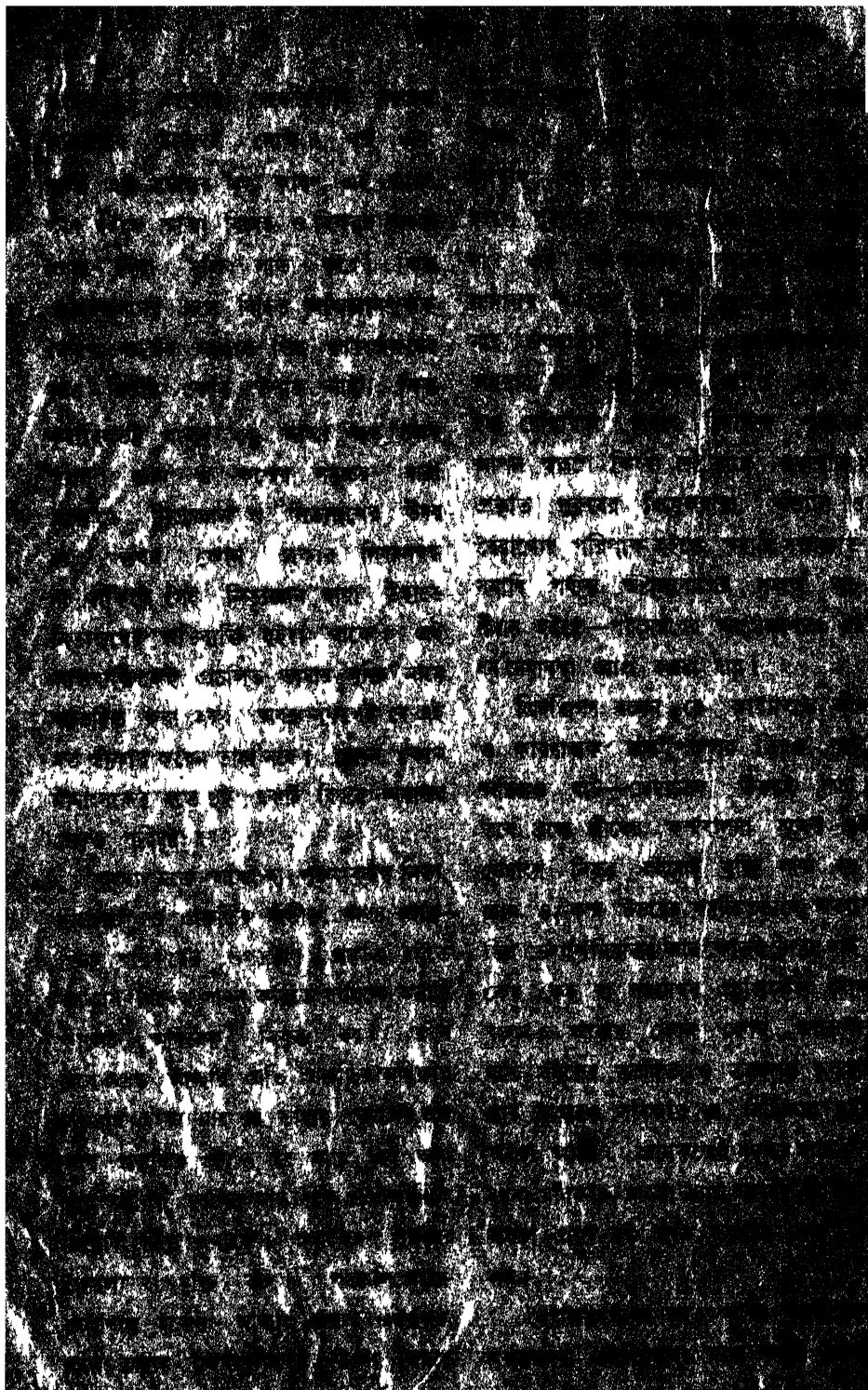
সেই মুক্ত হইয়াছে—কিন্তু জ্ঞানিন পদার্থ,
স্বাক্ষরশূন্য, অজ্ঞানির আহার ভোগ কোথায়?
যে আনন্দবিশুদ্ধ, প্রতিরিক্রমে পরিভ্রমণীয়,
যাহার ইচ্ছাশক্তি কল্পমাত্র সে ভোগসামর্থ্য
কোথায় পাইবে? যতদূর এই ভোগাভাস
হইতে বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্বক সত্যমুখ হইয়া
চিনেকপ্রবেশ না হইতে পারিলে পরমার্থভোগের
আশ্বাসন পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র সত্য
চিনাশ্রমই পরমার্থতঃ জ্ঞান ও মোক্ষ,
জিহ্মবননী এবং আশ্বরূপকৃত্য শর্য শক্তিই
একমাত্র ভোগ্য। সত্য সত্য ভোগ্য ও
ভোগ্যে কোন ভেদ নাই, কোন বারধান
নাই—“ভোক্তেন ভোজ্যপেণ সমা সর্গতঃ
সংহৃতঃ।” মুখে একই প্রকাশ শুধু
*(মাতঙ্গীত) আপন ভোক্তা ভোগ্যে
প্রকাশ ও বিমল অথবা শিব ও শক্তি এই
উভয় অংশের সাম্যরূপে বিরাজমান জ্ঞানেন।
তিনি নিত্যমুক্ত, অগত নিত্যার্থ্যসম্পন্ন।
তাহার স্বরূপের আভাসই পূর্ণাহুতমৎকার
বা আনন্দাশ্রম। শক্তিপারমিত্যের আচার্য
শঙ্করকেও এই স্বকৃত্যকে মহাবিকৃত বা
পারমৈশ্বর্য বলিয়া বর্ণনা করিতে হইয়াছে,
এ কথা আমরা ভূমিকার ২৬ শ্লোচনা করিয়াছি।
অতএব বাহ্য মানবের পরমপূরুষার্থ তাহা
যে একাধারে ভোগ ও মোক্ষ উভয় নামেই অভি
হিত হইবার যোগ্য তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

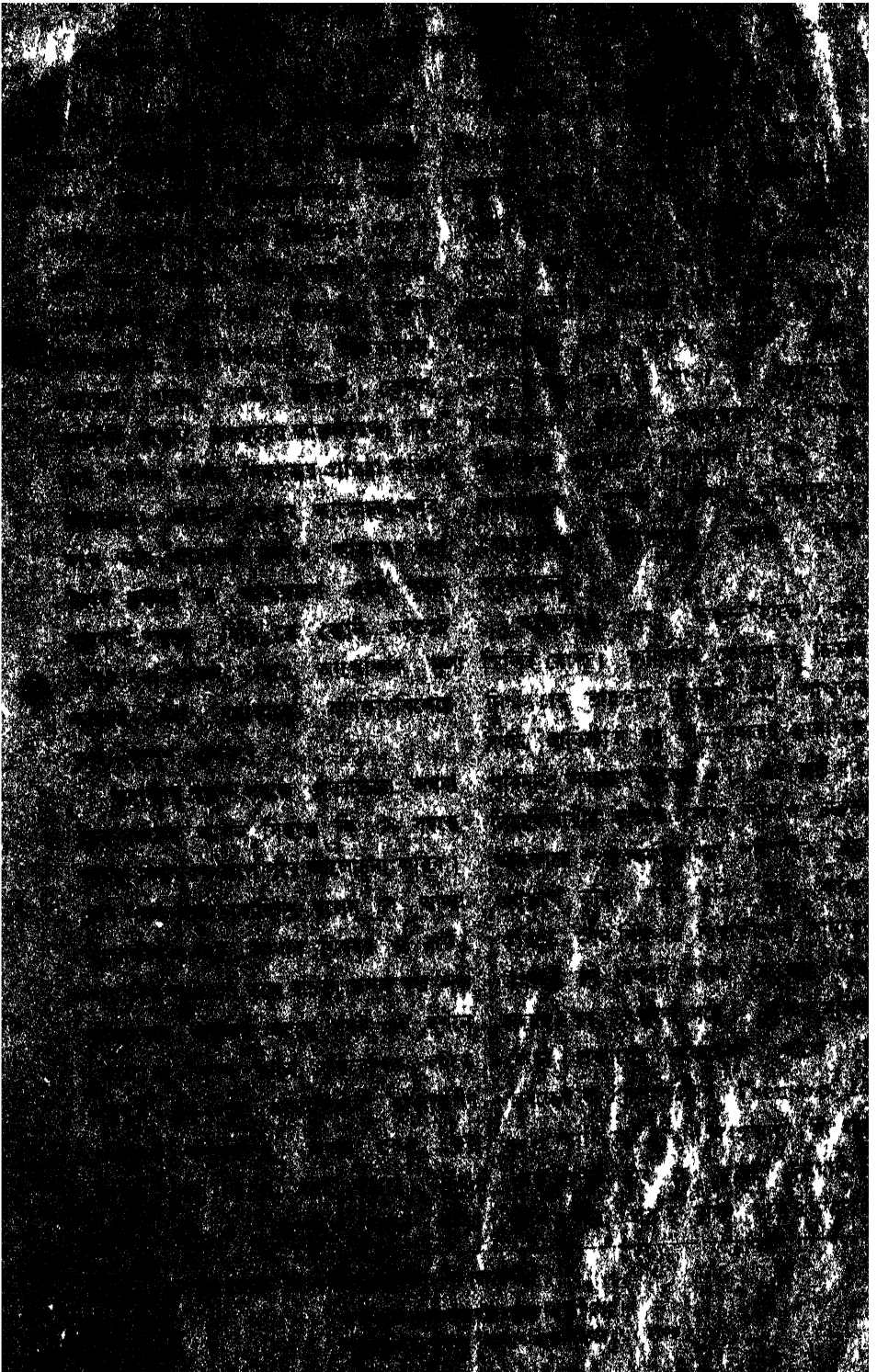
(২)

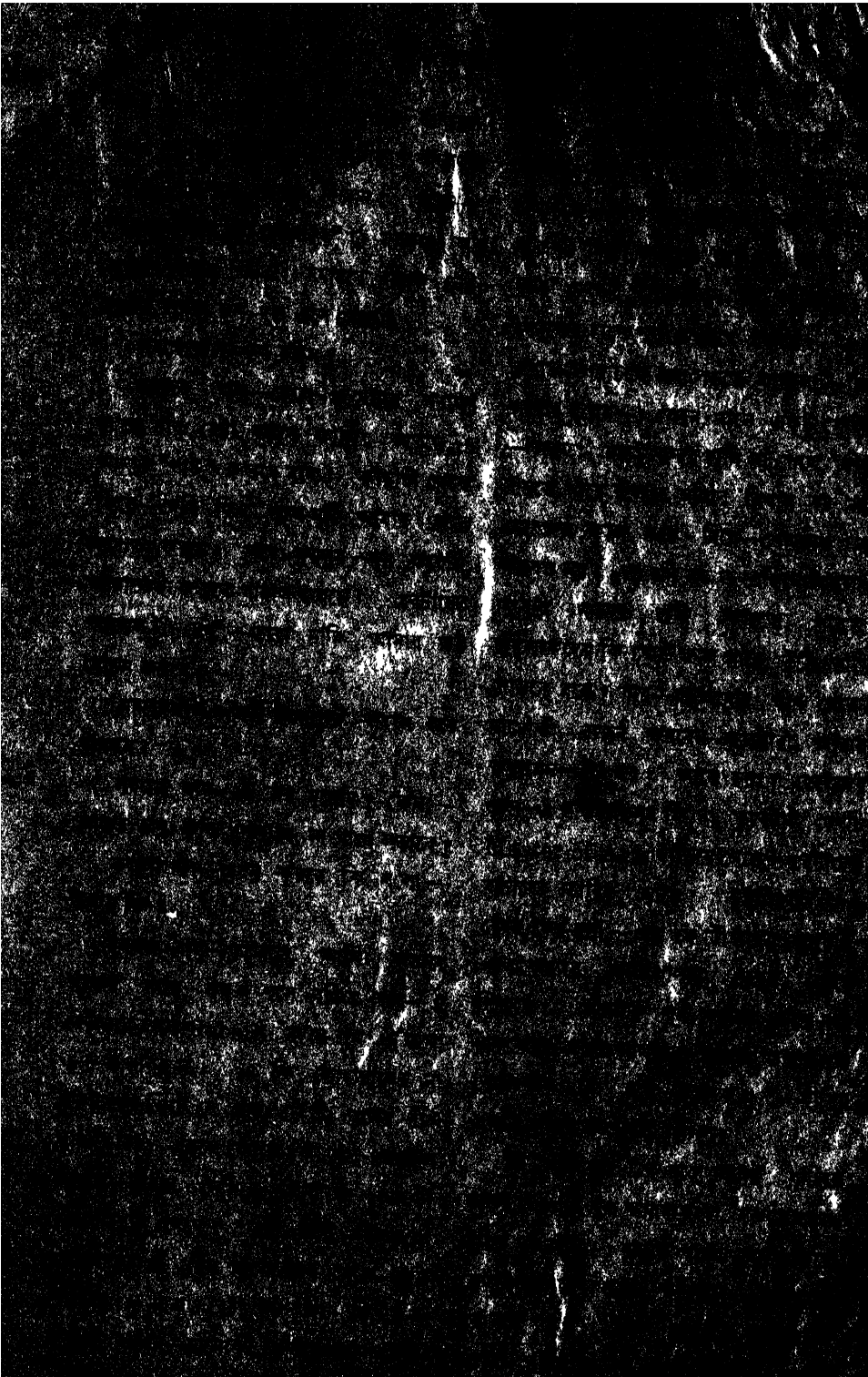
চিনাশ্রম বলা কি? ইহা জ্ঞানে
পারিলেই পরমপূরুষার্থের স্বরূপও বুঝিতে

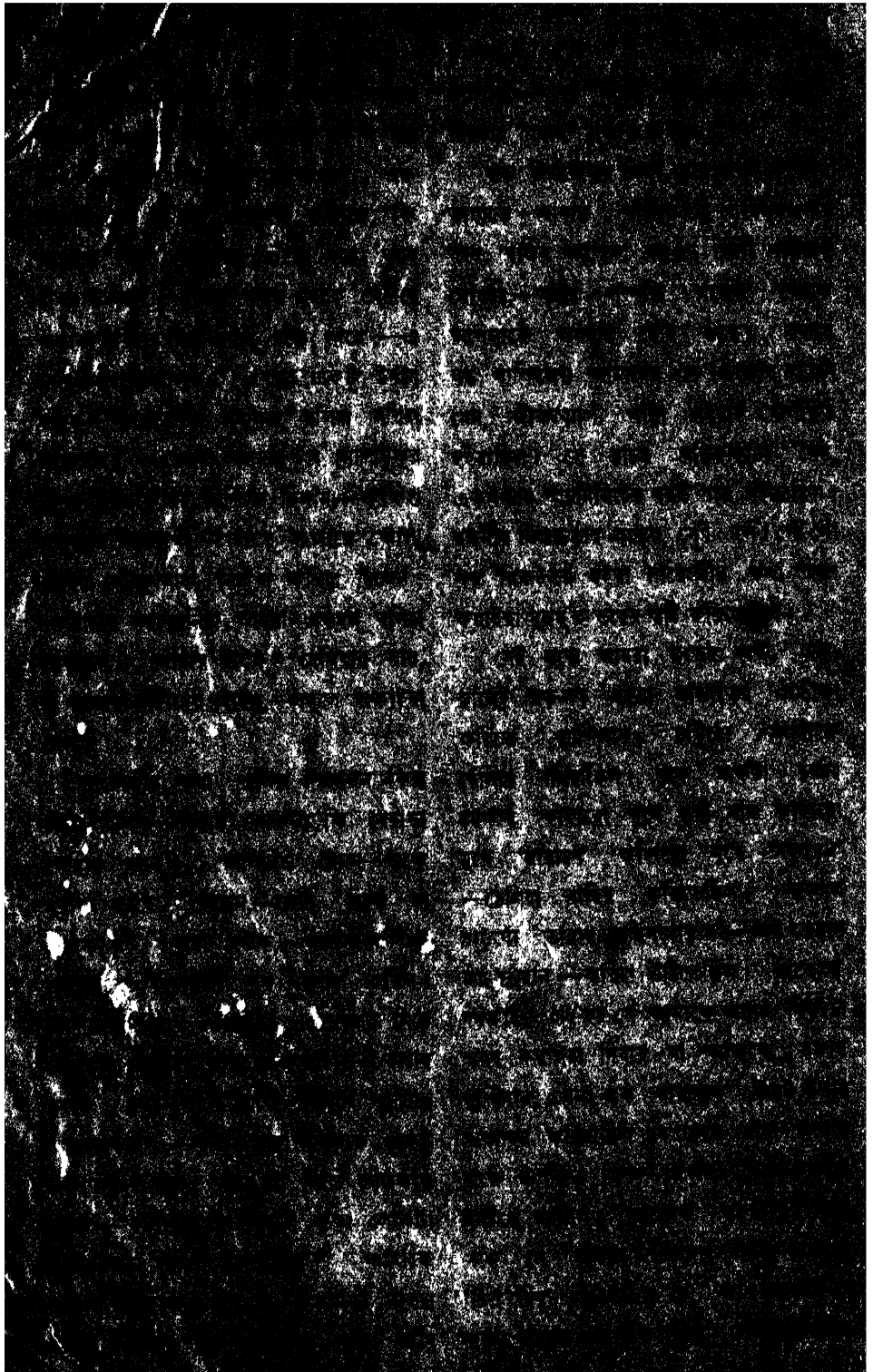
+ যক্ষ কে যেখানে পূরুষার্থ বলা হইয়াছে সেখানে একজাত কণী ভোগেই গ্রহণ করিতে হইবে।
কমবে এই যেমত থাকাই অবশ্যক ভাব্যনিমিত্তিক স্বরূপে প্রকৃত সিদ্ধান্ত বা পদার্থবিজ্ঞান্য কামিন পরমপূরুষার্থ ইহে
ইহাই প্রদর্শন করিয়াছেন।

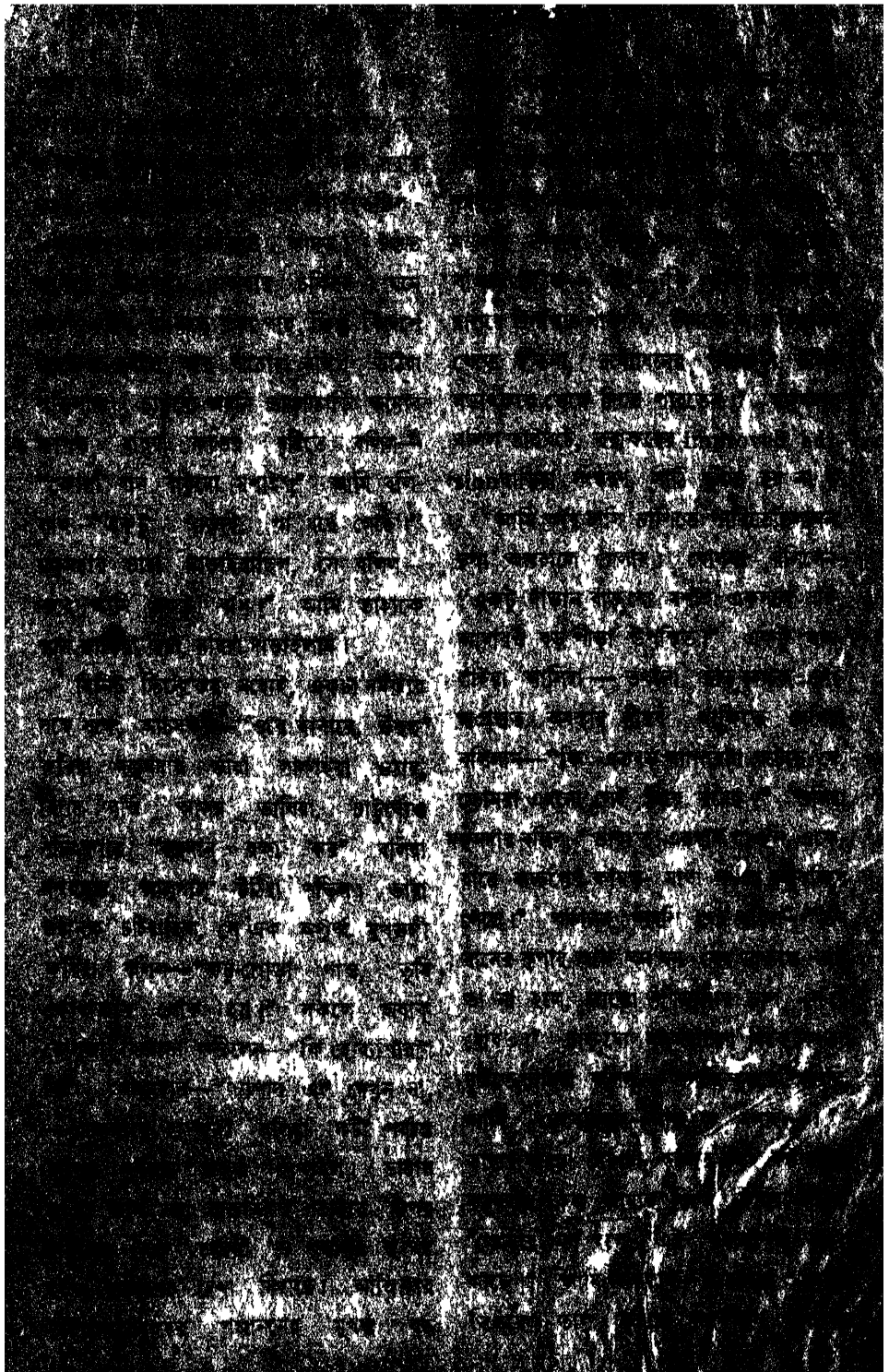






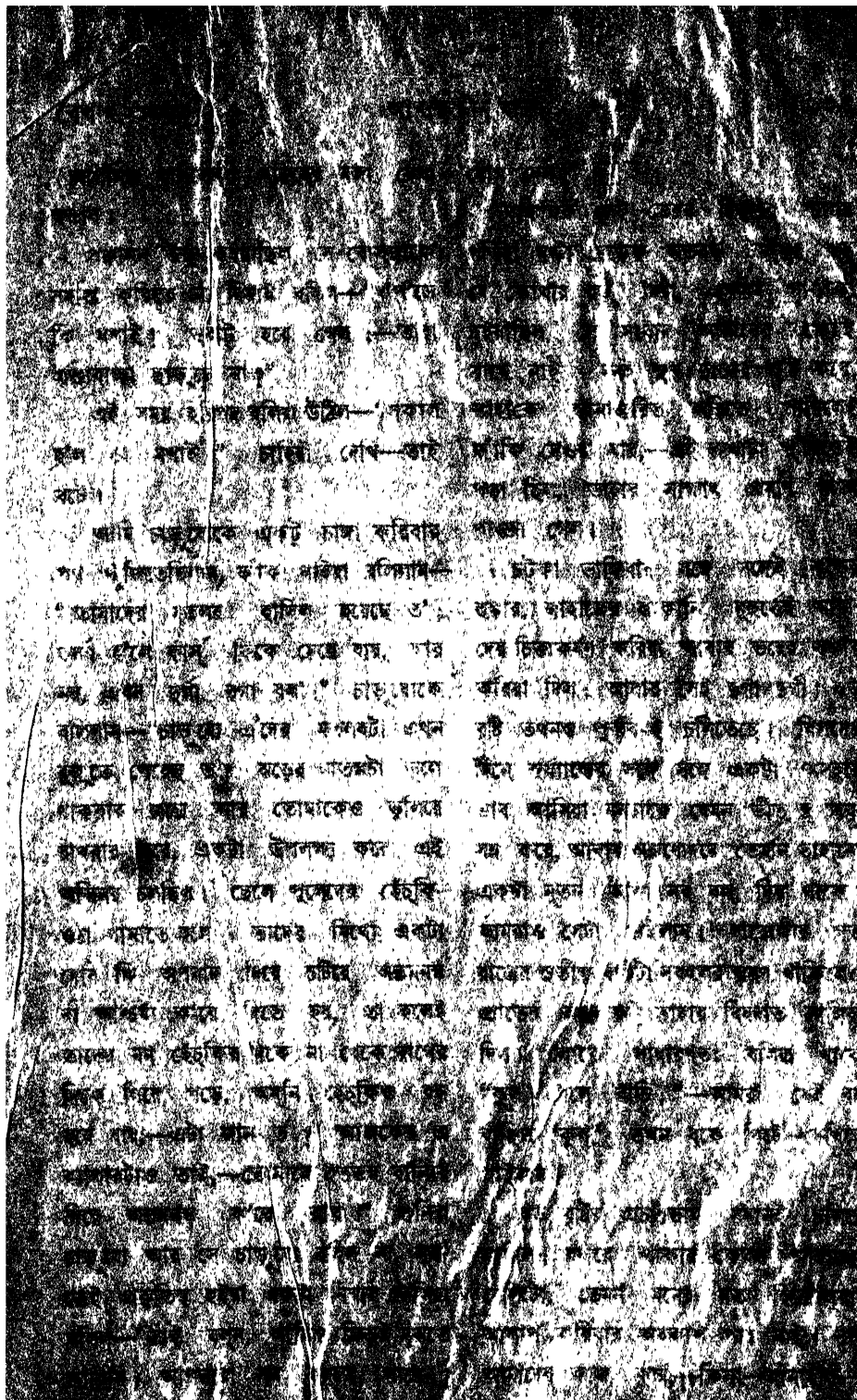


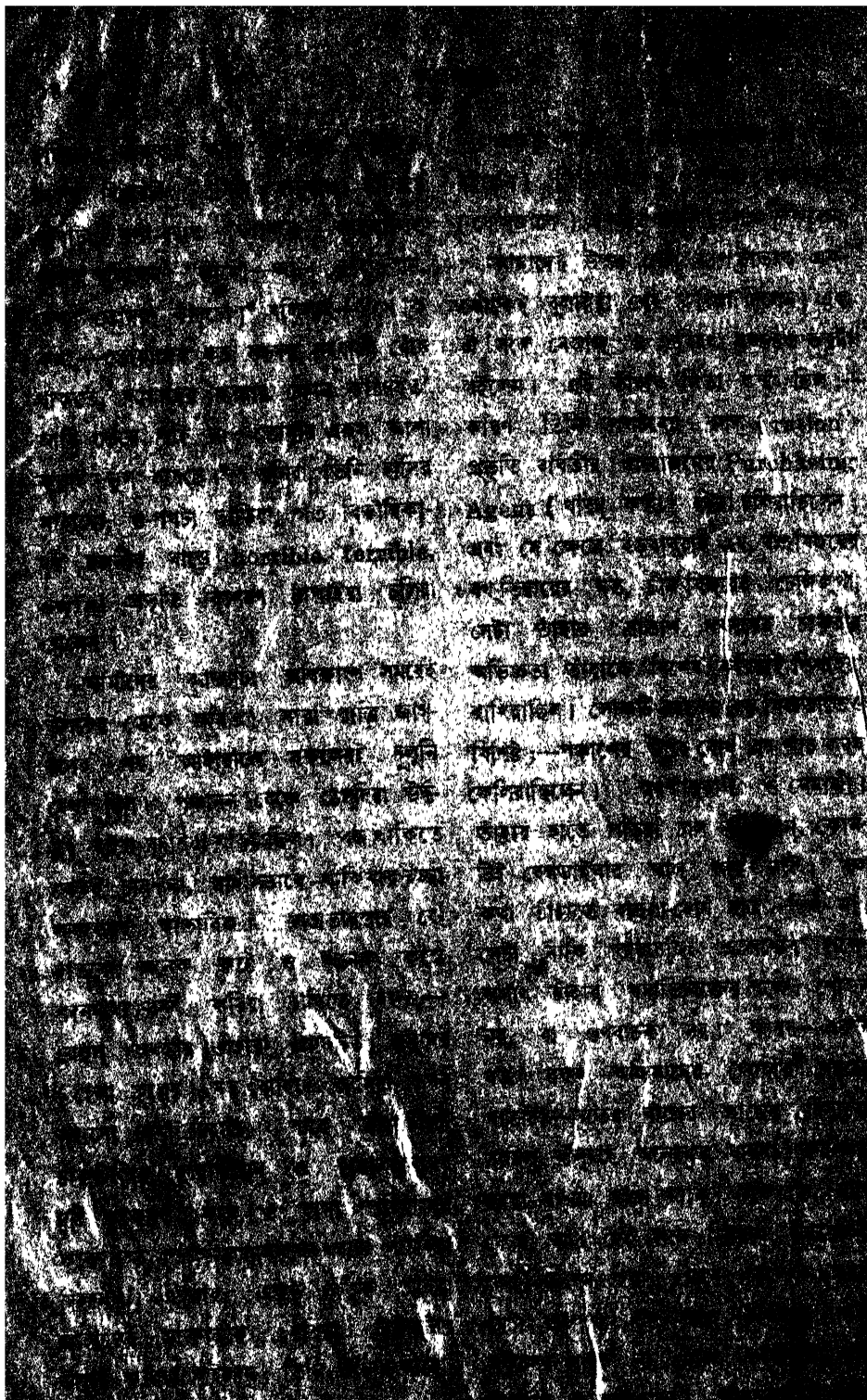




1990年12月

[illegible][illegible][illegible]





THE UNIVERSITY OF CHICAGO

নিম্নোক্ত লোক-কবিতাগুলির আলোকে
 এই কবিতাগুলির উৎপত্তি সহ্য হইল।
 কলকাতায় পিতা কোর, মন বহিষ্ট, সেবা কৈ
 উপস্থিত, আকাশ মেঘবন্ধ; সেই এখন
 বাতাস-গর্জনকে, পাঁকাইগাছ। জলের ঢল
 উপস্থিত বহুদিন নাই—আর আপ-সানি আর
 নাই। রক্তের ভেরি মুক্তি দেয়। জাহা-
 জের সব জাহাজ, আলসাব ও তোলাকা
 পুঝিয়া রাখ। ইহাছিল, এখন তাহা
 কাছাকাছি গিট (সংস্কৃত) করা কলকাতা
 পাঠ্যক্রম শুকাইয়া গহবার কত, তাহাদের
 স্ব স্ব স্থানেই প্রথম ভাবে মেলিয়া দেওয়া
 হইতেছে। কলকাতার চরবি গোপান চলিয়াছে;
 হুট হুট অবস্থান শব্দে নব্বয় উঠিতেছে,
 হুট হুট পড়িয়া গিয়াছে। কালেন, চিৎ ও
 সত্যকারীরা খুবই ব্যস্ত—আটটা বাজিলেই
 জাহাজ ছাড়িয়া।

[illegible][illegible][illegible]

১০০০ টাকার ক্রয়াদেশ, —
 মোট ১০০০ টাকার ক্রয়াদেশ, —
 মোট ১০০০ টাকার ক্রয়াদেশ, —
 মোট ১০০০ টাকার ক্রয়াদেশ, —
 মোট ১০০০ টাকার ক্রয়াদেশ, —

আবল দেশ

[শ্রীকামাখ্যানবন বন সত্ৰমন্ডপ]

কোন সজানার অলীম কোথায় আছে আর কোথায় রাণী
নীলের পারে নীলের ঢালে সৌরা ভোমার অলঙ্কারি ।
আকার কোড় কোড় যোগান বালশায়ার বন দেউ ছোটো
সেই ছোটোতে চন্দ্র মাথা— ভোমার বুকে হাত মটোতে ।
অলীম কোড়া মোর ভূমি অগারি কপাল প্রোতসিই
চন্দ্র তারে নেচে মোর হাত আঁতে লক্ষ্মণি ।
জানার ভোমার কোণে বসার একটি পদ লক্ষ্মী মেয়ে,
কতি কি তার ভোমার পাশে—সব ভেঙ্গেছে আছে ভেঙ্গে :
অশ্রু সে যে চাইছে সঙ্গীত কোন্ না কোন্ গুলি মেয়ে,
হৃদয় ছেলেচ চাইতে ভাজি মোর বন—কটি মোয়ে ।
শিখাও ওগে লক্ষ্মী-রাণী কপ সাগরে নীচা ঘরী
জান্দ নীরে এই কথাটি—ওগে ভোমার পাশে মসি ।

আবল দেশ

[শ্রীকামাখ্যানবন বন সত্ৰমন্ডপ]

জায়াচন্দ্র প্রচর এ মকপ্রাস্ত বনে
পারন্তের সাগর বেলায় ।
কি সতি গাগিয়া ওঠে তাকনত মান
কোন অশ্রু অশ্রু কোলায় ।
নসি শ্রাম শল্যোপরি প্রাকাকুল তলে
কীর্ণকার্য নহরের পাশে ।
চোখ থাকি স্বপ্নাতুর দৃষ্টিখানি নেলে
সমালগে শূন্য-গর্ভ ভালে ।
হায়, আবরের তরী! নদে বসেছিলে
এই ঘন জলুর ছায়ায় ।
প্রথম নদের জিহা কেমনে হরিলে
কোন বুকে—বিল তা' অমায় ।
সেই স্বপ্ন-বুকে নিয়ে আকুল বনে একা
কাটে মোর দিবস শরীরী ।
ভোমার রাতে ভেঙ্গে থাকি, যদি লাই দেখা
—স্বপ্নি নারি । আবরের শরী ।

চণ্ডিমা কৈকিয়ৎ

(কীৰ্ত্তনোদ্ধৃত লালমণ্ডলখণ্ডঃ)

স্বপ্নানন্দক পূৰ্ণিমা না কলমে লেখা স্বপ্নানন্দ মোহোদয়ী
 লাবণ্য চুন্দরীন্দ্রী তুমিই দেবীজিহ্ম, দেবীবাণী পদে পদে গীত
 লবণ্যবদনীত জীবনমুখ্য তুমিই দেবীজিহ্ম, দেবীবাণী পদে পদে গীত
 কিস্তি নন্দ পদবন্দন করি দেবীজিহ্ম, দেবীবাণী পদে পদে গীত
 মনোমত রক্ত শব্দকণা তুমিই দেবীজিহ্ম, দেবীবাণী পদে পদে গীত
 হু গীতিনী তুমিই দেবীজিহ্ম, দেবীবাণী পদে পদে গীত
 অমর নন্দন তুমিই দেবীজিহ্ম, দেবীবাণী পদে পদে গীত

উত্তরানন্দক পূৰ্ণিমা না কলমে লেখা স্বপ্নানন্দ মোহোদয়ী
 লাবণ্য চুন্দরীন্দ্রী তুমিই দেবীজিহ্ম, দেবীবাণী পদে পদে গীত
 লবণ্যবদনীত জীবনমুখ্য তুমিই দেবীজিহ্ম, দেবীবাণী পদে পদে গীত
 কিস্তি নন্দ পদবন্দন করি দেবীজিহ্ম, দেবীবাণী পদে পদে গীত
 মনোমত রক্ত শব্দকণা তুমিই দেবীজিহ্ম, দেবীবাণী পদে পদে গীত
 হু গীতিনী তুমিই দেবীজিহ্ম, দেবীবাণী পদে পদে গীত
 অমর নন্দন তুমিই দেবীজিহ্ম, দেবীবাণী পদে পদে গীত

কৈকিয়ৎ পদে লেখা স্বপ্নানন্দ মোহোদয়ী
 লাবণ্য চুন্দরীন্দ্রী তুমিই দেবীজিহ্ম, দেবীবাণী পদে পদে গীত
 লবণ্যবদনীত জীবনমুখ্য তুমিই দেবীজিহ্ম, দেবীবাণী পদে পদে গীত
 কিস্তি নন্দ পদবন্দন করি দেবীজিহ্ম, দেবীবাণী পদে পদে গীত
 মনোমত রক্ত শব্দকণা তুমিই দেবীজিহ্ম, দেবীবাণী পদে পদে গীত
 হু গীতিনী তুমিই দেবীজিহ্ম, দেবীবাণী পদে পদে গীত
 অমর নন্দন তুমিই দেবীজিহ্ম, দেবীবাণী পদে পদে গীত

ধলাব উপরে আনিয়া দা আনি, হাতেরে লৌহ কঁড়ি
 আর কিছু নয়, হাই মনে করে' অমিত ধামে বসি
 চৌদিকে ঘেঁড়ি গরাজে জীবন-নন্দনকর প্রাণে গৈ
 তারি মকরানে প্রবাহের উপর শ্রমণে প্রবাহিত
 আনি কঁড়ি প্রাণে একেই প্রাণে প্রাণে প্রাণে
 চুপ-চাপে দমন করি দেবীজিহ্ম, দেবীবাণী পদে পদে গীত
 আনি কঁড়ি প্রাণে একেই প্রাণে প্রাণে প্রাণে

অন্ন বস্ত্র সমস্যা ।*

[আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় ।

প্রকের পণ্ডিত মহনমোহন মালব্য আমাকে হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের Hony : professor কোরেছেন, কয়েকই বছরে এক বার কোরে এখানে আসতে হয় এই ক.শ গত বছর ছাড়া উপর উপর কত বছর আমার কাশিতে আসা ঘটেছে। বরং কোনো বছরেই আমার তাগো এমন সুযোগ ঘটেনি। আজ কাশিতে এই রকম একটি দিরাট সভায় বিশেষতঃ মহিলাগণের সামনে আমার বক্তৃতা দেবার সৌভাগ্য ঘটেছে বলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি।

আমি এই কয় মাস ধরে আমাদের অন্ন-সমস্যার বিষয়ে আলোচনা করছি। বাঙ্গালী ভারতের মধ্যে অনেক বিষয়ে অগ্রণী—আপনাদের মধ্যে অনেক জানেন যে একদিন প্রাচ্যঃমহাদীপ মহানভি গোথলে বলেছিলেন “What Bengal think to-day, whole of India thinks it to-morrow.” অর্থাৎ বাঙ্গালী যা ‘আজ’ ভাবে সারা ভারতবর্ষ ‘কাল’ তাই ভাবতে আরম্ভ করে। কিন্তু অন্ন-সমস্যার ব্যাপারে বাঙ্গালী দিন দিন হ’টে যাচ্ছে। কলিকাতা বাঙ্গালীর রাজধানী বাঙ্গালার মঞ্চের মধ্যে উহার স্থান—কিন্তু এ ছেন সহরে বাঙ্গালীকে আজ কেরাণী, অথবা বুলমাটার ভিন্ন অন্য বশে দেখবার সুযোগ

ঘটে না। পৃথিবীতে বাঙ্গালীর মত এমন দুঃখী—অনর্থনরীক্ট, মা লেবিয়াগ্রস্ত, দারিদ্র্য-প্রণীড়িত জীব বোধ হয় আর কোথাও নাই। এক জন তাদেরই অবস্থার কথা উল্লেখ করে বলেছেন—“the most pitiable condition in the world.” হিন্দুবা অন্ন সমস্যার পাখে এতজ্ঞে—জা’না কর’জান, তুর্ভিক্ষের কবাল গ্রাসে কবলিত।

যেমন অন্ন সমস্যা, বস্ত্র সমস্যাও ঠিক যেমনই দাঁড়িয়েছে। আমি আজীবন বিজ্ঞান চর্চায় কাটিয়েছি। আমি যখন Laboratoryতে কাজ কোত্তে থাকি তখন বাইরের সমস্তই ভুলে যাঈ কিন্তু বাঙ্গলার আজ অন্ন ও বস্ত্রের দৈন্য দেখে আমি আর বিজ্ঞান আগারে থাকতে পারিনে, সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে হয়েছে।

যখন মহাত্মা গান্ধী সকলকে চরকা স্বতো কেটে কাপড় তৈরী করে পরতে বললেন আমি তখন যুধ কোঁতুৎ পদুতর করেছিলাম; আমি কল-কারখানার অভিজ্ঞতা নিয়ে সে কথা হেনেই উড়িয়ে দিয়েছিলাম এখন আমার সে ভুল ভেঙেছে, আমি এখন মনে করি যে চরকা অসাধ্য সাধন কোরে পারে। আপনারা এই যে চারদে দেখছেন এটি আমার গ্রামবাসীরা বুনে দিয়েছেন,

আমি আমার প্রামবাসীদের বেওয়া এই
টাকার খানি এই ওজনের সোনার চাইতে
বেশী লাভী মনে করি।

গত বৎসর আমার একজন আত্মীয়
ভ্রাতৃ ভাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র খোদা ১০০ হাত ১০০
গেজের চাকরীর মমতা দুলাব ব্রত পালন
ক'রে এই চরকার মশারকে দীক্ষিত হয়ে
ছিলেন। তিনি আজ কাল গ্রামে গ্রামে
গিয়ে কোথাও ৮ মন কোথাও ১০ মন
কোথাও ২০ মন কোথাও চব্বার হুতো তৈরী
করছেন আর তা থেকে কাপড় তৈরী কোরে
গ্রামের বজ্রাভাব দূরীকারছেন। প্রায় এক
শত বছর আগে আমাদের প্রপিতৃ শাঃ
খোদা প্রয়াতববে কেন, বিদেশে ৬ কোটি
কোটি টাকার কাপড় চালান হুতো। সে
লাবসায় গেছে, তা'তে আমাদের দেশে বিস্তর
শাড়ে; আমাদের দেশের লোক তা জোড়ে
দিনে বিলাতী সফা মাল একনে পাত্তে
লাপুলন আর সব তাঁতী ছোলা তাপান
কোন্তে লাগলো। তাঁরা তাদের ঘরের
পক্ষীকে নিজেরাই দূর বোরে দিয়েছেন।
এখন Manchester কাপড় না পাঠালে
বুঝি বা দিগ্ভর হ'তে হয়।

আজ কাল কেবল কাপড়েই ভারতবর্ষ
থেকে ৬০ কোটি টাকা বিদেশে যাচ্ছে আর
তার মধ্যে বাঙ্গলা থেকে প্রত্যেক বৎসর ২০
থেকে ২৫ কোটি টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে। আমরা
এক একখানি বিলাতী কাপড় কিনছি তাতে
ক'রে আমরা প্রত্যেকবার ছ'টা ক'রে টাকা
যেন মশিঅর্জার কোরে বিব্রতে পাঠিয়ে দিচ্ছি।
কিন্তু এই ২০ কোটি টাকা বিদেশে না পাঠিয়ে
ঘরে রাখতে পারা যায় তা'হলে আমাদের ২০

কোটি টাকা প্রাত বছর থেকে যায়। এই
২০ কোটি টাকা করে ব্যবসে গেলে অল্প
সময়কার কাপড় দেশেই তৈরী হ'তে হয়।

প্রথম ক'র একজন লোক এক খণ্ডার
১৫ তোলা হুতো কাটতে পারেন। এক
জনকে এক খণ্ডার খব মুলের মূল ২০ হাতিন
তোলা পর্যায় কাটতে দেখেছি। এক ঘণ্টা
কোরে ১০০ হাতিলে ১৫ মাসে ৪৫ তোলা
খার এক বছর ১০০ হাতিল হুতো হয়।
১৫ পো হুতো এক খানা কাপড় হ'লে
১০৮ ছটাকে ১৮ খানা কাপড় হয়। তা'হলে
দেখা গেল এক জন লোক রোজ এক ঘণ্টা
চব্বার চালান এক বছরে ১৮ খানা কাপড়ের
পরিমাণ হুতো অন্যায়কে কাটতে পারে।
একবার হাত এলে স্বচ্ছন্দে মূল হুতো তৈরী
করা যেতে পারে আর তখন ঘণ্টার হুতোলা
কোরে হুতো বেশ সহজে কাটতে পারা
যে। প্রথম প্রথম একটু কষ্ট কোরতে হবে
তার পর আপনি লাভ পাবেন।

আমাদের হিন্দু সংসারে প্রায়ই ২১ জন
বিববা থাকেন তাছাড়া 'দিদিমা' 'পিসিমা'
'মাসিমা' ও আর আর অনেকেই আছেন।
তাদের যদি চব্বার করেন জাতলে তাঁদের আর
পরের গলগহ হয়ে থাকতে হয় না আর
দেশের টাকা বাচিয়ে কতকটা দেশের সেবা
করতে পারেন—পরীষ দেশে বেড়ে যায়। আমি
হিন্দু এইখানে সমবেত সমস্ত হিন্দু মহিলাদের
আমি এই বোলে অনুরোধ করছি যে
আপনারা প্রত্যাহ অন্নবস্ত্র এক ঘণ্টা চরকার
হুতো কেটে তার কাপড় তৈরী করে পারেন।
আমার অনুরোধ দেশ বাহ্যকার অল্প বিলাতী
কাপড় অব্যপৌর্কেন না।

গামের মধ্যে এমন এক লোককেও অনেক
কক্ষীয় একটু নিঃস্বামী পড়ো লোক না।
এই বর্ষের জমীদারী আদায়ের সময় বাপাদের
গাছ লাগানো। এই বাপাদের গাছে প্রথম
বছর প্রত্যেক গাছে একসের পণ্যে তার সেব
পর্যায় তুলে দেয়। এই রকম ১৫২০ টা রাম
কাপাদের গাছ পুঁততে পাবেনই তুলে দেয় আর
অন্যটন হ'ল না। ১৫২০ টা রাম কাপাদের
গাছেই মতো আয় পাওয়া যায়। এমন এমন
লোক পুঁতই কম দেখা যায়। এক গাছ
শাপনাও বুনবন লাগবে একটি চুবু। এই
রকম করে স্বত্বলে আপনারা মিলে মিলে
হাঙ্গলীর পরিষেয় বড় নজরদারী প্রদান
করতে পারাবেন।

কবি বলেছেন—'না জগৎ নরক নারিক
লগনা এ ভাবনা'। আপনাদের জগৎ
অন্যভাবে আপনাদের প্রতি আশা করা হয়।
নিবেদন যে আপনাদের চরিত্রের মধ্যে
শোন আপনাদের উপরেই আশ্রয় নন্দ
করছে—এই চরকাব প্রচার।

এখন কাপড় দাবা বুনবে—জেলের মা
তাই তার চরকা র প্রত্যেক প্রথম প্রথম
চাইবে না সে জেল আপনাদের বসতি
কাপড় পরা একেবারেই বজান বেড়ে হবে।
বিলাসী কাপড় মা, বিলাসী স্বত্বের কাপড়
তাই। আপনাদের মধ্যে প্রতিজ্ঞা করুন যে
মাগের নামে বিলাসী জাতের কাপড় আমি
পোকেই না। এই চরকাব সত্যের চাকায়
আমিন হয়েছি, শুধু হাত আসা চাই। আর
কই করে কিছুদিন একটা মোটা পরা চাই,
পরে হুন্দের মিহি কাপড় এই দেশেই চরকা
আর তাতে উতরী হবে। আমি মহাশয়

গাঙ্গীর নিকট প্রতিজ্ঞা করেছি যে অবশিষ্ট
জীবন বাঙ্গলার ঘরে ঘরে চরকার প্রচলন চেষ্টা
বর্ধাই। এত বাজের সমাপ্ত তিনি আমাকে
নিজের হাতে এতখানি খব বড় চিঠি
দিয়েছেন তাতে তিনি বাঙ্গালার রমণীদের
অন্য প্রশংসা করেছেন। মহাশয় জেল
শাবাব পক্ষে সমস্ত ভাবত বসীকে ঘরে ঘরে
কই চরকা লাগিয়ে করতে বলেছেন। এর
মতো বাঙ্গালী ক'বুই নেই—যেমন নিজের
জেলের দল নিজেদের দেশের ক'বুই দিয়ে ঘরে
হলে হয়, কেমন নিজেদের জমীর গাছ থেকে
চুরা নিয়ে নিজের গাঙ্গীর চরকাব জতো
নেদা নিয়ে দেশের ক'বুই জেল দেয় দিয়ে
ক'বুই বুনতে বসেন। আমি কিছুমাত্র বিদ্বেষ
এবং লোকে এ কথা বলিনি। নিজের গাঙ্গীর
চরকাব নিজের জতো এবং কাপড় বুনে নিয়ে
ক'বুই বসান। ক'বুই এর কোনো কথা নেই।
আমাদের মাঝে কই কিছু বলবার নেই।
শ্রম আমদের মধ্যে আমার ভাই বোন পুজনীয়
সকলে আমার কথা শুনেছে এসেছেন, ঘরে
গায়ে আমার কথা কটা একটা ভাববেন,
ক'বুই আর কই বলুন। আমাদের নিস্তা হবে
নাগরিক আমি দেখি বাঙ্গলার গাঙ্গীতে
পল্লীতে হাওড়াত ঘুম, হরহর কাল পরানন্দা,
পর চক্কা এই রকম কোরেই ত আমরা সময়
কাটাই। বাঙ্গালী-শ্রমীদের অবসর আছে—
ছাত্রদের চুপ করে থাকলে চপবে না
তাদেরই এখন জাগতে হবে, ক'বুই হতে
হবে। এই জাতীয় জাগরণের দিনে দলাদলি
হলে চলবে না ছোট বড় সকলকেই দেশ-
মাতৃকাব সেবায় ক'বুই শক্তি প্রয়োগ
করতে হবে।

निष्ठावशङ्गी वन्द्यापामास

“হাহাহা, নাক, ভাল কোরে ধরো, পড়ে

অল্পপূর্ণা কাহলি "সত্য, কি বড় ঠিক
বাপের" নামের খাতিয়ে তো কম বসে
আমরা মাটি, একটু চোটে খায়ে, বড়
মা মা একেবারে কোমল হয়ে
এসেছেন। বঁকিয়া সে খোখার
চোখ দুটো, আনোব দিক হইতে সব
বসিয়া আসা ক্ষুণ্ণ গাণ্ডুইটিতে মা মা
বাসা চালিয়া দিল। পরে কহিল, "যা
পরিবালা তো ছেলের মাথাখানা দেখে একটু
যেন ভয় পেরেছিল—আবার গেরেসে যে বড়
জিদি কিনা" উঠতে বললে উঠবে না, বসতে
বললে বসবে না—এই যদি ঐশ্বামিনী কোরে

একটু উঠে হঠাৎ চলাফেরা করছে, তাই হলে
কি আর বাঁচা ছুটো অবশিষ্ট নিজে। তা, এই
তো এখন, কিই বা এমন সময় নিয়েছে?
কতলোক অমন সাতদিন ঘি/ধিনে, জামারো
তো রেহুর লো—

“হয়েছে তো দিন, এইবার নিম্ন।

“না রে, বাপ। একটু ছেলে নিয়েছে
তো এই নাকবোরে খসে থাকে। পাও,
পাশের কাছে যেওনা বোকা। অমন বাপের
কৌশলে যেতে হুই, যেমন আচ্ছা, না
বোকাব নামেও নাকবোরে। আরো আত্মক
চোখা আছে। আর, ক্ষণিকের হাত লাবা,
তুই ছেলে। না কত কিচিৎ বেতন দেবে,
আত্মক চোখা তো আকোছো। না?”

বোকা কানিয়া উঠিলে অমূল্য কতিল,
“অ নম, বাবা কীনাগর, বোকাব কিতো
পেরেছে।”

পাশের বাপ বোকাককে কমলা ডাইতে
নতনে কমলা কহিল, যদি নেন কি, একটু
দুখটক হুই।

“কেন না হয়েচে না?”

“যা কি সকলের সমুখে দেবো নাকি?
না হুই হুইবে?”

“তা, তাক আমি দিচ্ছি। কনা?”

“আচ্ছা, দেওয়া যাবে লো দেবা লাবে।
যখন কেনে কিকিয়ে উঠবে তখন কোথাক
ছেতে রাখা যাবে দেখে নেবো। আর
দেবিলে, আচ্ছা কতদিন বা দাঁতিনকে পেয়ে
ছেলেটার দিকে হাতে একটু জাকাতে যেন
কলিলনি।”

“অকুই যদি মায়া তো তুমিই শুকে নিয়ে
বাক্য ন্যা।”

“দারি হুইতে?”

“কেন পারবো না?”

“ইস?”

“ইস আবার কি?”

“আচ্ছা থাক, এখন তো নে, বড়
কানছে।”

“তুমি একে এখান শুয়ে দিয়ে যাওনা।

“আচ্ছা, এই নে।”

কমলা তাহার কোলের কাছে শুইয়া
সমিজের বোতাম খুলিবেই অমূল্য হুই।
দোবটা মুক্ত করিয়া দিয়া পলাইয়া গেল।
হাইবার সময় যতীনকে বালিল, “কই, এই ঘরে
যাও—নিশেষ বসফার।

“কেন?”

“আচ্ছা, আগে বাপ তো জোরপূর্ব্ব, কেনও
উৎস পায়ে।”

“আমি কোথায় নে বেশ মায়া।”

“যা কি এক বছর এক আচ্ছা—যাও।” অমূল্য
যতীন উঠিয়া কমলার ঘর গেল। সে সময়
কপড় টানকে টানতে বাতির হুইতেছে
দেখিয়া কতিল, “কানছে যে, শুনে যাও।”
কমলা কেনও উত্তর দিল না।

না আসিয়া কহিলেন, “নব যেন কি,
ছেলেটা অধোমটা বোর কানছে, একটু যেন
কানছে নেই।”

রাগাঘরে লইয়া গিয়া কমলাকে কহিলেন,
“নে, গলা শুকিয়ে গেল, চোখে কি দেখতে
পাওনা?”

“না, ছানি পড়েছে।”

“মাথালতে পাদরি না তো মা হুইছেলি
কেন? নে ঈগ গির, জালসনে কলি।”

“আমি পারিনো।”

অনুপূর্ণা আমিয়া দ্বিতীয়ের কহিল, “নে বাবা, বাট হয়েচে, আর কখনো করবো না।”

চোখে একরাস জল-লইয়া উঠিয়া যাইতে যাইতে কমলা কহিল, “আমি কি খাখল না হুহু, না কি, যে সকলে আমার পেছনে লেগেছে? আমি নেবো না, বাও—”

কমলা চুপিয়া গেলেন মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, “এ মেয়ের ছেলে হুণ্ডাই বা কেন?”

কক্ষবহর অনুপূর্ণা বলিয়া উঠিল, “তোমা-দের সহি এমন বাড়াবাড়ি বাপু—তোমারি কোন বেড়াবড়নে ছেলে হয়েছিল তো?”

অনুপূর্ণার শাওড়া আশ্রয় কহিলেন, “শুধুমাত্র তোমার মেয়ে বাপু জে একজন না, এবং এখন আমার একে মৃত্যু কবের এনো। সুরেনের মেয়ে আদিল থেকে ফেরবার সময় হলে, তুমি যাবে কখনও বেয়ান কই লো, কই জালা তোমার মতি দেখা তোর—”

“এসো ভাই এসো, এই যে আমার কোলেই আছেন। ওরে কহু, একটা আসন এনে দে তো রে? ভাল মেয়ে বাপু, কোলে কোলে শের পেছু পেছু কি খুরেই বেড়াতে হবে! দাখা আমার কৈদে-কৈদে ঘুমিয়ে পড়লো—নাও ভাই একবার কোলে কবো, ছুজনকার দিনখাণ আর দেখতে হবে না, সগাইট হয়ে যাক। ওরে কহু, আশ্রয় আমি—”

যাবে গিয়া অনুপূর্ণা কহিল, “না না, দিগে আর।”

“তোমার শাওড়া, তুমিই যাও না।”

ডাকতেন—হুণ্ডাই—আমি, বাবো

কেন?”

“মহু ভামরতি হয়েচে।”

আব শের নাবা মাটা ক’ক, না হু?

“জাণো হ্যা, রেবু আর।” সেপেক কোলে করিয়া নিজামা কহিল, “জাণো রে, ঠিক বলতো, তোর বাবা হুণ্ডাই মেয়ে মল লাসে, না তোব মা?”

“মতিমা বাবা কেমন আমাকে আমার একতা ছতো কিনে এনে দেবে।”

“তোব মা তোকে কিছু দেব না না?”

“না দেয়—মতিমা পোকা কই? আমি কেমন কোণে কবো? ভাল, আমি ওলো দেখতি কি না?”

“তা সো হয়েকম, এমন আমার কথার জবাব দে—তোব মা তো তোব মা কে কবো গেষ না, কোণে কলগাসে না?”

“না, আমার কলগাসে, দিগে দিলে মেয়ে, আমি মান কলগা নিচে হু হু না ক। আমি মেতমতাসের কাত্তে হাই—”

রেবু, নামিবার চেষ্টা করিল। অনুপূর্ণা আসন দিতে গিয়াছিল, আমিয়া কহিল, “নাও ভাই, আবার আদিলার সময় তোলো, মাও ডাকাডাকি কোবছেন—”

রেবু আর।

“আমি মতিমাল্-কাত্তে থাকবা, কই কাদবো না বা।”

হ্যা, তাহলে তোমার মতি আমার সঙ্গে রাখবে কি না?”

“না মা, আমি থাকবো।”

“তা, থাকনা দিদি—”

“না লো না, বোব হয় জেতা ক না?”

কমলা বলিল, “তাই কি? তুমি কি চাও?”

কমলা বলিল, “হ্যাঁ, বাতী থেকে তোমার
খাসি একবার পলকে ছাড়াতে পারলে যেন
হয়।” “আহ, আশ্চর্য! পাগলি—”

“নিজেরি বস্ত্রের ভাঙে অস্বস্তি ধরেছে
তাই বলে না কেন?”

কমলার চিবুকটা ঈষৎ নাড়িয়া দিয়া,
অকস্মাৎ কহিল, “আচ্ছা বলি ভাই, রাতে
ছলেটাকে একটু দেখিস।”

দুপুরের সময় আকস্মিক হইতে আশ্রয়
দুপুরের কাগজ ছাড়িতে ছাড়িতে ডাকিলেন,
“একবার এসিকে এনে তো যা।

কমলা আসিতে কহিলেন, “ঐ কাগজে
মোড়া দালাতাইয়ের সঙ্গে বাজার খুজ্ তুলে
কেনেছি, দেখো কেমন হলো?”

“আজকে তাকে দি।”

“আচ্ছা, তাই তাকে দাও, অথবা
পেরেছিলে তো?”

“হ্যাঁ।”

“বতীর কোণায়?”

জিজ্ঞাসকে কিরিয়া কমলা কহিল, “জানি
না তো।”

পালকের ঘর হইতে বতীর টুকর দিল,
কমলা এখানেই আছিল। অস্বস্তি কি কিছু
আশ্রয় দরকার পাড়ে?”

“না, বিশেষ কিছু না—তুমি এখনো
কেন্দ্রে বাসি, তাই নিজেস্বরূপ ছিল।”

কমলা, “একবার তেরা কী?” আসিয়া
নাম, “কি জানি?”

“তুমি কিছু নয়।” সন্দেহের ভাষা

কমলা, “তুমি কি চাও?”
কমলা, “হ্যাঁ, বাতী থেকে তোমার
খাসি একবার পলকে ছাড়াতে পারলে যেন
হয়।” “আহ, আশ্চর্য! পাগলি—”
“নিজেরি বস্ত্রের ভাঙে অস্বস্তি ধরেছে
তাই বলে না কেন?”
কমলার চিবুকটা ঈষৎ নাড়িয়া দিয়া,
অকস্মাৎ কহিল, “আচ্ছা বলি ভাই, রাতে
ছলেটাকে একটু দেখিস।”
দুপুরের সময় আকস্মিক হইতে আশ্রয়
দুপুরের কাগজ ছাড়িতে ছাড়িতে ডাকিলেন,
“একবার এসিকে এনে তো যা।
কমলা আসিতে কহিলেন, “ঐ কাগজে
মোড়া দালাতাইয়ের সঙ্গে বাজার খুজ্ তুলে
কেনেছি, দেখো কেমন হলো?”
“আজকে তাকে দি।”
“আচ্ছা, তাই তাকে দাও, অথবা
পেরেছিলে তো?”
“হ্যাঁ।”
“বতীর কোণায়?”
জিজ্ঞাসকে কিরিয়া কমলা কহিল, “জানি
না তো।”
পালকের ঘর হইতে বতীর টুকর দিল,
কমলা এখানেই আছিল। অস্বস্তি কি কিছু
আশ্রয় দরকার পাড়ে?”
“না, বিশেষ কিছু না—তুমি এখনো
কেন্দ্রে বাসি, তাই নিজেস্বরূপ ছিল।”
কমলা, “একবার তেরা কী?” আসিয়া
নাম, “কি জানি?”
“তুমি কিছু নয়।” সন্দেহের ভাষা

“না, আপত্তি কিসের?”

“তাতে নিশ্চয় বাবা, জানাই আর ছেলে
—ভদ্রাং তো কিছু নয়। আমি ঐ বড়
শালবাসি। তা, কিছু পেরেচে কি?”

“হ্যাঁ।”

“আচ্ছা, খুব খানিকটা।” অজ্ঞান
বেড়িয়ে এসো।”

মোদামিনী কহিলেন, “আমি ঘোড়াকে
দেখচি, তুই যা, যতীনের বিজ্ঞানটা একবার
চট কোরে দেখে নে।”

“তুমিই যাও না।”

“তুই কি এখানে চুপ কোরে বসে
শুধু আচলের চাবিই ধোরারি?”

দর্শনার বিজ্ঞাসা করিলেন, “কি দেখা, কি
পেরেচে?”

“হবে আশ্চর্য কি?” মেরেচে তা ভেদ
করেচে, যতীনের বিজ্ঞানটা পলকে বসি
তা, কি নিজে খেলা করলে পল
পেরে।”

“তা, তুমিই যাও, তাই তো?”

“তাই কি, জানি না।” অস্বস্তি
জানি, “কি জানি?”

“তুমি কিছু নয়।” সন্দেহের ভাষা

संविधान संशोधन अधिनियम, १९७१

1. State of the Union of the United States
of America
 2. County of San Diego
 3. City of San Diego
 4. State of the Union of the United States
of America
 5. County of San Diego
 6. City of San Diego
 7. State of the Union of the United States
of America
 8. County of San Diego
 9. City of San Diego
 10. State of the Union of the United States
of America
 11. County of San Diego
 12. City of San Diego
 13. State of the Union of the United States
of America
 14. County of San Diego
 15. City of San Diego
 16. State of the Union of the United States
of America
 17. County of San Diego
 18. City of San Diego
 19. State of the Union of the United States
of America
 20. County of San Diego
 21. City of San Diego
 22. State of the Union of the United States
of America
 23. County of San Diego
 24. City of San Diego
 25. State of the Union of the United States
of America
 26. County of San Diego
 27. City of San Diego
 28. State of the Union of the United States
of America
 29. County of San Diego
 30. City of San Diego
 31. State of the Union of the United States
of America
 32. County of San Diego
 33. City of San Diego
 34. State of the Union of the United States
of America
 35. County of San Diego
 36. City of San Diego
 37. State of the Union of the United States
of America
 38. County of San Diego
 39. City of San Diego
 40. State of the Union of the United States
of America
 41. County of San Diego
 42. City of San Diego
 43. State of the Union of the United States
of America
 44. County of San Diego
 45. City of San Diego
 46. State of the Union of the United States
of America
 47. County of San Diego
 48. City of San Diego
 49. State of the Union of the United States
of America
 50. County of San Diego
 51. City of San Diego
 52. State of the Union of the United States
of America
 53. County of San Diego
 54. City of San Diego
 55. State of the Union of the United States
of America
 56. County of San Diego
 57. City of San Diego
 58. State of the Union of the United States
of America
 59. County of San Diego
 60. City of San Diego
 61. State of the Union of the United States
of America
 62. County of San Diego
 63. City of San Diego
 64. State of the Union of the United States
of America
 65. County of San Diego
 66. City of San Diego
 67. State of the Union of the United States
of America
 68. County of San Diego
 69. City of San Diego
 70. State of the Union of the United States
of America
 71. County of San Diego
 72. City of San Diego
 73. State of the Union of the United States
of America
 74. County of San Diego
 75. City of San Diego
 76. State of the Union of the United States
of America
 77. County of San Diego
 78. City of San Diego
 79. State of the Union of the United States
of

"কোনো এক-কিছুই ভাবা-কাজে কোনো
 কোনো একজন ব্যক্তির দখলিলা হবার
 কোনো এক-কিছুই—সদ্য কোনো এক
 কোনো একজনকে কি। জাহাজে
 কোনো একজনকে কি। জাহাজে

বিশেষ, হোমার পঞ্চদশ তু. ২. ২০০—
 বাবে, গিছানা তুঙ্গে ফেলিয়া বঁ. ২০০
 মনসে করিল।"

সুখের শিখর প্রতি চাহিয়া লইয়া যাইল।
করমলকে ডাকিল, “এখনি” পরে বেলা,
সুখকোই খোঁকার হাতেই আসিবে ? কপাল
হাত ধরি বেলিল, “সে নাহি এলহাদের
সিঁথের চিহ্নেই !

[illegible]

১৯৪৭ খ্রিঃ ১০/১১/৪৭

आमर अशांत देशात आज बदल क
सात ठावरून ते के आहेत बदलाने न
होत आहे

1. 1950-1951
 2. 1952-1953
 3. 1954-1955
 4. 1956-1957
 5. 1958-1959
 6. 1960-1961
 7. 1962-1963
 8. 1964-1965
 9. 1966-1967
 10. 1968-1969
 11. 1970-1971
 12. 1972-1973
 13. 1974-1975
 14. 1976-1977
 15. 1978-1979
 16. 1980-1981
 17. 1982-1983
 18. 1984-1985
 19. 1986-1987
 20. 1988-1989
 21. 1990-1991
 22. 1992-1993
 23. 1994-1995
 24. 1996-1997
 25. 1998-1999
 26. 2000-2001
 27. 2002-2003
 28. 2004-2005
 29. 2006-2007
 30. 2008-2009
 31. 2010-2011
 32. 2012-2013
 33. 2014-2015
 34. 2016-2017
 35. 2018-2019
 36. 2020-2021
 37. 2022-2023
 38. 2024-2025
 39. 2026-2027
 40. 2028-2029
 41. 2030-2031
 42. 2032-2033
 43. 2034-2035
 44. 2036-2037
 45. 2038-2039
 46. 2040-2041
 47. 2042-2043
 48. 2044-2045
 49. 2046-2047
 50. 2048-2049
 51. 2050-2051
 52. 2052-2053
 53. 2054-2055
 54. 2056-2057
 55. 2058-2059
 56. 2060-2061
 57. 2062-2063
 58. 2064-2065
 59. 2066-2067
 60. 2068-2069
 61. 2070-2071
 62. 2072-2073
 63. 2074-2075
 64. 2076-2077
 65. 2078-2079
 66. 2080-2081
 67. 2082-2083
 68. 2084-2085
 69. 2086-2087
 70. 2088-2089
 71. 2090-2091
 72. 2092-2093
 73. 2094-2095
 74. 2096-2097
 75. 2098-2099
 76. 2100-2101
 77. 2102-2103
 78. 2104-2105
 79. 2106-2107
 80. 2108-2109
 81. 2110-2111
 82. 2112-2113
 83. 2114-2115
 84. 2116-2117
 85. 2118-2119
 86. 2120-2121
 87. 2122-2123
 88. 2124-2125
 89. 2126-2127
 90. 2128-2129
 91. 2130-2131
 92. 2132-2133
 93. 2134-2135
 94. 2136-2137
 95. 2138-2139
 96. 2140-2141
 97. 2142-2143
 98. 2144-2145
 99. 2146-2147
 100. 2148-2149
 101. 2150-2151
 102. 2152-2153
 103. 2154-2155
 104. 2156-2157
 105. 2158-2159
 106. 2160-2161
 107. 2162-2163
 108. 2164-2165
 109. 2166-2167
 110. 2168-2169
 111. 2170-2171
 112. 2172-2173
 113. 2174-2175
 114. 2176-2177
 115. 2178-2179
 116. 2180-2181
 117. 2182-2183
 118. 2184-2185
 119. 2186-2187
 120. 2188-2189
 121. 2190-2191
 122. 2192-2193
 123. 2194-2195
 124. 2196-2197
 125. 2198-2199
 126. 2200-2201
 127. 2202-2203
 128. 2204-2205
 129. 2206-2207
 130. 2208-2209
 131. 2210-2211
 132. 2212-2213
 133. 2214-2215
 134. 2216-2217
 135. 2218-2219
 136. 2220-2221
 137. 2222-2223
 138. 2224-2225
 139. 2226-2227
 140. 2228-2229
 141. 2230-2231
 142. 2232-2233
 143. 2234-2235
 144. 2236-2237
 145. 2238-2239
 146. 2240-2241
 147. 2242-2243
 148. 2244-2245
 149. 2246-2247
 150. 2248-2249
 151. 2250-2251
 152. 2252-2253
 153. 2254-2255
 154. 2256-2257
 155. 2258-2259
 156. 2260-2261
 157. 2262-2263
 158. 2264-2265
 159. 2266-2267
 160. 2268-2269
 161. 2270-2271
 162. 2272-2273
 163. 2274-2275
 164. 2276-2277
 165. 2278-2279
 166. 2280-2281
 167. 2282-2283
 168. 2284-2285
 169. 2286-2287
 170. 2288-2289
 171. 2290-2291
 172. 2292-2293
 173. 2294-2295
 174. 2296-2297
 175. 2298-2299
 176. 2300-2301
 177. 2302-2303
 178. 2304-2305
 179. 2306-2307
 180. 2308-2309
 181. 2310-2311
 182. 2312-2313
 183. 2314-2315
 184. 2316-2317
 185. 2318-2319
 186. 2320-2321
 187. 2322-2323
 188. 2324-2325
 189. 2326-2327
 190. 2328-2329
 191. 2330-2331
 192. 2332-2333
 193. 2334-2335
 194. 2336-2337
 195. 2338-2339
 196. 2340-2341
 197. 2342-2343
 198. 2344-2345
 199. 2346-2347
 200. 2348-2349
 201. 2350-2351
 202. 2352-2353
 203. 2354-2355
 204. 2356-2357
 205. 2358-2359
 206. 2360-2361
 207. 2362-2363
 208. 2364-2365
 209. 2366-2367
 210. 2368-2369
 211. 2370-2371
 212. 2372-2373
 213. 2374-2375
 214. 2376-2377
 215. 2378-2379
 216. 2380-2381
 217. 2382-2383
 218. 2384-2385
 219. 2386-2387
 220. 2388-2389
 221. 2390-2391

[illegible]

“उत्तिष्ठ” इति । तदा न किञ्चिद्वाच्यं ।
 त्रिंशत्तमोऽध्यायः समाप्तः ।
 अथ चतुर्थः ।

[illegible]

जावेत कि ये मास मन १०० जाय

সকলের কাছে পড়ি কিছু গল্পগীত
শ্রদ্ধা ভাঙতে হয়। কিন্তু দিন যায়
নিঃস্বপ্ন হয়ে থাকে। তবু নন্দন
তিমিরান বহা দিকের কাঁচা মাংস
আর নাওন

[illegible]

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

[illegible][illegible][illegible][illegible]

1992

[illegible]

1. The first part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice" and "The Hon. Mr. Justice".

१. निम्नलिखित दोनो प्रश्नों का उत्तर दीजिए।
 (क) यदि $\sin A = \frac{3}{4}$ हो, तो $\cos A$ का मान ज्ञात कीजिए।
 (ख) यदि $\tan A = \frac{1}{\sqrt{3}}$ हो, तो $\sec A$ का मान ज्ञात कीजिए।
 (ग) यदि $\csc A = \frac{5}{4}$ हो, तो $\cot A$ का मान ज्ञात कीजिए।
 (घ) यदि $\sec A = \frac{5}{3}$ हो, तो $\tan A$ का मान ज्ञात कीजिए।
 (ङ) यदि $\cot A = \frac{4}{3}$ हो, तो $\csc A$ का मान ज्ञात कीजिए।

১৯৪২ সালের জুন মাসে, মুক্তি
 ফৌজের সূত্রের আশ্রিত স্বাধীনতা সংগ্রাম
 বা স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়ে
 জাতিসংঘে যোগদান, "স্বাধীনতা সংগ্রাম" শিরোনামে
 ১ম : স্বাধীনতা সংগ্রামের ১ম দফা

১৯৪৭-৪৮ খ্রিঃ বর্ষে পাইল
১৯৪৮-৪৯ খ্রিঃ বর্ষে পাইল

[illegible]

100-443887-100

[illegible]

সংস্কৃত গদ্য রচনা

1945

[illegible]

1. The first part of the report is a general introduction to the project, which includes a brief history of the project and a statement of the project's purpose.

১৯৭১ সালের ৩১ মার্চ
 বাংলাদেশের স্বাধীনতা
 ঘোষণার দিনে
 ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে
 প্রথমবারের মতো
 বাংলাদেশের পতাকা
 উত্তোলিত হয়।
 এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে
 সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের
 একটি অংশ।

THE

এক বন্ধু কহিতে লাগে, "তোমার বন্ধু
তোমার কাছে একটা বন্দোবস্ত করে দাও না
কেননা আমায় তোমার দারিদ্র্য বজায় রাখতে
হয়—কেননা তাকে আশ্রয় দিলে সব বিধবাস
করবে।" তাহার মাঝিবে।"

प्राप्तिके प्रति आपन, दिवस

[illegible]

१. संस्कृत-सामान्य भाषा, अक्षर, ध्वनि, शब्द,
 वाक्यविज्ञान, व्याकरण, भाषाशास्त्र, साहित्यिक
 निबन्ध, कविता, नाटक, उपनिषद्, आदि।
 २. संस्कृत-विशेष भाषा, अक्षर, ध्वनि, शब्द,
 वाक्यविज्ञान, व्याकरण, भाषाशास्त्र, साहित्यिक
 निबन्ध, कविता, नाटक, उपनिषद्, आदि।

THE UNITED STATES OF AMERICA
DEPARTMENT OF THE ARMY
OFFICE OF THE CHIEF OF STAFF
WASHINGTON, D. C. 20315

১০. বি. বি. স্কোয়ারে আজ চারিদিকের দোকান-বাড়ি
 বিহীন বৈরাগ্যময়। অসীম বিস্তৃত, বৈরাগ্যময়
 বালি, আশ্রয় কুঠার এটা বৈরাগ্যময়।

কমলা অসিদ্ধা দেখিল। কিন্তু সে আই-
নিসিদ্ধি একটা ভাটিয়া পিরাহির খাদ্য
দোষাবিরতির হাতে তুলির দিতে তিনি যেটা
তু ডিক্স উত্থানে কেঁদো দিয়া কলিকেন, আর
দোষাবিরতির হাতে তুলির দিতে তার না-
পুত্রে না পুত্রে আরো দোষাবিরতির নীর নেই
একেবারে হস্তক্ষেপে রয়ে গেছে, তবে শুধু
কি ছোলেটাকে গলা টিপে ধরতে পারে
কাদের টুকরে তুলে। পড়ে যাবে
আর একটা বার করে পড়ে, তার
পদ্যার অভাব নেই।

কমলা আর সামলাইতে না পারিয়া কহিল
কেনিল, "তোমাকে কে করতাই বা বলে?"

[illegible]

१. विद्यार्थी, २. प्रशिक्षक, ३. प्रशासक, ४. शिक्षक,
 ५. अभिनेता, ६. निदेशक, ७. निर्माता, ८. निर्देशिका,
 ९. निर्देशिका, १०. निर्देशिका, ११. निर्देशिका, १२. निर्देशिका,
 १३. निर्देशिका, १४. निर्देशिका, १५. निर्देशिका, १६. निर्देशिका,

খাবে। আমার হৃদয় কান্না পানিয়ে দাও।
শিখারের দিরেই বন কতক বা উড়িয়ে দিচ্ছি।”

কেন কি হয়েছে?

কিন্তু অসুস্থ জ্বর দেখতে পাবেন, বাপ।
হেঁচকে আমাকে তো তাড়ালে, আর বে-
মেসের ঘুমের বা পর্যাপ্ত নেই, ওমা, ভাবকে
কিনা চোখের জল ফেলতে ফেলতে যেতে
হোলো—কেন, তোমো কি বাড়ি নয়? এমন
একবারেই মেসের আমার পেটে জন্মাবে যদি
আপো জানতুম তো আঁতুড়বার ঘুম গিলিয়ে
মেসের গাশতুম। আশুতুটুয়ের কাছে যার
অন্তে মথ হেঁট হয়, তার সুখদর্শন করলেও
পাপ। থাক, এমতো বণাবকির দরকার
নেই, আমাকে বিদেশ করো—”

বণাবকিও কিঞ্চিৎ উদয় উঠিয়াই কহিলেন,
“অচ্ছা, অচ্ছা থেকে এই এলুম, এখনি কি
তোমার গলাবাজি না করলে একবারেই
ফেরে না।”

“আমিই তো বড় গলাবাজি করি, মেসে
একবারেই মৌনী, কথা বলেন না শুধু কানড়
লিহে আনেন। এত বড় আপ্পদা মেসের,
আমাকে বলে কিনা, তুমি করো কেন? আর
মোক্ষা, আমি কি গাশে করি? তোমার ছেলে
বলতে বেতেন কহি—আমার জাপ কদিন?
তিনবালার এক প... থেকেচে, শাসাবাগে
শাসাবাগে হারান। কি আমি সেরে রেখেছি?
তোমার ছেলে কানড় লিহে যাবে—আমি?
কেন, আমার কি ছেলে কখনো হয়নি?”
বহুদিনের বিষ্ময় একটা কলমুওড় আরক
করিয়া উঠার চোখে... এত বারে “ভিগা
আসিল।

“থাক, এখন কি খাবার হয়ে গেছে?”

সোদামিনী উত্তর দিলেন না।

“কেন কি পাবো না?”

“আজ্ঞা, কেবল কখন।”

“তুমি যাচ্ছো কিনা?”

“আমি পাবি না।”

কিন্তু মনে মনে না ছাড়িয়াই বণাবকি
কহিলেন, “আজ কিছু চাইনি না, এতদিন একটু

বাড়িবার জল পানিয়ে দিও। সন্ধ্যায় পাবে।

তুমি থেকে না।”

“থেকে চি।”

“কই থেকে?”

“আজ আর কিছু নেই।”

ঘটির সঙ্গে চোখ মুক্তিয়া করিয়া তাড়িতে
চাপতে ধটপট কহিলেন, “কপালটা আমার
নিষ্ঠারই মঙ্গল না, নিষ্ঠারই মঙ্গল।”

*

*

আজ বাদলের আর বাধাবিধি ছিল না।
গভীর রাত্রে সে ঘুরিতে ঘুরিতে বণাবকি
জড়াইয়া কখন যে প্রদীপের কাছে গিয়াছিল
এবং একেবারে লজ্জাকাণ্ড বাধাইয়াছে বোঝা
গেল না। ঘরে দৌয়া দেখিয়া বণাবকি
সামান্য সেটুকু তজ্জাবেশ ছিল তাহাও উভায়
হইয়া যায় এবং সে ভয়ঙ্কর দৃশ্য সম্পূর্ণ অসমর্থ
করিবার পূর্বেই, তিনি চীৎকার করিয়া
লালচিয়া উঠেন, “ওগো, ঘরে আশুন
লেগেচে যে।”

মুহুরের মধ্যে সোদামিনী বাহ্যকে লজ্জা
হরণের বাহিরে আসিয়া গড়িয়া কমাগকে
সজোরে এক ধাক্কা দিয়া তুলিয়া দিয়া কহিলেন,
“নে, ছেলে ঘর—”

কমলা চিহ্নার জন্ত একেবারেই প্রস্তুত ছিল
না—আড়ষ্ট, হতভম্ব, সঙ্কুচিত সে বাদবাক
কালে তুলিয়া লইতে যেমন বাধা হইল
সোদামিনী জন আসিবার জন্ত ভীতির ভয়ে
ছুটিয়া গেলেন। তারপর একটা অম্বক
কোলাহল, অনন্তক হড়াহড় আর ত্রুণ বাস
পেশাসের লুককাটী শব্দ।

কিন্তু আজ এই প্রথম, কমলা জাঃ চোখ
মেলিয়া চাইিয়া দেখিতে পারিল না, তাহা
নিগাস যেন নিঃশব্দে নিঃশব্দে হইয়া আসিয়াছে
ছিল—কমাগমক বর্ণন ছাড়া, তাহারই কোলাহল
ওইয়া, তাহারই লজ্জাভাক বণিল, তাহারই
দিকে চাহিয়া সে কি যাসি...
ওইয়া, আশ্চর্যের...
ওইয়া, ত্রুণপরিচি...
ওইয়া, ত্রুণপরিচি...
ওইয়া, ত্রুণপরিচি...

কালো বো

শ্রীমানিক ভট্টাচার্য্য কি এ. বি. টি.

তিনি যখন বসিলেন নিচন এক ব্যাগিষ্টার
কম্বোয়ন, তখন তখন তদেব ওগায়ে বেড়িয়ে
আসি, তখন যে বিজয় বাবুকে দেখিব তখন
সেটেই ভাবিলি। প্রথমটা সত্যই একটু
চমকিতা উঠিয়াছিল। ভাগ্যে উনি সেটা
দেখিতে পান নাই—নহিলে হয়ত একটা
সিদ্ধান্তে বলিতে হইত।

মৎস্যের দশ হইয়া গিয়াছে, বিজয় বাবুর
তোহা প্রায় ভেদনই আছে। মুখের সেই
যে একটা কঠিন ভাব, বালাকে অন্তলোকে
বলে দৃঢ়তা, কিন্তু আমি বলি অহঙ্কার
সেটা বোঝাই আছে।

ভাষা দ্বীপেও দেখিলাম পূর্বকথা
আরও বেশি করিয়া মনে পড়িয়া
গেল। এতদিন পরে আবার মনে সেই
সিদ্ধান্তের ফোঁস উদয় হইল। সেদিন
বিজয় বাবু, সোমবার ৭ ইঞ্চিয়ার ডাব
যে একটা তাহিলের আসাত অন্ততঃ
কিছুটা পান, সেটা যেন আবার স্বাভা-
বিকভাবে বাকিল। তাঁহার দ্বী অন্ততঃ
কিছু স্বাক্ষর হইলেও মত প্রত্যয় মনে
হইত না। কিন্তু ইনি একবারে কহিল
—নাহ না জানিলে কালো বো বহিয়া
জানি বো চলে।

আমার মনে মনে চাই বিজয় বাবুকে
কিছুটা পান, সেটা যেন আবার স্বাভা-
বিকভাবে বাকিল। তাঁহার দ্বী অন্ততঃ
কিছু স্বাক্ষর হইলেও মত প্রত্যয় মনে
হইত না। কিন্তু ইনি একবারে কহিল
—নাহ না জানিলে কালো বো বহিয়া
জানি বো চলে।

মানার কাছে বাবা আমার দ্বিতীয় উদ্যোগ
বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। উনি
মানার বাড়ী আসিয়াছিলেন; আর ঐ মানাই
তাঁহার সংসারে একমাত্র আশনার বলিতে
ছিলেন। নামটি একটু অল্পত প্রেরণা
লোক। অগ্নয়ের প্রতি তাঁহার কি কতখান
সেইটুকু করিয়াই শুধু কান্ড হইতেন।
অপদের উপর তাঁহার কি দাবি তাঁহার
হিসাব কোনো দিন রাখিতেন না। বাবা তাঁহাকে
জানিয়া ঐ কথা বলিতেই তিনি বলিলেন
‘এ তো সৌভাগ্য। আপনার দয়া। আমি
বিজয়কে জিজ্ঞাসা ক’রে কানাই একটু
আপনাকে বলে যাব।’

পর দিন আসিয়া তিনি বলিয়া গেলেন
যে বিজয়ের উদ্যোগে অনিচ্ছা। বাবারও
কি বকম নৌক হইয়াছিল তাঁই পুনরাব-
তিনি বলিলেন—‘তুমি বোধ কর তেমন করিয়া
বল নাই। নহিলে অনিচ্ছার কি কারণ
হইতে পারে। আমার মেয়ে খুব সুন্দরী,
আমি পছন্দ করি।’

তাঁহার রাম্য একটু ইতস্ততঃ করিয়া
বলিলেন—‘সে বলে খুব ধনী, মেয়ে বা
খুব সুন্দরী মেয়ের সে উপযুক্ত পাঠ নাই।’

বাবার ছোখ মূৰ হইয়া পাল হইয়া
উঠিল। আপনাকে ঠিক যেনা পাই নাই
করিতে পারিলেন না একটা তাঁহার কল
তাঁহার কল্যানে প্রতিটি মেয়ের ব্যবহার
একটু বেশি কল্যানেই বোঝা যায়।

হাছিল। তিনি রাহা গ্রাহ না কবিরায় চলিয়া গিয়াছিলেন।

কুমারের পাশে দাঁড়াইয়া সব কুমির একটা আমি তখন আগে তিনটা কইয়া ফুলিতেছিলাম। এত বাগ এইতেছিল বাবার উপর!! আমার কপের তব, আর আমার বাবার অকৃত্ত ঐখার্যের কথা খনিয়া কুমিয়া আমার এমনই ধাবনা কইয়া গেল। এত যে এত ছাড়া পূর্ণবাহতে আর যে অকৃত্ত কথা থাকবে পাশে ভাই চট্ কবিরায় মনে এই না। আবারে সর্বস্ব পণ কবিরায় দান কবিরায় উক্ত ধান্যনিও কইবারও 'ন' লোকের অধিক কইত না। এখানি বাবা কেন কে কইতানি লোকটার নিকট খাটা এই। গেলাম। বাবা যে রাসের কল বিকৃত বাবা মাঝেতে জাতি লগ কল কথা কুমারের দিয়াছিলেন ভাষাতে আশ্রয় পাইই কইয়াছিলাম। ভাবিতা ছিলাম। 'ন' ন গিয়া কলজনা কল গবনে উহা ব'নিমেহতে বলো। কল এ মাটির দরাস এতই অকৃত্ত যে খারাপ জিনিসগুলি তিনি নিজেই হাতিয়ে গল্পিয়া কবিরায় মনে; অপরায় ভক্ত খান একটা কলও রাগিয়া দেন না। এই বিজয়বাবু বাবার কথার কিছুই খানিতে পারিলেন না, নিজের অহঙ্কারেই অকৃত্ত রহিল। পরদিন বিজয়বাবু আমাদের স্থান হইতে চলিল।

অতঃপর সত্য সত্য যে সময় আমার মনটা কোমরে আক্রমণে যেন ফাটয়া বাহতেছিল। সেকটা বহি আর দিন কতকও জানে থাকিত 'ত' কারাকেও দিয়া ছটা কল কথা কুমারের দিয়া হইত' একটা শান্তি পাইতাম।

বিজয় বাবা কুমারের কবিরায় কলজনা কল মাই। ডাকার কথাও আমি ভাবি মাই। না, বাবা যে উহাকে কলজনা করিতে পারেন একখাটা মনে উদয় কই নাই। আর কে একজন গ্রেটম্ কলজনাশিপ লইয়া বিলাত বাহতেছে, বা ইংরাজী সাক্ষী সে খুব ভাল জানে ইহাতে কোনো কলজনা যে কিছু কোড কলজনা কথা শতা আমি মনে কল না। কল 'আমবে' কল প্রত্যক্ষান করিতে পারে এ কপাটা আমি কোন দিন মনে করিতে পারি নাই। সে প্রত্যক্ষানটা বাগের পথের থাকবে কলজনা মেয়ে কলজনা বড় একটা দটে না গ্রাহ কলজনা কলজনা ও পিতার অগান কলজনা কলজনা কইতে কইল। সে ধপমানের কলজনা বড়ই লাগিয়াছিল। 'নত' এই কলজা জীবনে একটা দগা থাকিয়া দলিত। এমন সময় আমিও কলজনা গবনে চপের উদয় কইল। কল জগে' অলুপম মনের মত পান' শাভ কবিরায় আমি কলজনা কলজনা গেলাম।

তারপর দল বৎসর পরে এই দেখা। বিজয়বাবু যে আমাকে চিনিতে পারেন নাহ তাই বাচিয়াছি, নথিলে অপমানের আঘাতটা বাবা বাবার খানিকটা নশ্ব হইয়া উঠিত।

বাড়িতে নবাবজীবের অযোগ্য সাধারণ হিন্দু গৃহস্থের ভাবটুকু বেশী করিয়া চোখে পড়িত। বাহজাগটা কিছু কিছু বিদেশীভাবে সজ্জিত হইলেও বাড়ীর স্থিতিরাস একেবারে বেশী ভাব। কলজনা বাগিরারের গড়ে এটা যেন বড় দাড়াবাড়ি কলজনা বোধ হইল। বিজয়

আমিও গিয়েছিলাম। আসিলাম।
কিন্তু সেখানে মোহনকে দেখি না।
আমি চাইতাম। তাঁর দ্বীপে আরও একটু
উঠে উঠিয়াছিলাম। বাঙালি দেখিলাম খালি
পায়ে থাকেন। হাফ, পক্ষ্মনখান বলিলেও
চলে। স্বামীক বিশেষ অঙ্গুরোধ থাকিলে অল্প
পুরুষের সম্মুখে বাহির হন। নহিলে নয় কথা
বাঁহাটের দরজা কখনো নামে। কখনো
‘অদুর্ভাগ্য’। ও নামটি আরও ভালো নয়।
‘না’। আর ‘কালো’। এই বলিল।

আমি হিন্দুদের মত কাণো বৌ আমাদের
প্রণাম করিল। তাৎপদ স্বরূপে তা প্রস্তুত
করিয়া আমাদের কখনো ও বিজয় বাবকে
ছিল। আমায় আশীর্বাদ। যেন এটুকু ভাল লাগিয়া।
আমিও বলিলাম—‘আমনি খায়ে না, যখন
তখন আপনাদের মত কষ্ট করে। ইতি কবি
পেয়ে আমাদের সফল করবে।’

কাণো বৌ আমায় স্বামীর গানে একবার
জাহিরেই আমায় উঠিলেন উনি ‘চি-
খান না।’

আমরা গল্প করিতে করিতে চা খান
করিতেছিলাম। বেশ একটা কবিয়া দেখিলাম
কাণো বৌ আমায় স্বামীর কথাবার্তা শুনিতে
শুনিতে এক ইকবার তখন কখনো নাহিলেই।
দশা সত্য। চকু দুইটিতে এমন একটা
জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিলেই যাহাতে অল্প কাল
নাথকেও এক একবার মুন্দর বলিল। ‘না’
কহিতেছে। আমায় স্বামীর চকু। সেটুকু
প্রভার নত। আমায় মনোভা একটা
লাগিল।

কাণো বৌ নিজেই হইতে বলাও বড়
একটা কাল নাই। কিছু কিছু জিজ্ঞাসা করিলে

খুব শিষ্টভাবে উত্তর দিয়াছে। এই পর্যন্ত।
এমন সময় একটা বছর ‘পাচেকের’ জেজ
আমিও কাল বৌকে জড়াইয়া গিয়া বলিল—
‘না আর পড়াবে না?’

কাণো বৌ জেজকে দূর করিয়া মুখে
চুষন দিয়া বলিল—‘আর না। নিজে খেদা
করবে। আর ও খেদা পড়াবা। তাৎপদ
কাণো বৌ চুপি চুপি কি কবিয়া দি-
লেবেই। কোন খেদা নাহি। আমাদের
জাতীয় ওত দিয়া পণ্যায় করিয়া চান্দা খেদা।
বেশ জেলেটি।’

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—‘এব কখন
মস্তার বাগেন নাই?’ বিজয় বাব বলিলেন—
‘না’। আমায় স্বী। আমায় পড়াবা। আমায়
এসে চা। দেওয়া, আমায় ও আমায় বাঁচাওয়া
নিজে জেজ পড়াবা। আমায় ও আমায় ও আমায়
বড়ই বাড়াবাড়ি বলিয়া আমায় ও আমায়
উপর অল্প আশীর্বাদ সফল। আমায় ও আমায়
সময় স্বামীর কাছে দাঁজন বা আমায়
মথের গানে চাইবা। আমায় ও আমায়
অশোভন লাগিল। আমাকে আমায় ও আমায়
বাসিলা থাক। আমায় ও আমায় ও আমায়
ক’ দরকার না।

ওত বকিতে আমায় ও আমায় ও আমায়
আমায় আমায় আমায় আমায় ‘আমায় আমায়
আমায় আমায় আমায় আমায়’

উত্তরে আমিও নিপুণতামানী কবিয়া
নিয়ন্ত হইলাম। আমায় আমায় আমায়
বার ও আমায় আমায় আমায় আমায়
আমায় আমায় আমায় আমায় আমায়
আমায় আমায় আমায় আমায় আমায়
আমায় আমায় আমায় আমায় আমায়

আমি একটু হাসিয়া বলিলাম—“বাক্সে
বাক্সে জুতা খুলিতে হইলে আমি কিছু আর
আসিবনা।” কালোবৌ হাসিটুকু ফিরাইয়া
দিয়া বলিল,—“আপনি জুতা পরেই আসি-
বেন।” আমি বগম জুতা পরেই “দেউ না,
আমার কথা স্বতন্ত্র।”

জিজ্ঞাসা করিলাম—“আপনার স্বামী
কথা।”

কালোবৌ উত্তর দিল —“আমি সব
বিষয়েই পূর্ব যাদুসিধে মাঝে থাকি অভ্যাস
আব বলেন মাঝে মাঝে মাটির সঙ্গে পায়ের
সম্পর্কটা রাখা শরীফের পক্ষে হাদা ২০ মন
নয়। তার উপর সব রাজ্যের ধুলে জাল
সঙ্গে আনার কি দরকার।

পার একটু হাসিয়া শোবার বলিল
ববিবাবর জাপানের পক্ষে ছিলনা—জাপান
নীরা বেশ জানে যে জাপানি বাইরের জাপানি
আব পাঠটো দলের হাত জাপান বাইরে
রেখে—খানি পায়ের দলে ঢেকে।”

এটা সত্য কথা যে জাপানি বৌটাকে
মন দেবার না।

আমার মুখেই পামে চাহিয়া গেলো আব
জানিলে এ সৌন্দর্যটুকু বৌটা বোঝানো কি?

জিজ্ঞাসা করিলাম—“আপনার পায়ের
জায়গা কোথায়? পায়ের দেবনা হ, কে
লাই না?” “কৌটি পাত্তারি উত্তর দিল,
উনি এ টোপিলে পাত্তা না মেয়ে, কে পাত্তা
“আব আপনি?”

“আমার পাত্তা ছেড়ে দিন। পাত্তা হ
উনি হুজুরি আমায় হুজুরি।

“বউ! দার বক খালিদা হচ্ছে থাকে
নেই!”

“আমার বৌটা হয় নেই; হুজুরি হুজুরি
গেলেন খালিদা হল কৈ।”

কিছু হুজুরি যে হুজুরিগার জয়েছে,
হুজুরিগার মাক্স হুজুরি, হুজুরি শিক
পেরেছে। দৈবগতিক বিবাহ হ’ল ব’লেই
যে সব হুজুরিগার হুজুরি এক হুজুরি তার মানে
কি? হুজুরি না হুজুরি কোনো শক্তি
নেই বলুন?”

“এমন একটা সময় আসে যখন মেয়ে
মাক্সের নিজেই হুজুরি ছেড়ে দিয়ে মালবাসাব
জেনেব কি দরকার, কি হুজুরি হুজুরি এই সবই
মানে আসে। আমার বৌ হুজুরি নিজের অজান্তে
মানে দরকার হুজুরি যায়।”

সিক পাত্তারি হুজুরি আসে না। বৌটা
বেগ কথা কয় না বউ কিছু, হুজুরি হুজুরি
বহিবে পায়ের দেবিগার।

শোবার দলে বিজ্ঞানি
‘বিভলভি’ শেসক’ মোকাই বহু। জিজ্ঞাসা
করিলাম “শোবার দলে দেব কেন? কালো
বৌ বলিল “বাক্সে আসে তার পাত্তা শুনা
কথা আসে না।”

“শোবার না পাত্তা?”

“কালোবৌ, হুজুরি হুজুরি হুজুরি, উত্তর
দিল—হুজুরি হুজুরি।”

জিজ্ঞাসা—“এমন একটা সময় আসে যখন
মাক্স সব পাত্তা হুজুরি হুজুরি “মাইলি”
বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—“এই হুজুরি হুজুরি
বাক্সে হুজুরি হুজুরি হুজুরি হুজুরি হুজুরি
“একটু পায়ের জামে আসে হুজুরি। হুজুরি
একটু হুজুরি হুজুরি হুজুরি হুজুরি হুজুরি
“জুজুরি আসে হুজুরি হুজুরি হুজুরি হুজুরি
হুজুরি হুজুরি হুজুরি হুজুরি হুজুরি হুজুরি

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম “রান্নাও ক’ত্তে হয় নাকি ?” কালো জোঁ বলিল—“একটী তর-কারি রান্না, মিলে ওর ডাল খাওয়া হয় না।”

“বলেন বড়ি রান্নাও ? খেতে পারি না ব’লে বলাই হ’ল একরকম।”

“না তা কিছু বলেন না। এটা ভাল হয়নি, বা এটা আমি খেতে পারি না—এ সব কথা জুখনো ওর সুখে শুনি নাই। ভোগবিলাস ওর কিছুই নাই।”

“এ বড়ি মন দিয়ে মন বুঝ করেন ? আচ্ছা আপনি ত’ এত করেন। এর পর-বর্ত্তে উনি কি করেন ?

“ও’র ভালবাসা প্রকাশ্য নাগরের মত।
হাটের দ্বিধা কিন্তু দিওরে তসীম। এ

আমাকে না ক’ত্তে দিলে আমি হুংসে মন সেইজন্য বারশ ক’ত্তে পারেন না। কোনে রকমে আমি ও’র যোগা নই—আমার চেহারা দেখেই তা বুঝতে পাচ্ছিন। তা ও’র এত ভালবাসা।

কালো বোয়ের চক্ষে অশ্রু ফুটিয়া উঠিল আমি অন্তরিক্তে মুখ ফিরাইয়া হাসিলাম।

উঠিবার সময় কালো বোঁ আমাদে-
ওজনকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

মোটরে কিরিবার পথে স্বামী আমাদে-
জিজ্ঞাসা করিলেন—“কেমন দেখিলে ?” আমি
নাক সিটকাইয়া বলিলাম—“বজ্র সেকলে।”

তিনি একটু গম্ভীর হইয়া শুধু বলিলেন—
“ওঁ।” (ক্রমশঃ)

বৈচিত্র্য

শ্রী আময়চন্দ্র চক্রবর্তী

(ক)

১। “স্বরোপ মানুষের সব জিনিষকেই
বিজ্ঞানের স্তরকথেকে খাচাই করচে কিন্তু মানুষ
পদার্থটা যে কেবলমাত্র দেহতত্ত্ব, কিম্বা
জীবতত্ত্ব, কিম্বা মনস্তত্ত্ব, কিম্বা বড় জোর
সমাজতত্ত্ব নয়, লোহীট তোমাদের সে কথা
কুলো না।” (ববীজনাথ)

২। বিজ্ঞানের আধুনিক পদম পদম
জাগে পৃথিবীতে যে সব দৃশ্যবিরোধ হত সে
বেন একটা ঘরে অনেকগুলি ছুরক চেলে
কুটলে বেমন বগড়াবগড়ি করে তেজনি।
তার পদম্পরের সেইটুকুই অনিষ্ট করতে
পারত সেইটুকু শুধু নিজের শক্তির দ্বারা করা
সম্ভব। বর্তমান যুগ কি করেছে ? না

সেই ছুরক চেলেগুলির প্রতি জাতীয় দেহ
পরবশ হয়ে এক বার্থ মঙ্গলকামনার পরি
পূর্ণ হয়ে তাদের কাছে এসে বলেছে—“ওগে
ছোট ছেলের দল, বর্তমানের এই সভ্যতার
যুগে জায়ে শেষে কিনা তোমরা সেকেরে
বলবদের প্রথা অস্ত্রারে ঝুলহ করছ ?—
এও কি তোমাদের মানায় ?—তোমরা মাছ
সব মত, বুদ্ধমানের মত, সভ্য, সুসভ্য
সুসভ্য জীবনের মত আধুনিক বৈজ্ঞানিক
প্রণালীতে নিজ নিজ মনোমালিন্য দূর করতে
লোণ বাও, আমবাও বেশি, আমাদেরও
দেখে একটু সুখ হোক।”—এবং এই বলে
অকৃত্রিম হিতাকাঙ্ক্ষীর মত আনন্দদীপ্ত মুখে
তার প্রেক্ষাগরে একেবারে নতুন কলে মত

শিল্পের তৈরী চক্ৰকে বিষমাত্মনে ছোঁয়াছুরি, আশুগ্ন রাগানো বোমা, বিষমাল্পপূর্ণ যন্ত্রপাতি প্রভৃতি যুদ্ধবিবারণ ও শাস্তিরক্ষণের বিচিত্র আত্মাধুনিক কাজসরঞ্জাম বেশ নগ্নেই পল্লিমানে দিয়ে গেছে।

এইবার যন্ত্রকার বহুরূপ হয়েছে বড় এবং তার নেশাও জমেছে খুব, এখন শাসক-শাসিতাঙ্গীরা একেবারে পূর্ণ সমাধানের সমস্ত বুকি এল বলে। (জেনারেল)

৩। সভ্যতার সম্পদের সঙ্গে তার বিশেষ হাতে হাতে এগিয়ে চলেছে। (নেটারালিস্ট)

৪। কোথাও একটা কাজ খুব দ্রুতভাবে কেনীমতে করে কেউতে চেষ্টা করলে সেটা শীঘ্রই অতি পুরাতন এবং জীর্ণ হয়ে পড়ে। এই কারণেই আধুনিক কলকারখানার সভ্যতা এত “উন্নতি” হওয়া সত্ত্বেও তার সঙ্গে মানুষের আদিম বর্করতায় এমন একটা সৌন্দর্য্য চোখে পড়ে। (চেস্টারটন)

৫। আধুনিক যুগকে শিক্ষা এবং উন্নতির মধ্যে ঘোড়দৌড় বলতেই চলে, দেখা দাঁড় কে জেতে। (জেনারেল)

৬। কিন্তু জাইভারটাব মোথার বাড়ি দিলেই যে এঞ্জিনটা তখন আমার বশে চলেবে এ কথা মনে করা ভুল। বস্তুতঃ জাইভারের সৃষ্টি ধরে ওখানে একটা বিত্তা এঞ্জিন চালাচ্ছে। অতএব শুধু আমার রাগের আশুগ্নে এঞ্জিন চলবে না, বিত্তাটাও দখল করা চাই, তাহলেই সত্যের বর পাব। (রবীন্দ্রনাথ)

৭। বিজ্ঞানের জগতানে ভলে স্থলে মাকালে আজ এত পথ খুলেছে, এত জগৎ ছুটেছে যে ভুগোলের বেড়া আজ আর বেড়া নেই, আজ কেবল নানা ব্যক্তি নয়, নানা জাতি কাছাকাছি এসে জুটল, অন্তিম মানুষের সত্যের সমস্যা বড় হয়ে দেখা দিল। বৈজ্ঞানিক

নিকশক্তি তাদের একত্র করেছে তাদের এক করবে কে? (রবীন্দ্রনাথ)

৮। যে সমস্ততা এবং সৃষ্টি সত্য উপলব্ধির দিকে অগ্রসর হয়ে এসেছে সেটা আমাদের সমস্ত অস্বস্তি কষ্টপ্রবণতা, সমস্ত চিন্তাশীলতা এবং জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির উদ্বোধনে। জ্ঞান আমাদের সমস্ত সাধনার পথে অস্বস্তিকারী মল। বিশ্বজগতের সঙ্গে তার অন্তর্নিহিত বাস্তব জিনিষের এ বিষয়ে মিল আছে; বস্তুতঃ আমরা যার বারে দেখে লেই তাকে দেখা দিই। একবার জেনার পাই তাকে প্রথম দেখি। পৃথিবীর নানা জিনিষকে বত পতীরভাবে এবং সংলগ্নভাবে সংগঠিত করা যায় ওই তাদের ভিতর-বার মত একা সৃষ্টির সন্ধান মেলে, এবং ততই তাদের জটিলতা দূর হয়। সত্যের প্রকাশ চিরদিনই আশ্চর্যজনক এবং উদ্ভেলক।

এইজন্তে একেশ্বরবাদীতার চেয়ে চিরবিশ্বকর জিনিষ আর দ্বিতীয় নেই;—যেন নানা অসংলগ্ন সামঞ্জস্যহীন রেখা সমষ্টির দিকে তাকালে তাকালে তারা চোখের সামনে একত্র একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে একটা বিস্তৃত সুখময়নে পরিণত হয়ে উঠে। (চেস্টারটন)

প্রাচীন কালে একদল ধর্ম্মধার কাছে একবার গিয়ে গিয়ে চিরকালের মত চুকে বসে যায় তা নয়, এতোক কালের যোকের কাছেই বাধার ভিতর দিয়ে আবারের ভিতর দিয়ে সত্যকে নতুন করে আবিষ্কৃত হতে হবে। (রবীন্দ্রনাথ)

৯। মানুষের আদর্শও যেমন সত্য সেই আদর্শের ব্যাঘাতও তেমনই সত্য—যাহারা সেই ব্যাঘাতের ভিতর দিয়েই যাত্রা করেন। আদর্শকে দেখিতে সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধির দ্বারা দেখা যায় তাহাদের আর গতি নাই। (রবীন্দ্রনাথ)

